যুগে যুগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অবমাননা কারীদের

করুণ পরিণতী

যুগে যুগে রাসূল (সঃ)
অবমাননাকারীদের
করুণ পরিণতি

মাওলানা মুফতী শফিকুল ইসলাম (শাহাআলী)

ইমাম ও খতিব : সাতভাইয়া পাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ
বৈদ্যের বাজার, সোনারগাঁ

মোহতামিম : তালিমুল কুরআন মহিলা মাদরাসা
সোনামই, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

প্রকাশনায়

আল-আহবাব লাইব্রেরী

মোগরাপাড়া (মহিলা কলেজ সংলগ্ন)
চিলার বাগ (হাবীবপুর), সোনারগাও, নারায়নঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৬৭৫-২৪৯১৮০, ০১৯৮৯-৮৩৯৩৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

যুগে যুগে রাসূল অবমাননাকারীদের করুণ পরিণতি

মাওলানা মুফতী শফিকুল ইসলাম (শাহআলী)

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০১৮ইং

প্রকাশক ঃ ইকবাল মাহমুদ

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ঃ নাঈম কম্পিউটার, ০১৯৪৪-২৯৬৫৭৭

প্রচ্ছদ ঃ রাফী গ্রাফিক্স

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম পিতার রূহের
মাগফিরাত কামনায় এবং আম্মা ও
শ্বশুর-শ্বাশুড়ির দীর্ঘ নেক হায়াত
প্রত্যাশায় যারা স্বীয় সন্তানের
জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার হিসাবে
দ্বীনি শিক্ষাকে নির্বাচন করেছেন।

ইকবাল মাহমুদ

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/ স্নেহের-

....

....

....

....

কে

সূচীপত্র

বিষয় পৃ.

প্রকাশকের কথা ১০
লেখকের কথা ১১
ভূমিকা ১৩
মহামানবের শত্রুতা কেন? ১৫
মহানবী (সা.) এর কটূক্তিকারী আবু লাহাবের করুণ পরিণতি ১৫
উতবা ইবনে আবু লাহাবের করুণ পরিণতি ১৬
উকবা ইবনে আবী মুআইতের করুণ পরিণতি ১৭
রাসূল বিদ্বেষীদের করুণ পরিণতি ১৯
মহানবী সা. এর অবমাননা বিশ্ব মানবতার উপর চরম আঘাত ২১
মহানবী (সা.) এর প্রতি কুটূক্তিকারীদের মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন পাশ করা প্রয়োজন ২৪
মহানবী (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি : রাষ্ট্র নিশ্চুপ! ২৬
তাদের জবাব ২৮
রাসূল কটূক্তিকারী নাস্তিক-ব্লগারদের হত্যা ঠেকাতে সরকারের কি করণীয় ২৯
শাহবাগী নাস্তিক-ব্লগারদের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী ৩১
সরকার ও আইন শৃংখলাবাহিনী চাইলে রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও অবমাননাকারীদের শাস্তি দেওয়া সহজ ৩৩
স্বাধীনতা মানে অন্যের ধান ক্ষেত মাড়িয়ে যাওয়া নয় ৩৫
মানুষের ভালবাসার জায়গায় আঘাত করা ভালো মানুষের কাজ নয় ৩৬
দেবাশীষ রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটূক্তি ও আটক ৩৭
আজকের নাস্তিকেরা উমরের তরবারির কাহিনী ভুলে গেছে ৩৮
লাঞ্ছিত হলো রাসূল (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র আঁকা সুইডিশ কার্টুনিস্ট ৩৮
বিংশ শতাব্দীর সেরা মিথ্যুক, রাসূল অবমাননাকারী মুফাসসির থেকে সাবধান ৩৯

আধুনিক শিক্ষিতরাই কি ইসলাম ধ্বংসকারী ইংরেজ? ৪২
আল্লাহ-রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য কটূক্তিকারী নাস্তিক ব্লগার রাজিবের মাত্রাহীন স্বাধীনতাই করুণ পরিণতি ডেকে আনে................ ৪৫
রাসূল অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগারদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই ৪৬
লতিফ সিদ্দিকীর নবীবিরোধী মন্তব্য ৫০
আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রাসূলবিরোধী মন্তব্য.. ৫২
রাসূল সা.কে নিয়ে কটূক্তিকারী কুলাঙ্গার নাস্তিক আফিস মহিউদ্দীন ৫৭
প্রথম আলোর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র ৫৮
কুলাঙ্গার সালমান রুশদি রাসূল (সা.) কে কটাক্ষ করেছে ৬০
গোস্তখে রাসূল কাব বিন আশরাফের করুণ পরিণতি........................ ৬১
গোস্তখে রাসূল আবু রাফের শাস্তি ৬৩
নবীজির ব্যাপারে কটুক্তিকারী ইবনে খাতালের করুণ পরিণতি............ ৬৫
আল্লাহর বিধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননাকারীর শাস্তি ৬৬
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননাকারীর শরয়ী বিধান ৬৭
বিশ্বের মুফতি ও ইমামদের দৃষ্টিতে রাসূল অবমাননাকারীর শাস্তি......... ৬৭
গোস্তাখে রাসূল সম্পর্কে ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের ফতোয়া ৬৮
ইন্টারনেট, দ্বীনী খিদমতের ও রাসূল অবমাননা জবাবের এক উর্বর ক্ষেত্র .. ৬৯
যারা রাসূলের স্ত্রীদেরকে নিয়ে কটূক্তি করে তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড ৭৭
কুলাঙ্গার কার্টুনিস্টের নির্মম পরিণতি.. ৮৫
বগুড়া পলিটেকনিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক প্রকাশ.. ৮৬
বৃটেন ও ফ্রান্স সরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা.................................. ৮৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের শাস্তি ... ৮৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী চিঠি অবমাননার কারণে পারস্য সম্রাটের করুণ পরিণতি.. ৮৮

রাসূলের সুন্নাত নিয়ে কটূক্তি করা ও ঈমান ধ্বংসকারী ৯০
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর করুণ পরিণতি ৯১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কটূক্তিকারীনী উম্মে জামিলের নির্মম পরিণতি ৯১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যকারীনী বাদীর শাস্তি ৯২
মহানবীকে ব্যঙ্গ করার প্রতিশোধ নিয়েছি.................................. ৯২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে রাজপাল রঙ্গিলা রাসূল বই প্রকাশ ও তার উচিত শিক্ষা.................................. ৯৩
ফাঁসির পূর্বে সকলের সাথে সাক্ষাৎ.. ৯৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারী মুনশিরাম সোয়াম শ্রদ্ধানন্দর উচিত শিক্ষা.. ৯৮
আত্মীয়দের সাথে শেষ সাক্ষাৎ ১০০
নাথোরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে বই প্রকাশ ও তার উচিত শিক্ষা...১০১
রাসূলের কটূক্তিকারী পালামলের করুণ পরিণতি........................ ১০৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারী রাম গোপালের নির্মম পরিণতি.. ১০৮
রাসূলের কটূক্তিকারীদের রক্ষা নেই ১১১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননাকারী চলচল সিং এর শেষ পরিণতি ১১৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসূলকে কটাক্ষ করে চলচ্চিত্র প্রকাশ ১১৬
সিনেমার আদ্যোপান্ত ১১৮
মহানবীকে নিয়ে ইহুদী চক্রান্তের পূর্বাপর ১১৯
ইহুদী প্রভাববলয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২১
তাগুতের মোকাবেলায় করণীয় ১২২
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বহু বিবাহ নিয়ে নাস্তিকদের বিভ্রান্তি.. ১২৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়েশা (রা.) এর বিবাহ নিয়ে কটূক্তিকারী কুলাঙ্গার নাস্তিকদের জবাব........................ ১৩০
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবন ১৩২
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে.. ১৩৫
বিভিন্ন ধর্মে বিয়ের ন্যূনতম বয়স.................................... ১৩৭
বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় নারীর বিয়ের বয়স............................ ১৩৯
বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের বিয়ের বয়স ১৪১
খৃষ্টধর্মেও রাসূল অবমাননা ও মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড.................. ১৪৩
সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী কর্তৃক গোস্তাখে রাসূলের সাজা ১৪৫
সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক রাসূল অবমাননাকারীর সাজা...... ১৪৭
রাসূলকে নিয়ে কটূক্তিকারী পাদরি ইসহাকের উচিত শিক্ষা ১৪৮
মোগল শাসনামলে গোস্তাখে রাসূলের সাজা মৃত্যুদন্ড..................... ১৪৮
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করার অপরাধে পাকিস্তানে খৃস্টানদম্পতির মৃত্যুদন্ড.. ১৪৯
অসভ্যতাকে সভ্যতা বলে চালানোর যেকোন প্রয়াস সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে.. ১৪৯
তৌহিদী জনতার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ধর্মদ্রোহী নাস্তিকচক্র খড়কুটার মত ভেসে যাবে ১৫২
ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের পক্ষ ত্যাগ করে ইসলামী জনতার সাথে একাত্ম হোন.. ১৫৪
মিডিয়াযুদ্ধ এবং ইসলামের ভূমিকা... ১৫৭
ব্লগারচক্রের নাস্তিকতা এবং আশেকীনে রাসূলের ঈমানী গর্জন.......... ১৬০
ব্লগারদের অপকীর্তি জানাতে গিয়ে বিপাকে এক বিচারপতি ১৬৩
আল্লাহ সম্পর্কে কটূক্তিকারী কলেজ শিক্ষকের শাস্তি দাবি.............. ১৬৫
পবিত্র কুরআন নিয়ে আরেক হিন্দু শিক্ষকের কটূক্তি ১৬৬
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী শিক্ষিকার গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি..................................... ১৬৭

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী
শিক্ষক মদনমোহন পুরস্কৃত ১৬৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তিকারী টুঙ্গিপাড়ার
শিক্ষক শঙ্করের বিরুদ্ধে মামলা.. ১৭০
প্রিয়তম নবীজির ভালবাসা..১৭১
ক্ষমা ও সহনশীলতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম......... ১৭৫
মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.................. ১৭৬
ধৈর্যের পাহাড় তিনি.. ১৭৮
ঈমানের পরিপূর্ণতা ও রাসূলপ্রেম ১৭৮
ভালবাসার এক কারণ : নৈকট্য.. ১৭৯
ভালবাসার ২য় কারণ : সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা.................................. ১৮০
ভালবাসার ৩য় কারণ : পরিপূর্ণতা.. ১৮২
ভালবাসার ৪র্থ কারণ : দয়া-দাক্ষিণ্য.. ১৮২
ইসলামে দাসপ্রথা ও বিচক্ষণ দাসের কাহিনী ১৮৩
সাহাবাবিদ্বেষের পরিণাম ১৮৮
চেহারা বিকৃতি ১৮৮
শুকরে পরিণত ১৮৯
বংশগত প্রাধান্যতার কারণে জনৈক আলেমের শাস্তি ১৮৯
বানরে পরিণত ১৯০
হযরত শাইখাইন (রা.) এর লাশ বের করার প্রসিদ্ধ ঘটনা ১৯১
সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রতি বিদ্বেষের ফল ১৯২
নাস্তিক প্রফেসর ১৯৩

প্রকাশকের কথা

আল্লাহর কাছে যেই নবীর শান হলো যে, তাঁর সামনে কেউ উঁচু আওয়াজে কথা বললে পর্যন্ত তার সকল নেক আমল আল্লাহ বিনষ্ট করে দেন, তাঁর ব্যাপারে কুটুক্তি করা, ব্যঙ্গ করা কত মারাত্মক অপরাধ তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। যার ভালোবাসায় মুসলমানরা দুনিয়ার সব কিছু ছাড়তে ইচ্ছুক। কেননা খাঁটি মুসলমানরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসে।

আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী লাঞ্ছিত হবে, অপদস্থ হবে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হবে। ইতিপূর্বে যারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তাদেরকে আল্লাহ হয় নিজে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন, না হয় মুমিনদের হাতে তাদের ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কোন কাফের সম্প্রদায়কে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেননি, যতক্ষণ না তারা নবীর সঙ্গে কোন গোস্তাখি করেছে। পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্প্রদায়ের এমন ঘটনাগুলো আল্লাহ কুরআনে খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। হযরত নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব, হযরত সালেহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের আযাব এবং কওমে সামূদ ও হুদ (আ.) এর সম্প্রদায়ের আযাব, সবই নবীদের সঙ্গে গোস্তাখি করার কারণে পতিত হয়েছিল। আমাদের নামধারী মুসলিম এমপি, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী ও নাস্তিকদের এমন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করতেছে। আর নাস্তিকতা একটা অভিশাপ। নাস্তিক চোরের মত পালিয়ে জীবন যাপন করে। তাদের জন্য বিশাল এই পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

হে নাস্তিকরা! তোমাদের জন্য আফসোস, শত আফসোস। এখনো সময় আছে তওবা করে ফিরে আসো। আর ইন্টারনেট হচ্ছে বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী মিডিয়া। যার মাধ্যমে কোন মতামত বা মতাদর্শ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া যায়। আর এরই ছত্রছায়ায় ইসলাম বিদ্বেষীরা স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলাম সম্পর্কে নতুন নতুন কুৎসা রটনা করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় একদিকে মুসলমানদের হৃদয় সীমাহীন ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ইসলাম বিদ্বেষীরা এ নিয়ে পাগলের মতো লম্ফ-ঝম্ফ করছে। আর আরেক দিকে সত্যসন্ধানীরা প্রকৃত সত্য উদঘাটনে চিন্তা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করছ। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও ইসলামের সুমহান আদর্শ ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটে ও মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পাড়লে অন্তত সত্য সন্ধানীরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হবে। ঠিক প্রয়োজনের সময় এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা লেখকের এই খেদমতকে কবুল করুন। আমীন!!

ইকবাল মাহমুদ

লেখকের কথা

হে আমার সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা হয়তো অনেকে জানেন কিছু চামচিকা মুক্তমনা প্রগতিশীল নাস্তিক শয়তানেরা আল্লাহ ও তাঁর নবী রাসূলগণের সম্পর্কে কটূক্তি, মিথ্যাচার, হাস্যকর নানান রকমের বিদ্রূপাত্মক ও কুৎসিত মন্তব্য করে যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এদের সিংহভাগই মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়ে। হায়! আফসোস শত আফসোস!! এমন অশালীন ও কদর্যপূর্ণ লেখা-লেখি ও কটূক্তি কিভাবে করতে পেরেছে?এদের বিবেক কী একটুও নাড়া দেয়নি?হয়নি কি প্রশ্নবিদ্ধ? এদের কী নেই কোন সৌজন্যপ্রিয় সভ্যমনা অভিভাবক?যারা এমন মন্দতর কাজ হতে এদেরকে বিরত রাখতে বাধ্য করবে? এমন অশালীন বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্য যা বলতে বা লেখতে গেলেই গা শিউড়ে উঠে। হৃদয় আন্দোলিত হয়ে যায়। আঁতকে উঠে তনু-মন। শুধু মুসলমান নয় একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সভ্য অমুসলিমের হৃদয়কেও নাড়া দিবে। আসাড়িত করে তুলবে।

স্বাধীন মত প্রকাশের নামে ব্লগ কালচার ও ফেসবুকে বাম-রাম পরিবেষ্টিত নষ্ট-ভ্রষ্ট অসভ্য নাস্তিক ব্লগারদের এমন সব দুর্গন্ধময় অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য একজন মুসলমান নামায রোযা ও ইসলামী বিধি-বিধান পালন থেকে অনেক দূরে হলেও আল্লাহ ও রাসূলের শানে তা অতি সংবেদনশীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও আত্মনিবেদনই হচ্ছে প্রতিটি মুসলমানের পরিচিতি ও অস্তিত্ব। আর যার কাছে যে ব্যক্তি সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অশালীন কটূক্তি ও মর্যাদা হানিকর কোন কিছুই করে থাকলে তা হয়ে উঠে অসহনীয়, পীড়াদায়ক ও মর্মবিদারী। ফলে মুহূর্তেই প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে পুরোদ্যমে। প্রয়োজনে জীবন বাজী লাগাতেও প্রস্তত হয়ে পড়ে। এটাই ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শন।

একজন মু'মিনের জন্য স্বীয় জান-মাল, পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়ভাজন সকল ব্যক্তিবর্গ হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ও আযমতই সবচেয়ে অধিক হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সাহাস্য বদনে নির্দ্বিধায় আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সর্বস্ব

বিসর্জন ও প্রাণোৎসর্গ করার ঐশী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে, মরণপণ লড়াইয়ে। আর এটা ঈমানের ন্যূনতম দাবিও বটে। দুনিয়ার ইতিহাসে যার ভুরিভুরি নজীর স্থাপিত হয়েছে। যা কারো অজানা নয়। বর্তমান তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগার চক্রের নগ্ন অপকৌশল জনসম্মুখে প্রকাশিত হলে ক্ষোভে ও ক্রোধে গোটা দেশ যেভাবে ফুসে উঠেছে, তা এরই প্রতিফলন মাত্র। সর্বত্র মুসলমানদের ঈমানী স্ফুলিঙ্গ যেভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে, তা নিন্দনীয় কোন কিছুই নয়; বরং প্রশংসার যোগ্য। আশা করি মুসলামান হিসেবে প্রত্যেকের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া এর বিপরীত হবে না। কেননা, এটাই তো ভালবাসার প্রমাণ। যে শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালবাসে তার সামনে তার ব্যাপারে কেউ কটূক্তি করলে সে প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে। এমনিভাবে জিয়াউর রহমানকে যে ভালোবাসে তার অবস্থাও এমন হবে।

১৯৯১-৯২-৯৩ এ সময়ের মধ্যে ঢাকার একটা পত্রিকার সম্পাদক তিনি একটা কভারস্টুরি করেছিলেন। শ্রী কৃষ্ণ এক লম্পট ভগবানের প্রতিকৃতি- এটা ছিল তার কভারস্টুরি।

এরপরে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। ঢাকা শহরে ঐ একদিনে একশত'র অধিক গাড়ি ভাংচুর করে হিন্দু ভাইয়েরা। মানুষ তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত পেলে তার যে ক্রোধ ও কান্না এটা শুধু মুসলমান নয় বরং সকল মানুষের। কিছুদিন আগে ইমরান এইচ সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তি করার কারণে তাকে কী পরিমাণ হুমকিধমকি ও অপমান-অপদস্থ করা হয়েছে- এটা কারো অজানা নয়। আর এটাই ভালবাসার পরিচয়। তাই মুসলমানের সন্তান হিসাবে প্রত্যেকেরই উচিত এর প্রতি পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন প্রকাশ করে, সভ্যতার শত্রু এসব কুলাঙ্গার ব্লগারচক্র ও তাদের সতীর্থ, সাঙ্গোপাঙ্গো, চেলচা মুণ্ডুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খড়গহস্তে রুখে দাঁড়ানো। এটা ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমিন।

মাওলানা মুফতী শফিকুল ইসলাম (শাহাআলী)
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৯৬২১৩০

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তা'আলার জন্য অসংখ্যা প্রশংসা এবং অসংখ্য দুরূদ ও সালাম, আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবিব, মুসলিম উম্মাহর প্রাণের স্পন্দন। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অনুপম আদর্শ ও চরিত্রের ধারক-বাহক ছিলেন যে, উত্তম চরিত্র ও মানবীয় সদগুণাবলী দ্বারা ঘোর তমাসাচ্ছন্ন বর্বরতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিপূর্ণ সমাজকে পরিণত করেছিলেন ইতিহাসের সেরা সভ্য ও সুশীল সমাজ। মানব ইতিহাসের বর্বর, অসভ্য মানুষ হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের সর্বোচ্চ আদর্শবান ব্যক্তি। বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মানবতাকে দান করেছিলো নতুন জীবন, নতুন উদ্যম, নতুন শক্তি ও নতুন করে পথ চলার হিম্মত ও পাথেয়।

তখনকার ভয়ংকর, বর্বর, হিংস্র, লোমহর্ষক, পাশবিক ও পৈশাচিক আচার-আচরণ অপনোদিত করে যেভাবে মানবতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এর কিঞ্চিৎ নমুনা ও উপস্থাপন করা পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ অবদি কোন ইজম, ধর্ম ও মতাদর্শের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হবেও না। হতেও পারে না। ইতিহাসের সেই জঘন্যতম অবক্ষয়ের সময়েও হায়েনারূপী মানুষের কাছে পরম সততা, বিশ্বস্ততা, সম্ভ্রান্ততা, নিষ্কলুষতা, শালীনতা, নম্রতা, সহনশীলতা, উদারতা, বদান্যতা ও কমনীয়তা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর অনন্য আধার হিসেবে ছিলো মহানবীর পরিচিতি। যশ ও খ্যাতি। ফলে তদানীন্তন আরবের পৌত্তলিক চরম খোদাদ্রোহীরা ও প্রিয় নবীজির চরিত্র হননের মতো জঘন্যতম ন্যাক্কারজনক, শিষ্টাচার বর্জিত কটূক্তি ও বিরূপ হীন মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সেকালের

কাফির, মুশরিক ও পৌত্তলিকরা যে ঔদ্ধতা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করতে সাহস করেনি, বর্তমান মুসলিম ঘরে বেড়ে উঠা নাস্তিক্যবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির মদদ ও আশীর্বাদ পুষ্ট, হাতেগোনা গুটি কয়েক উচ্ছিষ্টখোর, নাস্তিক, মুরতাদ তথাকথিত মুক্তমনা প্রগতিবাদী নবপ্রজন্মরা ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণ্য, ন্যাক্কারজনক, অকথ্য অনির্বচ্য, বিদ্রুপাত্মক, অশ্লীল ও কুৎসিত মন্তব্য নিক্ষেপ করতে সামান্যতমও করছে না কুণ্ঠাবোধ। এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়েও করা হচ্ছে কটূক্তি। চামচিকা যদি সূর্যকে খারাপ বলে তাতে সূর্যের কি আসে যায়, তদ্রূপ মহানবীকে নিয়ে যদি গুটি কয়েক নাস্তিক চামচিকারা কুটূক্তি করে, মিথ্যাচার করে, তাতে সূর্যের ন্যায় মহামানবের কি আসে যায়। সর্ব যুগেই এমন কিছু কুলাঙ্গারদের সৃষ্টি হয়েছিল যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জানিয়েছেন। তাদের নোংরামী থেকে মুসলমান যুবকদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন, আমীন!!

মহামানবের শক্রতা কেন?

সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও উদার চরিত্রের অধিকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রে কোনো দাগ নেই, আপত্তি নেই, নেই শক্রতার কোন উপকরণ। আরব-অনারব সবার নিকট তিনি ছিলেন নন্দিত, আদর্শ মানব। সহায়তার হাত বাড়াতেন তিনি আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয়, সব অসহায়ের প্রতি। ক্ষমা করতেন তিনি পরম ঘাতককে। তাঁর শক্র হয় কেমন করে? কে যাবে তাঁর বিরুদ্ধে? না! সবাই তার বন্ধু। একবাক্যে সবার নিকট তিনি আল আমিন, সত্যের ধারক, আত্মসাময়িকতায় নিবেদিত প্রাণ, আদর্শের মূর্তপ্রতীক, ঐক্য সোহাগসাম্য মৈত্রীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বাঁধা হলো একত্ববাদের প্রতি আহ্বান। ধর্মের বাণীই হলো তাদের সঙ্গে বিরোধের কারণ, শক্রতার মূল রহস্য আল্লাহ নিজেই বলেন-

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"তারা মূলত আপনাকে অস্বীকার করে না, আপনার সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ শক্রতা নেই। বিরোধের মূলে হলো, তারা আসলে আল্লাহর নিদর্শন ও বিধি-বিধানকেই অস্বীকার করে।" যার কারণে মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ১৮ বার হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

তারা ধর্মহীনতাকে পছন্দ করে, পছন্দ করে মনুষ্যতা বিবর্জিত খোদাদ্রোহী মতবাদকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহ্বান করেন সত্যের পথে, আল্লাহর একত্ববাদের পথে, চির শান্তি ও মুক্তির দিকে, আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের দিকে, পর্দার দিকে, মদপান অবৈধ করার দিকে, জিনা অবৈধ করার দিকে, অবাধ মেলামেশা অবৈধ করার দিকে, এই হলো নাস্তিক মুরতাদ ও নামদারী মুসলমানদের সমস্যা। তাই তো আজ নামধারী মুসলমানরা ইসলামের বিরোধিতা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমার্জিত মন্তব্য করে অতীতের সব খোদাদ্রোহীকে হার মানিয়ে যাচ্ছে। তাদের অশ্লীল আচরণে ইবলিস শয়তান পর্যন্ত লজ্জিত। আবু লাহাব, আবু জাহেল, উতবা, শাইবার মতো জাহিলী যুগের গডফাদারদের চরম উগ্রতা ও ভয়াবহ দৌরাত্ম অপেক্ষা আরো অনেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। তারা মুলত আবু লাহাবের উত্তরসূরী।

মহানবী সা. এর কটূক্তিকারী আবু লাহাবের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"হে রাসূল! আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করুন।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সবাইকে

আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সর্বজনতা নির্বিশেষে সাড়া দেয়। সব আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হয়। তিনি তাদেরকে বললেন, পাহাড়ের আড়ালে বিশাল বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের জন্য উদ্যত রয়েছে, এমন খবর যদি আমি তোমাদেরকে বলি তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সমস্বরে সবাই উত্তর দেয় অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কেননা, আমরা আজ পর্যন্ত কোনদিন আপনাকে সত্য ছাড়া বলতে শুনিনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদেরকে এক কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। সব মতবাদ বর্জন করে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর, তাহলে ওই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় মুক্তির কোন পথ নেই।

সাথে সাথে আবু লাহাবের জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হলো। অন্তরে বিরোধের দান বাঁধলো। সে বলে উঠলো, এজন্যই তুমি আমাদের একত্রিত করেছো? তোমার ধ্বংস হোক এবং সে রাসূল এর উপর নিক্ষেপ করার লক্ষ্যে একটি পাথর হাতে নেয়। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

"আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে পতিত হবে।" আবু লাহাব পদে পদে লাঞ্ছিত হয়ে এজগত থেকে বিদায় নিয়েছে। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর সে প্রাণঘাতি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। গায়ে পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ ঘৃণা ও আতংকে তাকে বর্জন করে। লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন তাকে জীবিত অবস্থায় নির্জনে ফেলে আসে। তিলে তিলে শাস্তি ভোগ করে পরকালের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। মরণের পর তিনদিন তার লাশ পড়েছিল। পরিবেশ বাঁচানোর জন্য তার লাশ হাবশী কৃতদাসরা লম্বা লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটি গর্তে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে আবু লাহাব থেকে পরিত্রাণ পায়। এই হল রাসূল বিরোধীদের করুণ পরিণতি।

(সূরা লাহাব, ১-৩; তাফসীরে রুহুল বয়ান, সাপ্তাহিক খতমে নবুয়াত, করাচি ৮/৪, সংখ্যা-৪৭)

উতবা ইবনে আবু লাহাবের নির্মম পরিণতি

আবু লাহাবের ছেলে উতবাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি-গালাজ করত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ করে বললেন-

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

"হে আল্লাহ! আপনার কোন হিংস্র জন্তু তার উপর লেলিয়ে দিন।"একথা শুনে আবু তালেব উতবাকে বললেন, 'ভাতিজা! মুহাম্মদের এ বদ দোয়া থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এরপর উতবা শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

করল। এক নির্জন স্থানে রাত নেমে আসলে কাফেলা সেখানেই যাত্রা বিরতি করে। উতবার ব্যাপারে কাফেলার লোকদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদ দোয়ার কথাটা জানাছিল। তাই তারা তাদের সামানাপত্র একত্র করে তার উপরে উতবাকে শুইয়ে দিয়ে নিজেরা চারপাশে শুয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে একটি নেকড়ে এসে উপস্থিত হল। নেকড়ে প্রত্যেকের চেহারার ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে উতবাকে পেয়ে গেল। সেখানেই তাকে হত্যা করল।

(দালায়েলুন নবুওয়াহ, আশশিফা; বাইহাকী, মু'জিযাতে রাসূল সা. পৃ. ১৩৫)

উকবা ইবনে আবী মুআইতের করুণ পরিণতি

উকবা ইবনে আবী মুআইত যখন কোন সফর থেকে ফিরত, তখন সে মক্কাবাসী সবাইকে দাওয়াত করত। অনেক সময় সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কথা শুনত এবং তার কাছে এই কথা ভাল লাগত। সবার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দাওয়াত করল। তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ আমি তোমার দাওয়াত কবুল করব না। তখন সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ল এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। এদিকে উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে উতবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। সে যখন তার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনল, দৌড়ে এসে বলল, উকবা! শুনলাম তুমি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছ? সে বলল না কস্মিনকালেও না। আমি তো বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে তার সামনে ইসলাম প্রকাশ করেছি শুধু। উবাই বলল, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপর সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদের সঙ্গে এ ধরণের বেয়াদবী করবে।

উকবা বন্ধুকে খুশি করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল এবং ঐ সব বেয়াদবী করল, যেগুলো তাকে উবাই বলেছিল। এমনকি সে তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকে থুথু পর্যন্ত নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা থুথুকে আগুনের টুকুরা বানিয়ে তার চেহারায় ফিরিয়ে দিলেন, যার কারণে তার চেহারা পুড়ে গেল এবং মৃত্যু পর্যন্ত গালে পোড়া রয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখনই তুমি মক্কা থেকে বের হবে, তখনই তোমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। এই কথা তার অন্তরে তীরের মত গেঁথে থাকল।

কয়েক বছর পর যখন মক্কাবাসী বদরের যুদ্ধে যাচ্ছিল তখন সে এই বলে পাশ কাটিয়ে থেকে যেতে চেয়েছিল যে, তোমরা জান না মুহাম্মদ আমাকে কী ধমক দিয়েছেন? তার মুখ দিয়ে যা বের হয়, তা বাস্তবায়িত না হয়ে থাকে না। সুতরাং আমাকে এখানেই থাকতে দাও। তারা বলল, তুমি তো আশ্চর্য মানুষ দেখি! তার তো বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। আর অগত্যা যদি সে বিজয়ী হয়ই

তাহলে তোমার যে দ্রুতগামী লাল উট আছে, তাতে সওয়ার হয়ে চলে আসবে। এরপর তার দুর্ভাগ্য তাকে ময়দানে নিয়ে গের। কাফেররা পরাজিত হল এবং সে তার উট নিয়ে পালাল। কিন্তু উপত্যকার পেচে পড়ে আটকে গেল এবং গ্রেফতার হল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে হযরত আলী (রা.) তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কেয়ামতের দিন যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার আফসোস হবে এবং বলবে-

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

"জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।" (সূরা ফুরকান : ২৭-২৯)

يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

"হায় আফসোস! অমুককে যদি বন্ধু না করতাম।"

(সূরা ফুরকান ২৮, তাফসীরে জিয়াউল কুরআন)

এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই উকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও সাক্ষাত করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক। এবাদতে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল।

ওকবা তখন কালিমা পড়ল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। উবাই ইবনে খালফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না

করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে এই কালিমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল, আমি তোমার এই ওযর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগা ওকবা বন্ধুর কথায় সারা দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হল এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে নিহত হয়। আয়াতে তাদের পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালফকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। (তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী)

ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কেয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে ... শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আজকে যারা তাসলিমা নাসরিন, আসিফ মহিউদ্দীন, মুফাসসাল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, আসাদ নূর গংদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারাও হাশরের ময়দানে আফসোস করবে।

রাসূল বিদ্বেষীদের করুণ পরিণতি

ইহুদী-খ্রিস্টান, পৌত্তলিক আর মুনাফেকদের চরম বিরোধিতার মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। রাসূল বিদ্বেষী সর্বাধিক অগ্রগামীদের অন্যতম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, আসওয়াত ইবনে আবদে ইয়াগুস, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, হারিস ইবনে উতাইল এবং আস ইবনে ওয়ায়েল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের উৎপীড়নে হত্যোদ্যম হয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে দমনের ঘোষণা আসে। ইরশাদ হচ্ছে- "বিদ্রুপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।" সূরা হিজর-৯৫

শুরু হয়ে যায় পাকড়াও। তাদের শায়েস্তা করতে আগমন করেন হযরত জিবরাইল (আ.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে একে তাদের সকলকে চিনিয়ে দেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) ওয়ালিদের হাতের শিরার দিকে ইশারা করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি তো কিছুই করলেন না। জিবরাইল (আ.) বললেন, যথেষ্ট করে দিয়েছি। অতঃপর আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিবের চোখের দিকে ইশারা করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি তো কিছুই করেন নি। তিনি বললেন, যথেষ্ট করে দিয়েছি।

এরপর আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের মাথার দিকে ইশারা করলেন। এবারও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি তো কিছুই করলেন না। জিবরাঈল আ. একই উত্তর দিলেন। অতঃপর হারেছের পেটের দিকে ইশারা করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একই উত্তর দিলেন। সবশেষে আস ইবনে ওয়ায়েলের পায়ের পাতার দিকে ইশারা করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি তো তার কিছুই করেননি। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনার পক্ষ থেকে এদের সকলের কাজ চুকিয়ে দিয়েছি। কিছুদিনের মধ্যে এদের উপর আল্লাহর আযাব প্রকাশ পেতে লাগল।

খুসায়া গোত্রের একলোক তীরে পালক সংযোগ করছিল। ওয়ালিদ তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি তীর তার হাতের রক্তবাহী শিরায় এসে বিদ্ধ হয়। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব চোখে কাঁটার মতো কিছু বিদ্ধ হচ্ছে অনুভব করতে লাগল, যে যন্ত্রণায় ছটফট করে লোকদের বলত, দেখ তো আমার চোখে কী বিদ্ধ হয়েছে। লোকেরা দেখে বলত, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। এক পর্যায়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের মাথায় ভয়ঙ্কর ফোঁড়া উঠে যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়। হারেসের পেটে হলুদ পানি জমতে থাকে। ফলে তার মুখ দিয়ে মল নির্গত হতে আরম্ভ করে। ধুঁকে ধুঁকে সেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর আস ইবনে ওয়ায়েল একদা তায়েফ গমন করলে সেথায় তার পায়ের তালুতে নরম স্থানে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে পায়ে পচন ধরে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়।

(তাফসীরে রুহুল মা'আনী ১৪/১২৭)

আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবির এই ছিল পার্থিব জগতের লঘু শাস্তি। আর পরকালের ভয়াবহ সাজা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। সে বা যারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে তাদের পরিণতিও এমন হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।" (সূরা নিসা-১১৫)

মহানবী সা. এর অবমাননা বিশ্ব মানবতার উপর চরম আঘাত

মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন, সকল নবী-রাসূলের সরদার, আখেরী নবী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করে চরম বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ সিনেমা 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' তৈরীর মত সর্বাধিক ঘৃণ্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করেছে জনৈক মার্কিন ইহুদী। গত ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ছবিটির কিছু অংশ আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ইন্টারনেটে পোস্ট করার পর সারা মুসলিম জাহানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব মানবতা। সারা দুনিয়া উত্তপ্ত হয়ে জনতার এহেন অগ্নিমূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কতিপয় অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেছে বলে খবরে প্রকাশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মুসলমানদের নবী নন। তিনি সারা দুনিয়ার আগত অনাগত সকল মানব ও জীন জাতির নবী। তিনি সারা দুনিয়ার কেয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক মানব কুলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ ব্যতিরেকে কোন মানুষের মুক্তির কোন পথ ও পন্থা নেই। মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য তাঁর আদর্শ একক এবং অনন্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের বিশ্বাস হলো-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ کُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِکَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟

لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿۲۸۵﴾

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গাম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমরাই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা-২৮৫)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত কিতাব ও সমস্ত নবী রাসূলের উপর ঈমান আনা। দুনিয়াতে এমন কোন ধর্ম বা মতাদর্শের নজীর নেই যেখানে এরূপ উদারতা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা যত নবীরাসূল পাঠিয়েছেন সবাই হক্ব। তা ইহুদীদের নবী হোক বা খ্রিস্টানদের। মুসা আ. হোক বা ঈসা আ.। সকল মানবের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন, সকল নবী রাসূলগণ আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। সকল নবী-রাসূল নিষ্পাপ, তাঁদের আদর্শ ও চরিত্রে কোন প্রকার কুটিলতার লেশমাত্র ছিল না। এর

উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অংশ। এহেন সুবিস্তৃত ঈমান ও আক্বীদা বিশ্বাস থেকে অনুমান করা যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ও তাঁর প্রদত্ত আক্বীদা বিশ্বাস কতটা প্রশস্ত, উদার এবং সার্বজনীন। ইসলামের শুধু এতদঅংশের সমপরিমাণ উদার ও প্রশস্ত আক্বীদা বিশ্বাস বর্তমান দুনিয়ার কোন মতবাদ, চিন্তাধারা ও ধর্ম দেখাতে পারবে না। আবার একথাও সত্য যে, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণও বলে গেছেন যে, সর্বশেষ একজন নবী আসবেন, যিনি হবেন সকল নবী রাসূলের সরদার। তিনিই হলেন মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর হাতেই মানবতার সঠিক আদর্শের পরিপূর্ণতা ঘটবে।

ইসলামের এরূপ আক্বীদা বিশ্বাসে লালিত দুনিয়ার কোটি কোটি মুমিন শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন, আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী-রাসূল সম্পর্কে কোন প্রকার অবমাননা ও অপমানসূচক শব্দও সহ্য করতে পারে না। সে কারণে কোন মহল যদি খ্রিস্টানদের নবী হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে কোন অপমানসূচক কথা বলে, কোন মহল থেকে যদি ইহুদীদের নবী হযরত মুসা আ. সম্পর্কে কোন অপমানসূচক কথা বলা হয়, তার সর্বপ্রথম প্রতিবাদকারী মুসলমানরাই হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম বিশ্বে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই কোন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলকে নিষ্পাপ মানেনি বা কোন কোন ব্যক্তির লেখায় একথাও ওঠে এসেছে যে, নবী রাসূলদের কেউ কেউ কোন দোষে জড়িত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ) কারো কারো কথায় স্পষ্ট হয়েছে ওই নবী এরূপ ভুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এমন কথা ও আক্বীদা-বিশ্বাসও মুসলিম উম্মাহ সহ্য করেনি। বরং সেরূপ ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়কে মুসলিম উম্মাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। ঈমান আক্বীদার এমন এক স্পর্শকাতর স্তরে যদি রহমাতুল্লিল আলামীন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.কে অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়, তবে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের অন্তর ঘাত প্রতিঘাতে কি ভয়াল রূপ ধারণ করতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা বিশ্ব মানবতার অবমাননা। কারণ তিনি পুরো মানবকুলের নবী। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে অবমাননার শামিল। কারণ তিনি আল্লাহর মাহবুব, পুরো দুনিয়ার আদর্শ হিসেবে তাঁরই নির্বাচিত ও প্রেরিত রাসূল। সকল নবীরাসূলের অবমাননার শামিল। কারণ তিনি সকল নবী-রাসূলের সরদার। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অবমাননা। কারণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত বাস্তব আদর্শের লৈখিক রূপ। পুরো জাহানের অবমাননা, কারণ

তিনি পুরো জাহানের জন্য অনুস্মরণীয় আদর্শের মূর্তপ্রতীক। এই অবমাননা দুনিয়াতে আযাব-গজব, বিপদাপদ ডেকে আনবে নির্ঘাত। কেননা, নবী সা. দুজাহানের রহমতস্বরূপ প্রেরিত। মোটকথা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বমানবতার ভালোবাসা অব্যাহত থাকলে বিশ্বময় আল্লাহ তা'আলার কুদরতী নেযাম-ব্যবস্থাপনা স্থিতিশীল থাকবে। তার মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী শান্তি ও সুখের বাতাস বইতে থাকবে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বেয়াদবী হলে আল্লাহর কুদরতী নেযামেও ব্যতিক্রম দেখা দিবে। যার রোষানল থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কারণ দুনিয়াবী আযাব গজব সকলকেই পরিবেষ্টন করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"নিশ্চয়ই রাসূলের পবিত্র জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

(সূরা আহযাব, আয়াত নং-২১)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি আপনাকে উভয় জাহানের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আমি আপনার নাম বুলন্দ করে দিয়েছি।"

(সূরা আলামনাশরাহ, আয়াত নং-৪)

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاَخْلَاقِ

"আমি উত্তম চরিত্রের সৌন্দর্য পূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৭৩)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই আপনার চরিত্র মাধুরি সর্বোত্তম।" (সূরা কলম, আয়াত নং-৪)

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের সন্তানসন্ততি ও মাতা-পিতার চেয়ে আমি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হব।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বৈরীতা রাখে ও তাঁর অবমাননা করে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। যারা বিনা

অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব-৫৮)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এরূপ ঘৃণ্য ধৃষ্টতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যেমন বিশ্বের পুরো মানবতাকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তেমনি সারা দুনিয়ার স্থিতিশীল পরিবেশকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে উস্কে দেওয়া হয়েছে। আমরা এধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তীব্র নিন্দা জানাই এবং এর কঠোর শাস্তির দাবী জানাই। আমরা মনে করি বার বার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার এই প্রবণতা ও ধৃষ্টতা রোধে বিশ্বব্যাপী কঠোর এবং স্থায়ী শাস্তির বিধান হওয়া আবশ্যক।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে নবীদেরকে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে আমার সাহাবিদেরকে গালি দিবে, তাকে দোররা লাগানো হবে।"

(কানযুল উম্মাল-১১/৫৩১, মাজমাউয যাওয়াইদ- ৬/২৬০)

মহানবী (সা.) এর প্রতি কটূক্তিকারীদের মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন পাশ করা প্রয়োজন

সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ, কুটূক্তি ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান, নাটক প্রচার ও ইসলামি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওলামায়ে কেরাম, মাদরাসা, ইসলামী ঐতিহ্য-সভ্যতা ও নিদর্শন নিয়ে যেভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মুসলমানরা শঙ্কিত। এসব মন্তব্য অতি পুরনো ও বস্তাপঁচা। ইবলিশের শেখানো বুলি মাত্র। অসুর তাড়িত অসূয়াপর চিন্তার ফসল। যুগে যুগে ধর্মাশ্রিত মনীষীগণ এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এসব কথা যারা বলে ও বিশ্বাস কর, তারা চরম সাম্প্রদায়িক, আজন্ম অন্ধ ও সাংঘাতিক ভন্ড। সাম্প্রদায়িকতা, দুষ্ট এ অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে ধর্ম অবমাননা বন্ধ করা প্রয়োজন।

১৬ কোটি নবী প্রেমিক মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে যারা বারবার বেয়াদবী করে যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের মুখোমুখী দাঁড় করাতে ব্যর্থ হই, তাহলে পুরো জাতির উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক গজব ও ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে। কোন দুর্ভাগা

ব্যক্তি যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবীবের সাথে বেয়াদবী করে এমন বেয়াদবকে শাস্তি দিতে তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। ইতিহাসে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যে দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন রাজনৈতিক নেতা নিয়ে অশালীন মন্তব্য করলে জেলে যেতে হয়, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়, সে দেশে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কুটূক্তি করে পার পেয়ে যাবে, সেটা হয় না এবং হতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ধর্মীয় নেতাদের ব্যঙ্গ ও উপহাস করা রীতিমত ফ্যাশন ও রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কিনা এটাও তদন্ত সাপেক্ষ। দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অব্যাহত অগ্রযাত্রার খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত ও প্রাণোদিত হয়, তার শতগুণ বেশি বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হয় সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও বিদ্বেষপরায়ণ কিছু বৃত্তিভোগী এজেন্ট। খড়কুটো ভেসে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না? নিশ্চয় আসবে আপন শক্তিতে, আপন গতিতে। এদেশের প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে।

(বাংলাদেশ সংবিধান, ৩য় ভাগ, ৪১(১), (ক,খ), পৃ. ১২।

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিপালনে অভ্যস্ত আদর্শবাদী পরিবারের মেয়েদের বোরকা পড়ার কারণে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যার কোনটির যথাযথ প্রতিকার না হওয়ায় এই অশুভ প্রবণতা বিনা বাধায় চলে আসছে। ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। কেবল ইসলাম নয়, সব ধর্মের ব্যাপারে একথা সমান প্রযোজ্য। বোরকা, টুপি পরিধান করে, দাড়ি রেখে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। ড্রেস কোড নামে এগুলো বন্ধ করা যাবে না। মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধা এবং উস্কানি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এসব অপতৎপরতা সংবিধান লজ্ঘনের শামিল। বাংলাদেশ দন্ডাবিধি পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫ ও ২৯৫ এ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডপ্রদানের বিধান রয়েছে।

(Whoever, with deliberate and malicious intention of out-raging the religious feelings of any class of the citizens of Bangladesh, by words, either sopken or written or by visible

representations insults or attempt to at-tempts to insult the religion or the religious beliets of that class be punished with imprisonment of either de-scription of a term which may extend to two years, or with fine of with both. 16 BLD 140, The Penal Code by Zahirul Haq, 4th ed. 2001, pp. 522-524)

আমরা মনে করি, ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ প্রণীত এ দন্ডাবিধি ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ২০০৯ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রণীত 'মানহানি বিধি' (Defamation Act 2009) পাকিস্তানে প্রচলিত 'ধর্মাবমাননা আইন' (Blasphenmy Law) কেও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। কেবল আইন প্রনয়ণ যথেষ্ট নয়, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে। নবী-রাসূলদের উত্তরসূরী হিসেবে এসব ইসলাম বিরোধী সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হক্কানি আলেম সমাজের দায়িত্ব। শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কোন ক্রমেই আইন হাতে নেয়া যাবে না এবং আইনকে তার নিজস্বগতিতে চলতে দেয়া উচিত। তাই বড় ধরণের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাই। এ দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও সহযোগিতামূলক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। স্মর্তব্য যে, উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ রয়েছে।

মহানবী (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি : রাষ্ট্র নিশ্চুপ!

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করা এখন যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি কী সাধারণ? কে এই মহামানব। তিনি কি শুধু মানব না মহামানব? এমন নানা প্রশ্ন সামনে আসলেও সব প্রশ্নের সহজ উত্তর একটাই, তিনি তো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি সবার মাঝে সর্বকালের সর্বোত্তম। তাহলে তাঁকে নিয়ে ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামের দুশমন কতিপয় হিন্দু পাপীষ্ঠরা সাহস পাচ্ছে কীভাবে? এদের খুঁটির জোর কোথায়? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশে এ নিকৃষ্ট কাজটি করে প্রথম আলোর কার্টুনিষ্ট দৃশ্যত: মুসলিম নামীয় আরিফ নামের এক কুলাঙ্গার। তার যথোপযুক্ত শাস্তি হয়নি, বলা যায় বিচার হয়নি। যে আরিফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্টুন আঁকল, তাকে শুধু গ্রেফতার করা হলো

লোক দেখানোর জন্য। সহজভাবেই সরকারের আশির্বাদ পুষ্ট হিন্দু শিক্ষকরা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে শুরু করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে কটূক্তি। সহনশীল নামের এই দেশে প্রতিবাদ ছাড়া কুলাঙ্গারদের আর কী হলো? প্রতিবাদ করল তারাই, যারা দেওবন্দী আদর্শে বিশ্বাসী এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কিন্ত আফসোস! তখন প্রতিবাদ না করে দূর থেকে দর্শন করে এদেশের মীলাদ কিয়াম প্রতিষ্ঠাকারী কথিত আশেকে রাসূলরা। নবীপ্রেম যেমন তাদের শরীরে নেই, নেই হৃদয়েও।

এর মধ্যে গত ২৭ মার্চ মঙ্গলবার সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের ফতেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে স্থানীয় নাট্যকার মীর শাহীনুর রহমান ও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিতা রানী উপস্থাপিত 'হুজুর কেবলা' নাটকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অসম্মানজনক সংলাপে মহানবীকে নারী লোভী হিসেবে আখ্যায়িত করে (নাউযুবিল্লাহ্)। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা। ৩০ মার্চ ধামরাইয়ের গোয়ালদী গ্রামের সানাউল্লাহ'র ছেলে বাংলাদেশ সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত এমডি কালামপুর বাজারের হোমিও ডাক্তার আ.সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করে। সর্বশেষ ৪ এপ্রিল বুধবার রংপুর মেডিকেল কলেজের চর্ম ও যৌন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. একে এম নুরুন্নবী লাইজু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অর্থলোভী বলে কটূক্তি করে। এ কুলাঙ্গার বলতে চায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান খাদিজা (রা.)কে তার অর্থের লোভে বিবাহ করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)হিন্দু কুলাঙ্গারদের পর এবার কটূক্তি করল নামধারী মুসলমান কুলাঙ্গাররা। তাদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে? হয়তো তারা চারদিনেই মুক্তি পাবে। কিন্তু আমাদের নবীর অসম্মানের কী বিচার হলো? এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশ কেমন সহনশীল? যার ভেতরে নবীর বিকৃত কার্টুন একে কুখ্যাত আরিফ এখনো ঘুরে বেড়ায়, আর ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুদের একটি মূর্তি নিয়ে কার্টুন আঁকায় বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ফিদা হুসেন দেশত্যাগে বাধ্য হয়। ক'দিন আগে ফেসবুকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একজন কুটূক্তি করেছিল। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হয়েছে জেল-জরিমানা। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুটূক্তি করা হলো, এর কোন কিছুই খেয়াল করল না সরকার। উল্টো এর প্রতিবাদকারীদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার-নির্যাতরেন ন্যাক্কারজনক ঘটনার তৈরি করল সরকার। স্কুলের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ইসলাম নিয়ে কুটূক্তি করেছে। আব্দুল গাফফার, লতিফ সিদ্দিকী। বললে এমন অসংখ্য ঘটনার কথা

বলা যাবে। এ ব্যাপারে সরকার ও রাষ্টের দায়িত্বশীলরা নিশ্চুপ। আমাদের আবেদন-ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ও চরিত্রহীন এসব অমানুষদেরকে বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করে ইসলাম ও রাসূলের ইজ্জতের হেফাযত করা আইন আদালত ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করি। পাশাপাশি চরিত্রহীন ইসলাম বিদ্বেষী সাইট ও পেজগুলো বন্ধ করে বা নজরদারী করে ধর্মের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসারটনাকারী ধর্মবিদ্বেষীদের মুখ ও কলম চিরতরে বন্ধ করার জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তাদের জবাব

এসকল কুখ্যাত কুলাঙ্গাররা ইসলাম ধর্মকে কুলুষিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে এসব কুটূক্তি করছে। এগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী। প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করলেই সহজে বুঝতে পারবেন যে, ২৫ বছর বয়সের একজন যুবক ৪০ বছরের একজন বিধবা নারীকে বিবাহ করা নারীলোভী তার প্রমাণ, নাকি নারীর প্রতি অনাসক্ততার প্রমাণ। অবশ্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী লোভী ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাষ্ট্রপ্রধান তখন তিনি ১১টি বিবাহ করেছিলেন। তার মধ্যে আম্মাজান আয়েশা রা. ছাড়া সকলেই বিধবা ও অনেক বয়স্কা ছিলেন। এটাও নারীর প্রতি অনাসক্ততার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি বিবাহের পিছনে নিছক ধর্মীয় স্বার্থই নিহিত ছিল। যেমন হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান রা.কে বিবাহ করেছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে। কারণ, বদর যুদ্ধের পর কাফেরদের দায়-দায়িত্ব সব কিছু আবু সুফিয়ানের (তখনো তিনি মুসলমান হননি) উপর অর্পিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবিবা (রা.)কে বিবাহ করার পর তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা রাখেননি। অতএব, উম্মে হাবীবা (রা.) কে বিবাহ করা সম্পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে ছিল। হযরত যয়নব (রা.)কে বিবাহ করা পালক পুত্রের জাহেলী প্রথার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে ছিল। হযরত সুফিয়্যা (রা.) এর স্বামী, বাপ ও চাচা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করার পর তার মনতুষ্টির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন।

আর তিনি লোভী হলে খাদিজা(রা.) এর সকল সম্পদ হাতে পেয়ে নিজস্ব কোন বালাখানা ও অট্টালিকা নির্মাণ বা কোন ব্যবসা শুরু করলেন না কেন? বরং সমস্ত সম্পদ ইসলামের কাজেই ব্যয় করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলেন তখন মক্কার কাফিররা বলল,

হে মুহাম্মদ! তুমি কী চাও? তুমি যদি মক্কার রাজত্ব বা সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করতে চাও, তাও আমরা ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছি। তুমি যদি মক্কার বড় ধনী হতে চাও, তাও আমরা বানাতে রাজি। তবুও তুমি ধর্মপ্রচার থেকে বিরত থাক। তিনি তাদের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গেলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী লোভী ও অর্থলোভী হলে এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া করলেন কেন? শুধু তাই নয়, হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে প্রস্তাব পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি চান যে, আপনার পাশে দন্ডায়মান (উহুদ) পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আমার ধনী হওয়ার দরকার নেই। আমি একবেলা খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। আর একবেলা অভুক্ত থেকে সবর করব। (তিরমিযী শরীফ ২/৬২,১৭২) (আর সিরাতের সকল কিতাবেই এই ঘটনা আছে)

আর তিনি মদিনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ঘর কেমন ছিল- আম্মাজান আয়েশা রা. এর ঘরের আসবাবপত্র যা ছিল- ঘরে সব মিলিয়ে যা ছিল তা হচ্ছে : একটা চকি, একটা চাটাই, একটা বিছানা, একটা ছালের বালিশ, খেজুর ও জব রাখার দু-একটা পাত্র, একটা জগ, একটা মগ। এর বেশি কিছু ছিল না। তাঁর কোন সুউচ্চ শানদার অট্টালিকা ছিল না। ঘরের প্রশস্ততা ছিল ছয়-সাত হাত আর ছাউনি খেজুরের ডালের। বৃষ্টির পানি এড়ানোর জন্য ওপর থেকে কম্বল জাতীয় মোটা কাপড় বিছানো থাকত। উচ্চতা এতটুকু ছিল যে, কেউ দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে ছাউনীতে হাত ঠেকে যেত। এই ছিল মক্কামদিনা ও তার আশপাশের বাদশার ঘর। (বুখারী, মুসনাদে তায়ালিমি পৃ. ২০৭)

রাসূল কটূক্তিকারী নাস্তিক-ব্লগারদের হত্যা ঠেকাতে সরকারের কি করণীয়?

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী এবং ৩০ মার্চ যথাক্রমে ব্লগার অভিজিত রায় এবং আশিকুর রহমান হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দেশের কর্মপন্থী মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা সরব হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগে খুন হয়েছে বিজয় দাস নামের আরেক ব্লগার। ওয়াসিকুর রহমান বাবুকে ছুরিকাঘাত করে পালানোর সময় হিজড়াদের সহায়তায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের ভাষ্যমতে, ব্লগার ওয়াসিকুর রহমান বাবু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা করেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কুটূক্তি করেছেন। তাই মাসুম নামের একজনের পরিকল্পনায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। ব্লগার ওয়াসিকুর রহমান হত্যাকান্ডের পর এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী বলেন,

'আগের ঘটনাগুলোর অপরাধীদের শাস্তি হলে আবারও ব্লগার খুনের সাহস পেত না জঙ্গিরা।' (কালের কণ্ঠ ০১/০৪/২০১৫)

তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো, ব্লগার রাজীব হায়দার ও অভিজিত হত্যাকান্ড এবং ড. হুমায়ুন আজাদ ও আসিফ মহিউদ্দিনসহ অন্যদের হত্যাচেষ্টা মামলার সুষ্ঠু বিচার হলে জঙ্গিরা আবারও খুন করার সাহস পেত না। কিন্তু তাদের এ ব্যক্তব্যের সাথে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন। বিশেষ করে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মতে, সরকার যদি কথিত মুক্তমনা লেখক-ব্লগারদের বাক স্বাধীনতার নামে ধর্মের উপর মুক্ত হামলার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিত এবং ধর্মাবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করত, তাহলে তারা এত বেপরোয়া হতে পারত না এবং এজাতীয় হত্যাকান্ডেরও পুনরাবৃত্তি ঘটত না। খুনিরাও এত বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ পেত না।

তারা মনে করেন, এসব হত্যাকান্ডের জন্য ধর্মাবমাননার বিরুদ্ধে সরকারের নির্লিপ্ততাই বেশী দায়ী। কারণ এ বিষয়টা খুবই স্পষ্ট, মহান আল্লাহ তা'আলা, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুসলমানগণ হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। এদেশের ৯২ ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ মুসলিম। এসবের অবমাননা তারা কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন না। এটা তাদের আবেগের জায়গা। আর মানুষের আবেগকে মৃত্যু পরোয়ানা, হামলা-মামলা ও ভয় দেখিয়ে কখনোই দমিয়ে রাখা যায় না। দমিয়ে রাখা সম্ভবও নয়। সরকার বা বুদ্ধিজীবিরা যদি মনে করেন যে, কথিত মুক্তমনা লেখক-ব্লগারদেরকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিয়ে দু'একটা খুনিকে বিচার করলেই ব্লগার হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের ধর্মাবমাননা হালাল হয়ে যাবে, এটা নিছর বোকামি ছাড়া কিছু নয়। রোগ নির্ণয় না করে ঔষধ প্রয়োগ করে কোন লাভ নেই। এটাই বাস্তবতা। হত্যাকান্ডের মতো অপরাধের বিচার অবশ্যই হবে। তবে এ ধরণের হত্যাকান্ড বা অপরাধ বন্ধ করার জন্য সবার আগে মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি হওয়ার কারণগুলো বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতি নিয়ে যেন যাচ্ছে তাই মশকরা বা কুটূক্তি করতে কেউ না পারে। সরকার বিষয়টা যত দ্রুত বুঝবে, ততোই তা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

এখানে একথাও বলে রাখতে চাই, যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর বিচার করার দায়িত্ব আদালত ও রাষ্ট্রের। কারো জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অধিকার নেই। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। এটা তার কাজ নয়। এর জন্য অবশ্যই তার বিচার হওয়া উচিত। এ বিষয়টাকে তাকে যেমন ভাবতে হবে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রকেও ভাবতে হবে; কোন ভুক্তভোগীর আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা আছে কিনা? রাষ্ট্র এর জন্য দায়ী কিনা? বিশেষ

করে ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে রাষ্ট্রকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। মানুষের আবেগ ও অনুভূতির জায়গাগুলোকে মর্যাদা দিতে হবে।

দেখুন, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কটূক্তি করার অপরাধে একাধিক ব্যক্তিকে কারাভোগ করতে হচ্ছে। আর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করলে সর্বনিম্ন সাত আর সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছরের জেল, সাথে এক কোটি টাকা জরিমানা। আর আপনার নবীকে নিয়ে কটূক্তি করলে একঘন্টার জেলেরও বিধান নাই...!! তাই হে প্রধানমন্ত্রী বেগম শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া! আপনাদের কাছে আমাদের মুসলমানদের আবদার ও পরামর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কটূক্তিকারীদের মৃত্যুদন্ডের আইন পাশ করে মানুষদেরকে শান্তিতে থাকতে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমিন।

শাহবাগী নাস্তিক-ব্লগারদের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী

আধুনিক শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে তাদের অনেকের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও কথাবার্তা শুনলে আশংকা হয় তাদের ঈমান আছে কিনা। কিন্তু তারা নিজেরাও জানে না কখন তারা ইসলামের গন্ডি থেকে বেড়িয়ে পড়েছে। অভিভাবকগণ যদি সচেতন না হন, উলামায়ে কেরাম যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন তাহলে আগামী ২০ বছর পর আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বড় একটি অংশের অবস্থা এমন হবে- ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। সমাজে এমন কিছু মুসলিম পরিবারের সন্তান আছে যারা ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বেড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এদের সংখ্যা এখনও অতিনগণ্য, যদিও এটা আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ।

তবে এ ধরণের বহু ছেলে-মেয়ে রয়েছে যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা, ভুল জানা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব এমন কি কেউ কেউ এমনও আছে জীবনে কোন হুজুরের সাথে কথাও বলেনি। এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি এমনকি হুজুরের সাথে জীবনে মুসাফাহাও করেনি এবং সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের বিভিন্ন অকাট্য বিষয়ে এমন ধারণা পোষণ করছে যা তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়।সে কিন্তু কখনোই ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতে চায় না, যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় এবং নিজেকে মুসলমানই মনে করে। এদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। স্কুল-কলেজ, ভার্সিটি পড়ুয়াদের মাঝে এ সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে ইসলাম ত্যাগ করেছে

তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। তারা তো জেনে বুঝেই সে পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু যারা না বুঝে বিপথে হাঁটছে এবং তারা মনে করছে যে তারা সঠিক পথেই আছে তাদের ব্যাপারে কি আমাদের ভাবনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি? কেউ মুরতাদ হলে তার শাস্তি বিধান করার যেমন জরুরী তেমনি মুরতাদ হওয়ার পথটা রুদ্ধ করে দেয়া আরও বেশি জরুরি। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থা যেখানে মুরতাদের তেমন কোন শাস্তির বিধান নেই সেখানে ক'জন মুরতাদকে শাস্তি দেওয়া যাবে আর তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখে মানুষ তা থেকে বিরত থাকবে।

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় চলমান অবস্থার প্রতি লক্ষ করলে তো আমাদের জন্য মুরতাদ হওয়ার পথ করাই সবচেয়ে বেশি জরুরি বলে মনে হয়। বিশেষত যারা শুধুমাত্র সঠিক বুঝ ও জ্ঞানের অভাবে বিপথগামী হতে চাচ্ছেন তাদের ব্যাপারে। আমি যদি আজ নিজের ঈমান নিরাপদ ভেবে বসে থাকি তাহলে আগামী ২০ বছর পর আমাদের দেশের জনগণের বিশেষ করে যুবক ও তরুণ শ্রেণীর ঈমানের কী অবস্থা হবে তা কি একবার ভেবে দেখেছি? আমি চোখ বুঝে আসহাবে কাহাফের গোহায় অবস্থান করলে ২৪ বছর পর চোখ খুললে দেখতে পাব, শাহবাগ আর শাহবাগে নেই। শাহবাগ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। আমার পাশের ঘরের চাচাতো ভাই-ই ধ্যান-ধারণায় মুরতাদ-বেঈমান হয়ে গেছে। এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয়। আমার যে ছোট ভাইটি স্কুলে পড়ত এখন ভার্সিটি পাশ করে এসে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ধ্যান-ধারণায় নিজের অজান্তেই মুরতাদ ও কাফের হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তাই নববী দরস ও দরদ নিয়ে দ্বীনের সহীহ আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইসলামের আদর্শ প্রচারে মাঠে নেমে যাওয়াই উচিত। ইসলাম বিদ্বেষী মহল দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মহীন করার জন্য সুকৌশলে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমাদেরকে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। আজ তারা আর রাখ-ঢাক না করে সরাসরি মুসলিম জাতির মূল চেতনাকেন্দ্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষার সময় নেই। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ঠিক তেমনি এদের হাত থেকে হেফাযতের জন্য নিজেদের আমল আক্বীদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। সাথে সাথে অন্যায় যেখানে হবে, জবাব তো সেখানেই দেয়া দরকার। আমরা অনলাইনে না বসলে, নেট ব্রাউজিং না করলে জানবো কেমন করে কোথায় কী হচ্ছে? ইসলাম নিয়ে শুধু রাজপথকেই বেছে নেওয়া কেন? তৎকালীন সময়ে

মক্কার মুশরিকরা নবীর কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখেছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ বিন সাবিতকে নির্দেশ করেছিলেন, কবিতার মাধ্যমে কুটূক্তির জবাব দিতে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকেও বলতেন কবিতার মাধ্যমে কবিতার জবাব দিতে। তাহলে মানেটা কী দাঁড়াল? আঘাত যেখান থেকে যেভাবে আসবে, জবাব সেখানে সেভাবেই দিতে হবে। আর এটা তো যুক্তিরও দাবি। পায়ের আঙুলে আঘাত লাগল। আর মলম-পট্টি লাগালাম মাথায়, তাহলে তো হবে না। এই সহজ কথাটি আমাদের নেতৃত্বের কাছে পরিষ্কার হতে আর কত বছর লাগবে? সুতরাং ব্লগে বা ফেসবুকে কেউ উল্টাপাল্টা কিছু করলে মাঠে-ময়দানে নামার আগে জবাব দিতে হবে সেখানেই। প্রয়োজনের মাত্রা বুঝে মাঠে-ময়দানেও হাজির থাকতে হবে। আর ঐখানে জবাব দিবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণ। আনাড়ি কোন ব্যক্তি নয়।

সরকার ও আইন শৃংখলাবাহিনী চাইলে রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও অবমাননাকারীদের শাস্তি দেওয়া সহজ

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করায় গত ২৫ জানুয়ারী এক যুবককে আটক করে পুলিশ। সোলায়মান কবির শেখ নামের ঐ যুবক গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মুরাগপুর গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে। পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে প্রকাশ, কবির নিজের আইডি থেকে ফেসবুকের পাবলিক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে। গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৫ সোলায়মানের ফেসবুকের পাবলিক পোস্টে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর লেখাটি দেখতে পেয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। (দৈনিক যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারী-২০১৫)

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ফেসবুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপত্তিকর ছবি পোস্ট করায় ২০১৬ সালে ৪ নভেম্বর রাতে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় শফিকুল ইসলাম নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশ। গৌরীপুর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদি হয়ে তথ্য প্রযুক্তি আইন-২০১৩ এর আওতায় একটি মামলা করেছে। (প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর-২০১৩)

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করায় গ্রেফতার ও শাস্তি পাওয়ার এমন ভুরিভুরি নজির পাওয়া যাবে শুধু গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকেই। শাস্তি প্রদানের এই ধারা এখানো অব্যাহত রয়েছে। কিছু দিন আগেও ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকৃত ছবি পোস্ট করার দায়ে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর পৌর মেয়র

মো. নজরুল ইসলামের ছেলে সজীব ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। শাহজাদপুর থানার এসআই আব্দুস সালাম বাদি হয়ে তথ্য প্রযুক্তি আইনে থানায় ওই মামলাটি করেন।

মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্রকার তারেক মুনীরসহ পাঁচজনের মৃত্যুর পর ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস লিখেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। ইনস্টিটিউট অব ইরফরমেশন টেকনোলজির খন্ডকালীন প্রভাষক মুহাম্মদ রুহুল আমীন খন্দকারের ফেসবুকে স্ট্যাটাসটি আপলোড করা হয় ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট। এতে তিনি লেখেন; 'পরীক্ষা ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার ফলে তারেক ও মিশুক মুনীরসহ নিহত ৫; সবাই মরে, হাসিনা মরে না কেন' ২০১২ সালের ৪ জানুয়ারী ওই স্টাটাসের কারণে অস্টেলিয়ার অবস্থানকালীন অভিযুক্ত শিক্ষক রুহুল আমিনকে তার অনুপস্থিতিতে ছয় মাসের কারাদন্ডের সাজা দেন হাইকোর্ট। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এ খবরটি ব্যাপক গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে বলে যে, একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ করার পর দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের নজির হয়তোবা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায় না। (আমরাও চাই এমন বাজে লোকদের বিচার হোক।)

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ করার পর দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও আল্লাহ, রাসূল ও ধর্ম নিয়ে কটাক্ষকারীর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা কখনো দেখি না। না ওয়াশিকুর বাবুর ক্ষেত্রে, না অভিজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে, না রাজিব হায়দার বা অন্য কারো ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগে অভিজিৎ রায় ও রাজীব হায়দারের মতো নিহিত হয়েছে ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবু। অভিজিৎ রায় ও রাজীব হায়দারের ফেসবুক স্ট্যাটাস ও ব্লগের লেখা সম্পর্কে অনেকেই জানে। এবার আসা যাক নিহক ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুর ফেসবুক স্ট্যাটাস প্রসঙ্গে। কী লিখত ২৭ বছরের তরুণ ব্লগার ওয়াশিকুর। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ওয়াশিকুরের একটি স্ট্যাটাস নমুনা হিসেবে তারিখসহ হুবহু তুলে ধরে হলো-

২৭ মার্চ ২০১৫ বেলা ২টা ৭ মিনিটের স্ট্যাটাস :

এক- দুই পাঁচওয়াক্ত নামাজী মুমিনকে বললাম হাজার দশেক টাকা দিতে পারবে কিনা ৬ মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ। উপরিহিসেবে তার যাবতীয় পাপ গ্রহণ করব আর নিজের অ্যাকাউন্টে পুন্যি থাকলে সব দিয়ে দেবো। মুমিন রাজি হলো না। মুমিনদেরও আজকাল ঈমান নেই।

বহু স্ট্যাটাস রয়েছে ওয়াশিকুর রহমান বাবুর যেখানে শুধুই ইসলাম ধর্ম বিদ্বেষী কথা রয়েছে। এ ধরণের বক্তব্য কতটা মুক্তচিন্তার মধ্যে পড়ে তা সচেতন কোন

মানুষেরই বুঝতে কষ্ট হবে না। একজন তরুণ বয়সী ছেলে, যার তখনো পর্যন্ত জানার অনেক কিছু বাকি, হয়তো বা কোন মোহে বা ভুলবশত মুক্তচিন্তা ভেবে ইসলাম বিদ্বেষী কথা লিখছিল, তাকে কি তখনই শোধরানোর দায়িত্ব সরকারের ছিল না? ছেলেটি বছরের পর বছর ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে লিখে গেছে অবিরাম ধারায়।

তাকে যদি শুরুতেই বলা হতো- তোমার ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন চিন্তা করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে একটি ধর্মকে কটাক্ষ করার অধিকার নেই। তাহলে কি এত দূর আসতে পারত? তারই বয়সী অপর কিছু আবেগ তাড়িত তরুণের হাতে তাকে কি এভাবে নির্মম হত্যার শিকার হতে হতো? অনেক সেক্যুলার পন্থী বলছে- "যে কারো ভিন্নমত পোষণের অধিকার রয়েছে।" তাদের প্রশ্ন করতে চাই, আমেরিকার মাটিতে বসে কেউ যদি খ্রিস্টধর্মকে বা ঈসা আ.কে কটাক্ষ করে পাবলিকটি কিছু লিখেন, সেটাকে কি আমেরিকার জনগণ বা সরকার মুক্তচিন্তা হিসেবে গ্রহণ করবে? কেউ যদি ইসরাঈলি জনগণ বা সরকার কি সেটাকে মুক্তচিন্তা হিসেবে গ্রহণ করবে? কেউ যদি ভারতে বসে হিন্দুধর্মকে কটাক্ষ করে পাবলিকলি কিছু লিখেন, ভারতের জনগণ সরকার কি সেটাকে মুক্ত চিন্তা হিসেবে গ্রহণ করবে? চীনে বসে কেউ যদি দেশটির সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাবলিকলি কিছু লিখেন, চীনের সরকার বা জনগণ কী সেটাকে মুক্তচিন্তা হিসেবে আখ্যায়িত করবে?

ওয়াশিকুরের পরিণতির দায় সরকারের ওপরই সবচেয়ে বেশি বর্তায় বলে মনে করি। আর যেন এমন কোন বর্বরোচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনই পদক্ষেপ নেয়া হোক; যাতে কেউ ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ, কিংবা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে না পারে।

স্বাধীনতা মানে অন্যের ধান ক্ষেত মাড়িয়ে যাওয়া নয়

হেফাজতে ইসলামের আমীর দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দা.বা.) বলেন, আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কটূক্তি এবং ধর্ম ও ধর্মবলীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে যেন মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সরকার কঠোর আইন পাশ করে। যাতে করে, ধর্মকেন্দ্রিক মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতা ও সহিংসতা জন্ম না নেয়। হেফাজতে ইসলাম আমীর বলেন, কারো ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ করা, ঘৃণা ছড়ানো, হেয় করা কোন অবস্থাতেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নয়। যেমন স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার থাকা মানে অন্যের ধান ক্ষেত মাড়িয়ে যাওয়া নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে কতিপয় মহল থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

নয়। কেউ যদি কারো মাকে গালি দেয়, কারো কন্যাকে গালি দেয়, অবশ্যই এতে কঠোর প্রতিক্রিয়া তৈরী হবে। এক কলেজের হোস্টেলে ৫০ জন এক সাথে এক রুমে থাকে। আর সবার খেয়াল রাত ১১ টায় বাতি নিভানো হবে। এখন একজন বলে না এটা স্বাধীনতা হরণ করা হবে। আমি যখন ইচ্ছা তখন বাতি নিভাবো চাই রাত ১টা হোক বা ৩টা। এটাই আমাদের স্বাধীনতা।

এটা স্বাধীনতা নয়, বরং শয়তানী। এমন হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যাবে। তাই আমরা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে বার বার দাবী জানিয়ে আসছি যে, কেউ যেন অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে সহিংস কর্মকান্ডে কাউকে প্ররোচিত করতে না পারে, তার জন্য কঠোর আইন থাকা দরকার।

মানুষের ভালবাসার জায়গায় আঘাত করা ভালো মানুষের কাজ নয়

প্রতিটি মানুষের রয়েছে একান্ত ভালবাসার কিছু স্থান যার সাথে জড়িয়ে থাকে তার আবেগ অনুভূতির সম্পর্ক। শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রতিটি রক্ত কণিকায় সে ভালবাসা অনুভূত হয়। যতক্ষণ তার এ ভালবাসার স্থানগুলো নিরাপদ থাকে ততক্ষণ সে নির্ভার নিশ্চিন্ত প্রশান্ত। কিন্তু যখন কোন অপশক্তির দ্বারা তার এ ভালবাসার স্থানগুলো আহত হয়, ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন তার সারা দেহে আগুন জ্বলে ওঠে। তার প্রতিটি রক্ত কণিকা বারুদে পরিণত হয়। ছেলের সামনে মা-বাবা আক্রান্ত হলে পৃথিবীর সব থেকে শান্ত ভদ্র ছেলেটিও বারুদে পরিণত হয়। জীবন বাজি রেখে ঘাতকের উপর যাপিয়ে পড়ে মা-বাবাকে রক্ষা করে। এজন্যই মানবতার মুক্তিরদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ভালোবাসার স্থানগুলোকে নিরাপদ রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, “প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম এত সম্মানিত, যেমন সম্মানিত হজ্বের মাস, আরাফা দিবস ও মক্কানগরী।” এ অমূল্য বাণীর মর্ম কথা হচ্ছে, এ তিনটি বিষয়ের সম্মান রক্ষা করা যেমন প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, তেমনি প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষা করাও প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় ও ভালবাসার মানুষ। আর তাকে নিয়ে যদি কোন কুলাঙ্গার নাস্তিক সমালোচনা বা কুটূক্তি করে তাকে কুকুরের মত পিটিয়ে পিটিয়ে উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার।

মানুষের ভালবাসার আরেকটি জায়গা হচ্ছে তার ধর্ম। এ ভালবাসা সকল ভালবাসার উর্ধ্বে। এ ভালবাসা এত প্রকট যে, এর জন্য মানুষ স্ত্রী, সন্তান, মাতা-পিতা, ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি এমনকি দেশ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

সাহাবায়ে কেরাম চিরতরে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সেখানে মহানবীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও আর ফিরে যাননি। তিনি মদীনাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মক্কা থেকে আগত সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ধর্মের প্রতি ভালবাসা এত শক্তিশালী, এমন লক্ষভেদি যে, শতসহস্র বাধার পাহাড় অতিক্রম করেও সে তার মঞ্জিলে মকসূদ খুঁজে নেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, দীর্ঘদিন যাবত এক শ্রেণীর নির্বোধ, অপরিণামদর্শী লেখক, শিক্ষাবিদ আধুনিকতা ও মুক্ত চিন্তার দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার প্রাণাধিক প্রিয় ধর্ম নিয়ে অবিরাম কুটূক্তি করে যাচ্ছে। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, "ধর্মের অবমাননা করা হলে আমারও সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগে।' প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে ১৬ কোটি তাওহিদী জনতার মনের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এজন্য পদক্ষেপও নেয়া দরকার।

দেবাশীষ রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটূক্তি ও আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় দেবাশীষ দয়াময় নামের এক শিক্ষকের বাড়িঘরে ভাঙচুর করেছে এলাকাবাসী। স্কুলশিক্ষক দেবাশীষ তার ফেসবুকে মহানবী সা.কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে রাতেই তার বাড়িতে হামলা চালায়। পুলিশ তাকে আশুগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকা থেকে আটক করে।

স্থানীয়রা জানায়, দেবাশীষ স্থানীয় লালপুর এসকে দাস চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। সে তার ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে একটি আপত্তিকর স্ট্যাটাস দেয়। রাতে বাড়িতে হামলা হলে দেবাশীষ সেটি ফেসবুক থেকে মুছে ফেলে এবং এ বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে আরেকটি স্ট্যাটাস দেয়। লালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোর্শেদ মাস্টার খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'দেবাশীষ নামে এক শিক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ফেসবুকে কুটূক্তি করায় তার বাড়িতে হামলার খবর শুনেছি। তবে দেবাশীষ আমাকে জানিয়েছে- সে লালনের একটি গান নিয়ে স্ট্যাটাস দেয়।' এ বিষয়ে আশুগঞ্জ থানার ওসি আবু জাফর জানান, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় আমরা দেবাশীষকে আটক করেছি। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজকের নাস্তিকেরা উমরের তরবারির কাহিনী ভুলে গেছে

আজকের কাফির-নাস্তিকেরা উমর (রা.)এর তরবারির কাহিনী ভুলে গিয়েছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দিই, খালেদ ও আলী হায়দানের রঙিন তরবারির ঝনঝনানি শব্দ ওদের কান আজ আর শুনতে পায়না। তাদের শুনিয়ে দেই। হে খোদার সৈনিকরা! আবারো তরবারি খাপ মুক্ত করে ঘোষণা করো, "হে নাস্তিক-বেঈমানেরা! আমরা ঘুমিয়ে যাইনি। আমাদের তন্দ্রা এসেছিল। এবার জেগেছি।" আর এমন একটি নিবেদিতপ্রাণ কাফেলা গঠন করতে রাসূল সা. নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ তেইশটি বছর লেগেছিল। যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে আসীন অধিপত্যবাদী স্বার্থন্বেষী তথা খোদাদ্রোহীদের উৎখাত কর্মসূচী হাতে নেন, তখন ঐ আসন পেতে বসা বেঈমানেরা আপনাআপনি সরে যায়নি। বরং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিবেদিত প্রাণ কাফেলার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আদর্শ বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করেছে। অত্যাচারের নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। ফলশ্রুতিতে আদর্শবান কাফেলা ও খোদাদ্রোহীদের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আর এ সংঘাত নির্যাতন-নিপীড়ন শেষ হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদিনার দিকে হিজরতের মাধ্যমে।

লাঞ্ছিত হলো রাসূল (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র আঁকা সুইডিশ কার্টুনিস্ট

২০০৭ সালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা কার্টুনিস্ট লার্স ভিল্কস বাকস্বাধীনতার ওপর মঙ্গলবার ভাষণ দিতে গিয়েছিল লার্স ভিল্কস। কিন্তু ভাষণ শেষ করার আগেই একজন শ্রোতা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে জানায় ভিল্কস। সুইডিশ পত্রিকাগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, সভাকক্ষের ভেতর চিৎকার করছে ক্ষুব্ধ জনতা। তাদের অনেকেরই পা দেখা যাচ্ছে। সামনে থাকা পুলিশ এক ব্যক্তিকে নিরস্ত্র করতে মরিচের গুঁড়ো মেশানো পিচকিরি ছুঁড়ছে। একটি কুকুরের শরীরের সাথে মহানবী সা. এর পবিত্র মুখমন্ডল এঁকে সমালোচিত হওয়া ভিল্কস কুলাঙ্গার জানোয়ারের বাচ্চা জানায়, স্টকহোম থেকে ৪৪ মাইল দূরের আপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেয়ার সময় সামনের সারিতে থাকা এক শ্রোতা তাকে ঢুঁশো মারেন। বার্তা সংস্থা টিটি কুলাঙ্গার ভিল্কসের বরাত দিয়ে জানায়, জানোয়ারকে ঢুঁশো মারার পর সে ছিটকে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খায়। এতে কুলাঙ্গারের চশমা পড়ে ভেঙ্গে যায়। মূলত ভিল্কসের ওই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পরিস্থিতিই তুলে ধরা হয়েছে ভিডিও চিত্রটিতে। আমরা যুগে যুগে ইতিহাস তালাশ করলে দেখতে পাই এই সকল কুকুরদের মৃত্যুও কুকুরের মত হয়। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব জাহান্নাম।

দেখুন, নাস্তিকরা কত খারাপ, তারা একজন মানুষের মুখ কুকুরের সাথে লটকিয়ে দেয়। অথচ তারা কথায় কথায় মানবতার কথা বলে। এটাই কি মানবতা যে, কোটি কোটি মানুষের নবীর পবিত্র মুখমন্ডল আঁকা ছবি একটি কুকুরের শরীরের সাথে লাগিয়ে দেয়!

বিংশ শতাব্দীর সেরা মিথ্যুক, রাসূল অবমাননাকারী মুফাসসির থেকে সাবধান

আঁধারের পূজারীরা মক্কা থেকে আলোর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল তাতে এখনো কোন দাড়ি পড়েনি। পড়বেও না। তারা তাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা অব্যাহত রাখবেই। রাসূলের আদর্শকে 'বধ' করার ব্যর্থ চেষ্টা তারা চালাবেই। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে এই যুদ্ধে কোন ক্লান্তি আসবে না। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও সম্মান বাড়তেই থাকবে সর্বদা। তবে পছন্দ আপেক্ষিক বিষয়। সবকিছুই সবার পছন্দ হবে এমন নিশ্চয়ই নয়। যে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয় পৃথিবী, তাতেও কেউ কেউ খুঁত খুজে বেড়ায়। কোন কোন প্রাণী নিন্দা করে আলোর। অভিশাপ দেয় সূর্যকে। এটাই বাস্তবতা। তাই বলে চাঁদের কিরণ যেমন ম্লান হয় না, ক্ষয় হয় না জোছনার সৌন্দর্য; আলো কমে না সূর্যের। মাঝখানে যারা বিভক্ত হয়, নিন্দা করে বেড়ায়-নষ্ট হয়। কষ্ট পায় তারাই।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম চরিত্রের মানব। আমরা আরও নির্দিষ্ট করে বললে- মুসলমানরা তাঁকে অনুসরণ করি। তাঁর আলোয় উদ্ভাসিত হই। তাঁর নামেই আল্লাহর কাছে জীবন সমর্পণ করি। তিনি আমাদের আবেগের পবিত্র আধার। ভালোবাসার উজ্জ্বল মিনার। কিন্তু সকলেই তাকে একইভাবে, একই দৃষ্টিকোণে ও বিশ্বাসে মূল্যায়ন করবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করবে, এমনটা কখনো ঘটেনি। ঘটবেও না। কারণ কিছু লোক চায় এবং চাইবেই, আঁধার থাকুক। অন্ধকারে ছেয়ে যাক শুভ্র আকাশ, তাতে সুবিধা তাদের। তারা আলো ভয় পায়। ভয় পায় স্বচ্ছ আকাশ। আলো আসলেই আঁধারকে পালাতে হয়। আলো তাই আজন্মই আঁধারের শত্রু।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আলোর বার্তাবাহক। তিনি সত্যের আলো নিয়ে মাঠে নামার সাথে সাথে ঘিরে ধরেছিল কায়েমী স্বার্থবাদী আঁধারের পূজারীরা। তারা তাঁকে হেয় করার, ছোট করার প্রাণান্তকর অপচেষ্টা করেছে। পথভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খলাকারী, বিভক্তকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে অপবাদ দিয়েছে। কারণ তিনি যে আলো নিয়ে এসেছেন, তাতে আঁধারের পূজারীরা তাদের নিশ্চিত মৃত্যু, কায়েমী স্বার্থের অনিবার্য নিপাতকাল দেখতে পাচ্ছিল। এই

আলো আসার পূর্বে যে স্বার্থবাদীরা মানুষের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, ইচ্ছেমতো পরিচালনা করছিল সকল কিছুকে, এমন স্বেচ্ছাচারিতার বিদায় কাল দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'পাগল, যাদুকর' বলেও পরিত্যক্ত ও নিবৃত করার হাজারো চেষ্টা আঁধারের পূজারীরা করেছিল। কিন্তু আলো সবসময়ই অপ্রতিরুদ্ধ। তাই সত্য সমাগত হয়ে মিথ্যা বিদূরিত হল।

মক্কায় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রাসূল সা. আগমন করলেন। এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত ওই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় তিনি 'বিশ্বস্ত, নিরাপদ ও শান্তির দূত' হিসেবেই বিবেচিত হলেন। কিন্তু যখনই তিনি ওই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার অন্ধকার কুঠুরিতে আঘাত করলেন, তখন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না, তাদের বিচারে তিনি হলেন- অনিষ্টসৃষ্টিকারী, বিশৃঙ্খলাকারী। কিন্তু তার আহ্বানের অন্ধকারে বন্দি থাকা সত্যের পাখিরা, শান্তির কবুতরেরা জীবনের গান শুনতে পেল। তারা ছোটে এলেন, একে একে দলে দলে। সারাবিশ্ব দেখল, মুহাম্মদ সা. এর দিক নির্দেশনায় মাত্র ২৩ বছরে 'জাজিরাতুল আরবে' মানবতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, দুর্বলেরা অধিকার ফিরে পেল, নারী পেল মা, বোন আর স্ত্রী'র সম্মান। পেল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। 'দাসেরা' পেল মনিবের ভাইয়ের মর্যাদা। বন্ধ হল জাতিগত সঙ্ঘাত, সংঘর্ষ। মানুষে মানুষে প্রতিষ্ঠিত হল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। তবে এটা এমনিতেই হয়ে যায়নি। এর জন্যে তাকে পদে পদে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে। নিঃস্ব হতে হয়েছে। নির্বাসনে যেতে হয়েছে। তিনি লড়েছেন। বিজয়ী হয়েছেন। বর্তমান সময়ের নাস্তিক মিথ্যুকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যার পর মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা নতুন কিছুই নয়, সর্বযুগেই নবীদেরকে নিয়ে বেঈমানরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ সা.কে সান্তনা দিয়ে বলেন-

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٧)

"পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের নিকট কোন নবী এসেছে তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে।" (সূরা যুখরুফ : ৬-৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١١)

(হে নবী মুহাম্মদ সা.)
"আপনার পূর্বে আমি আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের নিকট আসেননি এমন কোন রাসূল, যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।"
(সূরা হিজর : ১০-১১)

আল্লাহ রাসূল সা.কে সান্তনা দিতে গিয়ে আরো বলেন-

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

"আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যে আযাব নিয়ে ঠাট্টা করত, তা তাদেরকে ঘিরে ধরেছিল।" (সূরা আম্বিয়া : ৪১)
অর্থাৎ আম্বিয়া (আ.) তাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাতেন তা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। (বর্তমান নাস্তিকরা যা করে) পরে সেই আযাবই তাদেরকে বেষ্টন করেছিল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে যমিনকে তাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করা হয়েছিল। বাংলাদেশে স্বঘোষিত নাস্তিক কাজ্জাব মুফাসসির ও তার সহযোগী আসাদ নূর ও অন্যান্য নাস্তিক যারা রাসূল সা.কে নিয়ে মিথ্যাচার করতেছে এটা আমরা জানি। তারা মিথ্যাবাদী, টাউট ও ধোঁকাবাজ মানুষরূপী শয়তান। মুফাসসির বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অনেক কুটূক্তি করছে, সে বলেছে, "আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.) এর পিতা নয়। এ ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। কেউ দেখাতে পারবে না। অথচ হুদায়বিয়ার সন্ধির হাদীসে দেখানো হয়েছে।
নাস্তিকদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে আমার একটি কিতাবে। কিতাবের নাম 'নব্য নাস্তিকদের সকল প্রশ্নের সমাধান'। নাস্তিকরা মিথ্যাবাদী তাদের মিথ্যাচারের জবাব হযরতে উলামায়ে কেরাম ও হাসান ভাই দিয়েছেন। নাস্তিকদের কপালে ধ্বংসই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝

"যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা মুজাদালাহ-২০)
যারা আসলে হেদায়েত চায় আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখান। আর যারা ভুল ধরার নিয়তে ও যাদের দিলে বক্রতা আছে তারা তো সবকিছুর মধ্যে বক্রতা দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন-

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

"তবে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে।"
(সূরা আলে ইমরান-৭)

আল্লাহ আরো বলেন-

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

"তারা যখন বক্র হয়ে চলেছে, আল্লাহ তাদেরকে বক্র করে দিয়েছেন।"
(সূরা সফ-৫)

নির্বোধিরা তাদের অল্প জ্ঞানকেই খুব বড় মনে করে অহংকারের সাথে ইসলাম ও ইসলাম ধর্মের নবী সা.কে নিয়ে কটাক্ষ করে চলেছে। মুক্তচিন্তার নামে যাচ্ছে তাই বকে যাচ্ছে। আফসোস শত আফসোস এই সমস্ত নাদানদের জন্য। আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মদ সা.) "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করেছিলে? (সূরা তওবা-৬৫)
আল্লাহ আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুসলমানদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দিব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, যা অতি মন্দ ঠিকানা।" (সূরা নিসা-১১৫)
হে নাস্তিকরা! খুব ফূর্তি করতেছ করতে থাক। হে মুফাসসিল, হে আব্দুল্লাহ আল মাসউদ! আর অন্যান্য নাস্তিকদের বলছি, তোমাদের এই ফূর্তিই তোমাদের চিরস্থায়ী মছিবতের কারণ হবে।

আধুনিক শিক্ষিতরাই কি ইসলাম ধ্বংসকারী ইংরেজ?

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ম্যাকলের হাতে মগজ ধোলাইয়ের শিকার আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ আর এই সমাজের ধারণা, ধর্ম, পরকাল এগুলো হচ্ছে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা। ধর্মের পরিধি মসজিদ-মাদ্রাসা, মঠ-মন্দির ও গীর্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশাল কর্মজীবনে ধর্মের কোন স্থান থাকতে পারে না। তাই তারা কেবল খৎনাও মরণোত্তর দাফন-কাফন ও ফাতেহা-খানীর সময় ধর্ম ও ধার্মিকদের শরণাপন্ন হন। অন্য সময় এড়িয়ে চলেন এবং নিজেদের শাসন সংবিধানসহ গোটা জাগতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সাবেক মনিব বৃটিশ বেনিয়াদের রেখে যাওয়া বস্তাপঁচা শোষণমূলক শিক্ষা, বিচার ও শাসনব্যবস্থাকে প্রভুর দেয়া বিধানজ্ঞানে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন। যেখানে কোন নতুন আইনের প্রয়োজন হয়, সেখানে নিজেদের সুবিধামত ঠিক হিন্দু-ব্রাহ্মণদের মতো করে তা প্রণয়ন করে আম-জনতার উপর চালিয়ে দেন, আর এটাকেই তারা অভিহিত করেন প্রগতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বলে। এ কথাটিই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলতেন- "সাদা ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্তু কালো ইংরেজরা জনগণের মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে রয়েছে।"

লর্ড বেন্টিং এর শাসনামলের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাকলের সেই পৌনে দু'শ বছর পূর্বের কথাটি স্মর্তব্য, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সময় চেয়ারম্যানরূপে কাস্টিং ভোট দিতে গিয়ে উক্ত দূরদর্শী ইংরেজ ভদ্রলোকটি বলেছিলেন-"আমি চাই, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনি প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা এদেশেরই আলো বাতাসে মানুষ হবে বটে, কিন্তু মনমগজে তারা হবে একেবারে বিলেতী ইংরেজ।"

তার সে স্বপ্ন এমনি সফল হয়েছে যে, উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদী তা লক্ষ্য করে বলে উঠেছিলেন- [অর্থ]

"ফেরাউন যদি কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মগজ ধোলাইয়ের এ সহজ ফর্মূলাটা পেয়ে যেতো, তাহলে বনী ইসরাঈল বংশের শিশুদেরকে হত্যা করে দুর্নাম কুড়ানোর প্রয়োজন তার হতো না।"

এরূপ আদর্শহীন শিক্ষার মহড়া দেখে ড. ইকবাল একজন কেম্বিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক শিক্ষিত লোক হয়েও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন-[অর্থ]

"শিক্ষা কর্তৃপক্ষের খেলাফ অভিযোগ হে খোদা শোন/ ঈগল ছানারে শেখায় যে ওরা মর্তে চলার সবক-পাঠ।"

আজ ইসলামের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার, পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য কোন বিধর্মীর দরকার হয় না। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় 'কবিগুরু' বলে নন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত আদাজল খেয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, এজন্যে মিছিল-মিটিংয়ে নেতৃত্ব দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি, আর গোটা হিন্দু সমাজ যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ব্যঙ্গ করে বলত 'মক্কা ইউনিভার্সিটি'; বঙ্গীয় মুসলিম জাগরণের সেই কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে আজ আমরা ঐ পবিত্র শিক্ষাঙ্গন থেকেই মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বাঘরে জাহিলিয়াত যুগে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপনের মত করে তথাকথিত ভাস্কর দিয়ে সাজিয়ে এর পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জাহিলিয়াতের যুগের মক্কা বানিয়ে ফেলেছি। যাদের অসংখ্য নিশি জাগরণ ও বুকের রক্তক্ষরণে 'বাংলার মুসলিম চাষাভূষার সন্তানদের'কে স্বজাতিত্বের ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল, সেই নবাব খাজা সালীমুল্লাহ ও ধনবাড়ির জমিদার নবাব নওয়াব আলীর কোন স্মৃতিচারণই আর এখানে হয় না। মূর্তি আশ্রিত এ নতুন কা'বাকে কেন্দ্র করে এখন ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করার মহোৎসব চলছে। হে খোদা! তোমার আকাশ কেন বিদীর্ণ হয়ে আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ছে না!

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেকটি মানব সন্তানই ফিৎরত বা স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতাই ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিউপাসক বানায়।"

(বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৩১৯)

জাতীয় পর্যায়ে পিতামাতার স্থলে এ ভূমিকাটি পালন করে সরকার অথবা সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা। প্রায় দু'শ বছর পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে চলেছিল বৃটিশ বেনিয়াদের শাসন আর হিন্দু পন্ডিতদের শিক্ষকতা। মুসলমানরা সেখানে ছিল নাচার। একমাত্র কওমী মাদরাসাগুলো ছাড়া অন্য কিছুই এমন কি তাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। মুসলিম জমিদাররা মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে যাও একটু আধটু অবদান রাখতেন, কিন্তু ১৭৯৩ সালের কুখ্যাত সূর্যাস্ত আইন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদেরকে পথের ফকির বানিয়ে দিয়ে হিন্দু গোমস্তাদেরকে রাতারাতি জমিদার বানিয়ে দিয়ে সে পথতো চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হল! মুসলিম জনতা ঘৃণা ও ক্ষোভে ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এ কথাটিকে আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞলোকেরা এভাবে বলে- "আলেম সমাজ মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিখতে বারণ করে এ জাতিটাকে পিছিয়ে দিলেন।"

ডব্লিউ ডব্লিউ হানটার ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যখন আমরা দেখলাম যে, বাংলার এক তৃতীয়াংশ ভূ-সম্পদই আমাদের সরকারের আওতার বাইরে ওয়াকফরূপে রয়ে গেছে তখন সকল নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের সরকার তাও তাদের হাত থেকে কেড়ে নিল।' তিনি তার ঐ গ্রন্থে আরো লিখেছেন, 'আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টি কারণে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি : ১। তাতে তাদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। ২। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বাণিজ্যিক ধরণের। অথচ তারা অবৈতনিক ফ্রি শিক্ষায় অভ্যস্থ ছিল। এছাড়া এত অর্থ ব্যয়ের সংহতিও তাদের অধিকাংশ পরিবারের ছিল না।'

নিজ ধর্মবিশ্বাস ও নবীর সুন্নত অনুসরণে দাড়ি রাখতেও ঐ যুগে কোন কোন এলাকায় হিন্দু জমিদারকে দিতে হত আড়াই টাকা ট্যাক্স; যার আজকের বাজারদর এক লক্ষ টাকারও বেশী।

এসমস্ত অত্যাচার নিপীড়নের যাতাকল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপমহাদেশের মুসলিমরা জীবন ও রক্ত দিয়েছিল কি এই জন্য যে, এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কুটূক্তি করবে?ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে? তাসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দার, ডা. আলী আকবর, আসিফ মহিউদ্দীন, আহমদ শরীফ, শামসুর রহমান, হুমায়ূন আজাদ, লতিফ সিদ্দিকী, আ. গাফফার চৌধুরী, ইমরান এইচ সরকার, অমি রহমান পিয়ার, আরিফুর রহমান ওরফে নিতাই ভট্টাচার্য,মুফাসসিল ইসলাম, আসাদ নূরদের মতো কুলাঙ্গারদেরকে সৃষ্টি করবে। যারা সবসময় ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বদনাম করার জন্য লেগে আছে। না এই উদ্দেশ্যে এই কলেজ বানানো হয়নি। তারাই কাল ইংরেজদের দালাল।

আল্লাহ-রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য কটূক্তিকারী নাস্তিক ব্লগার রাজিবের মাত্রাহীন স্বাধীনতাই করুণ পরিণতি ডেকে আনে

ব্লগার আহমদ রাজীব হায়দার শুভ ওরফে 'থাবা বাবা' মহান আল্লাহ এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও শান্তির দূত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর স্ত্রী, বিভিন্ন সাহাবী, হজ্ব, পর্দা, কুরবানীসহ ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত, পরিভাষা ইত্যাদি নিয়ে অকথ্য ও অপ্রকাশযোগ্য ভাষায় গালাগাল, কুৎসা, অশ্লীল ও বানোয়াট কাহিনী ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্লগে ও বিভিন্ন সামাজিক সাইটে নিয়মিত লিখে তা প্রচার করে আসছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করে চলেছে তাঁর জীবন সম্পর্কে এবং তাকে হেয় করে যে মিথ্যা কল্পকাহিনী রচনা করেছে, তাতে ঈমানদার প্রতিটি মুসলমানই চরম মর্মাহত হয়েছেন। ব্লগার রাজীব ওয়াজ রীতি অনুসরণ করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। যৌনতাকে তার ব্লগে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে হাজির করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদেরকে নিয়ে এমন কুরুচিপূর্ণ কথা বলেছে, যা প্রকাশ করার মত না। নূরানী চাপা সমগ্র ঘেঁটে দেখা গেছে, এমন কুরুচির মন্তব্যধর্মী লেখা ইসলামের দুশমনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

রাজিব জানোয়ারের বাচ্চা আমাদের নবীকে মহাম্মক ও মহাউন্মাদ বলে ডাকত। (নাউযুবিল্লাহ) তার এই কটূক্তির কারণে পাঁচজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান যুবক তাকে জাহান্নামের টিকিট ধরিয়ে দেয়। তারা হল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রেদোয়ানুল আজাদ রানা ও ফয়সাল বিন নাঈম দীপ অনিক, রুম্মান নাফিস। ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়া হয়। দেখুন তার কিছু লেখা- ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রোপাগান্ডাকারী ব্লগ হচ্ছে সদ্যপ্রয়াত আহমদ রাজিব শুভ ওরফে 'থাবা বাবা'র 'ধর্মকারী' ব্লগ। ধর্মকারী শব্দের বাহ্যত অর্থ ধর্মপালনকারী হলেও এখানে সেই অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি।

বরং মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এমন নাম ব্যবহার করে তার অর্থ রাজিব নিজেই কোন রাখডাক ছাড়াই ব্যক্ত করে বলেছে যে, ধর্মকারী (dhormockery) অর্থ ধর্ম নিয়ে মস্কারী। আর এর উপর ভিত্তি করে সে এখানে জঘন্য ভাষায় আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে কটূক্তি করে চরমভাবে ইসলামের ওপর আঘাত হেনেছে। ধর্মকারী ব্লগের ব্যানারে সে লিখেছে- "ধর্মই সকল কৌতুকের উৎস" এর বানান লিখেছে এভাবে- ধর্মকারী (dhormockery) অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে মস্কারী।

আর এর একাউন্ডে সে লিখেছে- 'এই ব্লগে ধর্মের সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে। অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে।.... এরপর বক্রাকারে লিখেছে- 'ধর্মকারী ব্লগের কোন কিছু আপনার অনুভূতিতে আহত করলে তা আমাদের নজরে আনুন, যাতে সবাই মিলে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারি।' এমনকি রাজিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুহাম্মদকে ব্যঙ্গ করে 'মহাউম্মদ' বানিয়ে রচিত 'হযরত মহাউম্মদ ও কোরান-হাদীস রঙ্গনামে মারাত্মক অবমাননাকর ও অশ্লীল ই-বুক প্রকাশ করেছে। রাসূল সা. এর নামে নানারকম বঙ্গাত্মক অশ্লীল কার্টুন (ডেনিশ কার্টুন) ব্যবহার করে মহানবী সা. এর শানে নোংরা ইংঙ্গিত দ্বারা তাঁর চরম অবমাননা করেছে। রাসূল সা. এর নামে অনেকগুলো অশ্লীল উলঙ্গ কার্টুন ছেপে তার চরম পর্যায়ের অবমাননা করেছে।

দ্রষ্টব্য :http://dhormockery.blogspot.com)

রাসূল অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগারদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই

যুগে যুগে শয়তানের প্ররোচনায় নাস্তিক-মুরতাদ ও যিনদীক কাফির-বেদ্বীনরা ইসলামের ওপর নানাভাবে হামলা চালিয়েছে। দ্বীনের মর্দে মুজাহিদগণ তার সমুচিত জবাব দিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর যমানার এ কুচক্রীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে, তাঁর নির্দেশে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদের মুকাবিলা করেন। তেমনি পরবর্তীতে তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন ও আইম্মায়ে দ্বীন ইসলামের ওপর হামলাকারী নাস্তিক-মুরতাদ ও কাফিরদের মুকাবিলার ধারা অব্যাহত রাখেন। আর এটা জরুরী এজন্য যে, যাতে তাদের ষড়যন্ত্র সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হুমকীর মুখে না পড়ে। এ যুগেও সেই যিনদীক কুফরী (চক্র) তৎপর সালমান রুশদী ইসলাম ও রাসূল সা. এর অবমাননা করে 'স্যাটানিক ভার্সেস' লিখে এবং তাসলিমা নাসরিন ইসলামের বিভিন্ন বিধানের বিরুদ্ধে কুটূক্তি করে 'নির্বাচিত কলাম' লিখে মুসলমানদের প্রাণে আঘাত করেছে? এর দরুণ মুসলমানদের

প্রতিরোধের মুখে লাঞ্ছনা-গঞ্চনা নিয়ে নানা দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বেঁচে থাকতেও যেন দুনিয়া তাদের জন্য সংকীর্ণ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে।

অপরদিকে ড. আহমদ শরীফ, কবির চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় পরিবেশ বিষাক্ত হলে, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রচন্ড বিক্ষোভে তারা নিগৃহীত হন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, তাদের তল্পিবাহকরা আজ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ আধুনিক নাস্তিক প্রজন্ম নেটপ্রযুক্তির ওপর সওয়ার হয়ে ব্লগ, ফেসবুক, ওয়েবপেজ ইত্যাদির মাধ্যমে যেভাবে মহান আল্লাহ, মহানবী সা. এর ওপর ভয়ঙ্কর নোংরা ও অকথ্য ভাষায় আক্রমণ চালাচ্ছে, যা এ যাবত কোন নাস্তিক কুলাঙ্গার এ ধরণের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের দুঃসাহস দেখায়নি। মহানবী সা. সম্পর্কে এমন জঘন্য অবমাননাকর শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করছে, যা কোন সভ্য ও সুস্থবিবেকবান মানুষের মুখ দিয়ে বের হওয়া তো দূরের কথা, তার কল্পনাও করা যায় না।

এ নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগারদের ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও নাস্তিক্যবাদ ছড়ানোর অন্যতম ব্লগ হচ্ছে 'মুক্তমনা' ব্লগ। মুক্তবুদ্ধিচর্চা বা মুক্তচিন্তার দোহাই দিয়ে এ ব্লগের নীতিমালায়ই এটা লেখা হয়েছে যে, এ ব্লগের সদস্য হতে হলে, নাস্তিক বা ধর্মবিশ্বাসমুক্ত হতে হবে। না হলে নাকি মুক্তমনা হওয়া যাবে না। যার ফলে কিছু, কিছু বামপন্থী কমিউনিস্ট আর কিছু মুসলিম ঘরের দ্বীনচ্যুত নাস্তিক-মুরতাদ মিলে এ ব্লগকে সম্পূর্ণ ইসলামবিদ্বেষী আখড়ায় পরিণত করেছে। তারা এখানে ইসলাম মহানবী সা.কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ লেখা পোস্ট করে এবং কমেন্টে রাসূলের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক মন্তব্য করে ধর্মদ্রোহী নাস্তিক্যবাদের কুহেলিকা ছড়ায়। রাজিবের কথা তো পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তেমনিরূপ আরেক ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ব্লগার হচ্ছে শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী ধর্মদ্রোহী আসিফ মহিউদ্দীন। 'অবিশ্বাস দীর্ঘজীবী হোক' পোস্টে আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে উপহাস করে বলেছে- 'ধর্ম প্রবর্তকরা তৈরী করেছে কল্পকাহিনী, বানিয়েছে কল্পিত আল্লাহ....।'

তেমনিভাবে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তীব্র কুৎসাকারী আরেক ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ব্লগার হলো আরিফুর রহমান। এই কুপমন্ডক আল্লাহ তা'আলাকে ভুয়া এবং মহানবী সা.কে লুচ্চা বলে গালি দিয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে মুক্তমনা, সামহোয়্যার, নাগরিক ব্লক প্রভৃতিতে অনেক লেখা পোস্ট করেছে। তার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তার আসল নাম নিতাই ভট্টাচার্য। তাইতো ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি করলেও হিন্দুধর্মের

পক্ষে সে সাফাই গেয়েছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকেই সে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে নানারকম অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা পোস্ট করেছে।

(দ্রষ্টব্য : http:// mukto mona.net/bangla-blog/?p=25362/ http:// www. nagorikblog.com/node.9777)

অনুরূপ আরেক কাট্টা নাস্তিক ব্লগার হলো খলীলুর রহমান সুমন সওদাগর ওরফে সবাক। সে সামহোয়্যার ব্লগে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কুটূক্তি করেছে 'ঈশ্বর দর্শন : গাজাখোর পর্ব' শিরোনামে সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সীমাহীন বেয়াদবী করে বলেছে, 'আল্লাহ, কেবল গরীবেরই পুটকি মারলা।' (নাউযুবিল্লাহ) এরপর সে বলেছে-স্রষ্টার যদি কখনো ....(অশ্লীল শব্দ) মারার ইচ্ছা হয়, তবে গরীবের ....(অশ্লীল শব্দ) মারাই উনার বেশী পছন্দ। সে আরো বলেছে, 'ঈশ্বরের জন্ম যেহেতু ক্ষমতাশালীদের প্রয়োজনে, সেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবেই দুর্বলের শত্রু।' (নাউযুবিল্লাহ)

(দ্রষ্টব্য :http:// www.somewhereinblog.net/blog/sami-Aero 007/29196337)

ইসলাম বিরোধী ব্লগারদের আরেকজন হলো অমি রহমান পিয়ার। ইসলাম বিরোধিতার থিঙ্ক নিয়ে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করে নির্মিত একটি ডেনিস কার্টুন তার ফেসবুকের প্রোফাইল বানিয়েছিল। এ নিয়ে তখন পরিস্থিতি খুব সরগরম হয়েছিল। একথা সে 'কার্টুনের রাজনীতির নেপথ্যে' পোস্টে স্বীকার করেছে। স্বঘোষিত পর্ণোস্টার আশ্রম মামা খ্যাত অমি রহমান পিয়ার কমেন্টে অশ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে ব্লগ ক্রাইম করে তাকে আবার 'সাওয়াবের কাজ' বলে ইসলামের অবমাননা করেছে। সে তার ব্লগকমেন্টে রাজাকারের সাথে বলাৎকার করাকে সাওয়াবের কাজ বলে মন্তব্য করেছে, যা ইসলাম নিয়ে উপহাসের চরম ধৃষ্টতা বৈকি।

(দ্রষ্টব্য : http:// m.somewhereinblog.net/blog/confugedblog/ 28754948)

অন্য আরো কমেন্টে অমি রহমান পিয়ার এমনি ধরণের কাজ করেছে। হাদীস শরীফের বিবরণ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পূর্বে মিসওয়াক করার ইচ্ছা করলে, তা শক্ত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সা. তা চিবিয়ে নরম করে দিতে বলেন। হযরত আয়েশা রা. তা চিবিয়ে নরম করে দেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিয়ে মিসওয়াক করেন। এ বিষয়েই হযরত আয়েশা রা. বলেন, যে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি এর মাধ্যমে সেই মিসওয়াক দ্বারা রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পূর্বে তার মুখের লালাও আমার লালা মিলিয়ে দিয়েছেন। (বুখারী শরীফ) কিন্তু এ ঘটনাকে

অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে 'ইতিহাসে' নামক পাপিষ্ঠাত্মা নাস্তিক ব্লগার 'আমার ব্লগ ডট কম'- এ পোস্ট দিয়ে বলে- "নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম নিতে পারেন নাই। কারণ, শেষ মুহূর্তে তিনি বিবি আয়েশার সাথে লিপকিসিং করছিলেন।" (নাউযুবিল্লাহ)

(দ্রষ্টব্য : http:// www.arriarblog.com/history/posts/53094)

কুলাঙ্গার সেই নাস্তিকের কত বড় স্পর্ধা! সে আল্লাহর রাসূল সা.সম্পর্কে এমন ডাহা মিথ্যা কথা প্রচার করে অপবাদ লাগায়। আবার তা হাদীসের নামে! এক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে সে যা পেশ করেছে, তা হচ্ছে উক্ত বর্ণিত হাদীসের ইংরেজী অনুবাদ। অরজিনাল আরবী হাদীস পড়া বা বুঝার মুরাদ নেই, অথচ হাদীসের বিষয় নিয়ে লাফালাফি! কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে যে বলা হয়েছে- হযরত আয়িশার লালা ও রাসূলুল্লাহর লালাএকত্রিত হয়েছিল। এটাকেই সেই মিথ্যুক বাটপার বুঝিয়েছে ঠোঁটে ঠোঁটে চুম্বন। (নাউযুবিল্লাহ) এভাবেই নাস্তিক ব্লগাররা কুরআন ও হাদীসের উল্টো ব্যাখ্যা করে বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে থাকে। কিন্তু সরলমনা পাঠকরা মূল বিষয়টি জানতে না পেরে কুরআন-হাদীসের নাম শুনেই তা বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়। দুঃখের বিষয় যে, অমি রহমান পিয়ার সেই পোস্টে নাস্তিক্য ঘেঁষা কমেন্ট করেছে। সে সেই নাস্তিকের সাথে সুর মিলিয়ে লিখেছে- '.... সম্ভবত তাকে চুম্বন করেছেন।' এরপর সে বিষয়টিকে আরো নোংরামীতে নিয়ে লিখেছে- 'এখন পুরা সিনারিটা নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে ও কল্পনা কইরা আপনি যদি যৌনতৃপ্তি পান, তাহলে সেই ছোয়াবের ভাগীদার কে হইবো তা আল্লাহ মাবুদই জানেন...।' (নাউযুবিল্লাহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন (রা.) এর পবিত্র জীবন নিয়ে গর্হিত নোংরামীর কী স্পর্ধা! আবার তাতে ছোয়াব বলে উপহাস! ঈমান ও ইসলাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার একি ধৃষ্টতা!

নাস্তিকরা হাজার মিথ্যা নাম ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে হাজার হাজার মিথ্যা কটূক্তি চালিয়েছে। যা এত নোংরা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ডিজিটাল দুনিয়ার নাস্তিক-ব্লগারদের এ অপতৎপরতা ২০১০ সন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। তখন তারা সংখ্যায় ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। যাদের কেউ বিজ্ঞান-দর্শনের চোরাবালিতে পড়ে খোঁড়া যুক্তির অন্ধকূপে নিপতিত হয়ে ধর্ম বিতারণের থিউরী লাভ করেছে। আবার কেউ আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, কবীর চৌধুরী প্রমুখ নাস্তিক শিক্ষকদের থেকে এ সবক গ্রহণ করেছে। তেমনি পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিস্টানদের কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে অনলাইন অপপ্রচার দ্বারাও তাদের অনেকের মতিভ্রম ঘটেছে। আর সেই

বিধর্মীদের ওয়েবসাইট থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদমূলক নানা কিছু তারা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এদেশে প্রচারে নেমেছে। এভাবে করে উঠতি শিক্ষানবীশ নিউ জেনারেশনের মধ্যে তারা ব্যাপকভাবে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়িয়েছে। নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগারদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা খুবই ভয়াবহ। নাস্তিক ব্লগাররা তাদের ব্লগে প্রগতিশীলতার নামে ধর্মবিদ্বেষ লালন করে যেভাবে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও জঘন্য রকম কুটূক্তি করেছে, ইসলামের বিধানে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। মুসলিম দেশ হিসেবে এদেশের সরকারের জন্য সেই ইসলামী বিধানের আলোকে ব্লাসফেমী আইন করে এ মুহূর্তে তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে তাদের সেই শাস্তি নিশ্চিত করা সময়ের দাবী।

আমরা সরকারের কাছে একান্তভাবে এটা কামনা করছি। আর ভবিষ্যতে যেন এভাবে নেটপ্রযুক্তিকে কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য যথাযথ আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় নজরদারী ও অপরাধীকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছি। সেই সাথে দেশের জনগণকে এবং বিশেষভাবে অভিভাবকগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করছি, যেন কারো সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কেউ নাস্তিকদের খপ্পরে পড়ে পথভ্রষ্ট বা দিক ভ্রান্ত না হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে-ঈমান এত বড় দৌলত যে, তা না থাকলে চিরস্থায়ীরূপে জাহান্নামী হয়ে যাবে। তাই অমূল্য এ সম্পদের হিফাজত করতে হবে আমাদের সর্বোচ্চ ইহতিমামের সাথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকে।

লতিফ সিদ্দিকীর নবীবিরোধী মন্তব্য

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসের একটি হোটেলে টাঙ্গাইলবাসীর মতবিনিময় সভায় লতিফ সিদ্দিকী বলেছিলেন-"আমি জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। তার চেয়েও বেশি বিরোধী হজ ও তাবলীগ জামাতের।" তিনি আরো বলেছেন, 'এ হজ যে কত ম্যান পাওয়ার নষ্ট হয়। হজের জন্য ২০ লক্ষ লোক আজ সৌদি আরবে গিয়েছে। এদের কোন কাম নেই। এদের কোন প্রডাকশন নেই। শুধু রিডাকশন দিচ্ছে। শুধু খাচ্ছে আর দেশের টাকা দিয়ে আসছে।' সে আরো বলেছে, এভারেজে যদি বাংলাদেশ থেকে এক লাখ লোক হজে যায়, প্রত্যেকের পাঁচ লাখ টাকা করে ৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়। হজের শুরু প্রসঙ্গে এই শয়তান বলে, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ চিন্তা করল এ জাজিরাতুল আরবের লোকেরা কিভাবে চলবে। তারা তো ছিল ডাকাত। তখন

একটি ব্যবস্থা করল যে, অনুসারীরা প্রতি বছর একবার একসাথে মিলিত হবে। এর মধ্য দিয়ে একটি আয় ইনকামের ব্যবস্থা হবে।'

আগে শুনতাম যে, লতিফ সিদ্দিকী পড়াশোনা করা লোক। হজের ইতিহাস তো এদেশের অশিক্ষিত লোকেরাও জানে। মানবজাতির শুরু থেকেই কা'বাগৃহকে ঘিরে ইবাদত চলে এসেছে। অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে হজের সূচনা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব প্রবর্তন করেন নি। তাবলীগ জামাতের সমালোচনা করে বলে, তাবলীগ জামাত প্রতি বছর ২০ লাখ লোকের জমায়েত করে। নিজেদের তো কোন কাজ নেই। সারা দেশের গাড়িঘোড়া তারা বন্ধ করে দেয়।' (নয়াদিগন্ত, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

লতিফ সিদ্দিকীর এ বক্তব্যের ফলে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও সচেতন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা বলেছেন যে, সে হজ, মহানবী সা. ও তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কুটূক্তি করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত হেনেছে। এমন আচরণ করার পর কারো ঈমান থাকে না। তারা মন্ত্রীর ব্যক্তব্য প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। তার এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের দাবিও করা হয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হজ্ব অস্বীকারকারী কোনদিন মুসলিম হতে পারে না। সে মুরতাদ হয়ে গেছে। খালেস দিলে তওবা করে যদি ইসলামে ফিরে আসে তাহলে ভিন্ন কথা। তার বল্গাহীন ঔদ্ধত্বপূর্ণ, ব্যঙ্গাত্মক, অবমাননাকর ও অশোভন উক্তিতে তার ইসলামী আক্বীদা বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর মতো রাজনৈতিক কুলাঙ্গারদের ইসলাম বিরোধী মানসিকতার লাল ও বিকাশের এমন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়েও ভুলে যান তার দ্বীনের কথা, তার ধর্মের কথা।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অনৈতিক পথে দমন করতে করতে এমন উন্নাসিকতা সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে মহান পূতঃপবিত্র ব্যক্তিত্ব, রাসূল সা.কে পর্যন্ত সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে দিলেন না।

ইসলামের মূল বিধান অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস কিভাবে সৃষ্টি হলো ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের একজন মন্ত্রীর, এটা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। দীর্ঘ ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে প্রাজ্ঞ একজন মন্ত্রী কী করে এতটা বেপরোয়া হতে পারে, তা আজকে আমাদের ভাবনার বিষয়। তাহলে আমরা কি ধরে নিব যে, বাংলাদেশ দ্রুতই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

লতিফ নিজের ঔদ্বত্যপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখে প্রথমে দেশে ফিরে আসতে সাহস পায় নি। বিদেশে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করে। দেশে তার বিরুদ্ধে কিছু

মামলা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর (হয়তো কেউ তাকে অভয় দেয়ার কারণে) হঠাৎ তিনি দেশে ফিরে এসে থানায় আত্মসমর্পন করে। পরে জামিনে জেল থেকে বের হয়ে তিনি স্বাভাবিক জীবন শুরু করেন। সম্প্রতি সংসদে গিয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেছে এবং জাতির নিকট ক্ষমা চেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মাজারে গিয়ে পরে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। লতিফ সিদ্দিকী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নিদারুণ আঘাত হেনেছেন। হয়তো সে ভাবনা থেকে তিনি সংসদের বক্তৃতায় জাতির নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হজ্ব ও বিশ্বনবীর সঙ্গে তিনি যে বেয়াদবি করেছেন, তার সুরাহা কিভাবে হবে? ইসলামের দৃষ্টিতে তার যে অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে, যা বরেণ্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রতিকার না হলে উম্মাহর মূল ধারায় তিনি গ্রহণযোগ্য হতে পারেন কি? এটা জাতির কাছে প্রশ্ন।

আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রাসূলবিরোধী মন্তব্য

ছাগলে কী না খায় পাগলে কী না কয়। আর মস্তিষ্ক বিকৃত, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী অথবা পাগল যাই বলি না কেন, তার মুখে কোন কথা আটকায় না। আ.গাফফার নাম ধারণ করায় আমরা তাকে মুসলিম বলেই জানি। কিন্তু জীবনের এ পরিণতি সময়ে এসে (৮১ বছর) তিনি ইসলাম, মুসলমান, আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ নানা মন্তব্য করে ঈমানহারা হয়ে কবরে যাবেন অথবা শেষ বয়সে ধর্মপ্রাণ মানুষের ঘৃণা কুড়াবেন তা কারোই ভালো লাগার কথা নয়।

সম্প্রতি জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি অফিস পবিত্র রমজানে (জুলাই ২০১৫) আ.গাফফার চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা দিতে ডেকে নিয়ে যায়। তাকে বক্তৃতা করতে দিলে লতিফ সিদ্দিকীর মত তিনিও ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল সা.কেই পেয়ে বসলেন। আ.গাফফার চৌধুরীর আলোচনায় সেখানকার আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দেরও মাথা হেট হয়ে গেছে। তারা বিব্রত লজ্জাবোধ করেছেন। আ.গাফফার চৌধুরীর অজ্ঞতার একটা পরিসীমা থাকা উচিত। তিনি নির্দ্বিধায় পন্ডিতের মত বলে গেলেন আর মিডিয়ার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে এসব মূর্খতা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। এ লোকটির প্রতি যারা শ্রদ্ধাপোষণ করত তারা ভেবে পায় না কেমন লোককে তারা জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মনে করত। এতো অপ্রকৃতিস্থ এক উন্মাদের প্রতিকৃতি 'রাসূল মানে নাকি অ্যাম্বাসাডর। তাহলে 'সাফীর' মানে কী? জাতিসংঘে তো অসংখ্য আরব দেশের প্রতিনিধি আছে। বিশ্বব্যাপী আরব রাষ্ট্রের দূতেরা আছেন। তাদের কাউকে কি 'রাসূল' বলা হয়। এই সবজান্তা ভাবনেয়া মূর্খ লোকটি ইচ্ছে করলে এ এম মোমেনকে জিজ্ঞেস

করলেও পারতেন। রাসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ মেসেঞ্জার। তাহলে গাফফার চৌধুরীর মতে দুনিয়ার সব মেসেঞ্জারকেই রাসূল ডাকতে হয়। পরিভাষাও ব্যবহার বলতে যে শক্তিশালী একটি বিষয় আছে সেটিতো এ সাংবাদিকেরই বেশি জানার কথা। তাহলে বক্তৃতার সময় তার জ্ঞান ও বিবেচনা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। মাথায় কিছু গন্ডগোল না থাকলে অ্যাম্বাসাডর প্রতিনিধি ও রাসূল এ তিনটি আলাদা শব্দকে নিয়ে তিনি এত গোল পাকাবেন কেন?

আ. মোমেন যদি প্রতিনিধি হন তাহলেও কি তাকে আরবীতে রাসূল বলা হবে? প্রতিনিধি অর্থ তো মানদুব বা মুমাচ্ছিল। গাফফার চৌধুরী একথা কোথায় পেলেন যে, এ.কে.এম আ. মোমেনকে রাসূল বলা যাবে আর তিনি নিজেও রাসূল, যা বললে নাকি তার কল্লা কাটা যাবে। ফালতুমির একটি সীমা থাকা উচিত। শাব্দিক অর্থে যদি শান্তির দূতকে রাসূলুস সালাম বলা হয়েও থাকে। তাহলেই বা নবী রাসূলের সাথে এর কিসের তুলনা? সংসদ অর্থ তো যে কোন সমিতি বা সাংগঠনিক একক। তাহলে সব সমিতির সদস্যদের কেন 'সংসদ সদস্য' বা 'সাংসদ' বলা হয় না? যারাই পরামর্শ বা মন্ত্রণা দেয় তারাই তো মন্ত্রী। তাহলে কেবল সরকার পরিচালনাকারী পরিষদের সদস্যদেরকেই কেন 'মন্ত্রী' আর তাদের নেতাকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হয়।

দুনিয়ার পরামর্শ ও মন্ত্রণাদানকারীকে কেন 'মন্ত্রী বলা হয় না? গাফফার চৌধুরী সবই বোঝেন, বোঝেন না কেবল 'রাসূল'। কারণ তার মনে খুব ব্যথা। 'রাসূল'কে নিয়ে কুটূক্তি করায় লতিফ সিদ্দিকীর শেষ জীবনে এত অপমান। সুতরাং সুযোগে 'রাসূল'কে এক হাতে নিয়ে নিলেন তিনি। শয়তান চৌধুরী বলেছে, লতিফ সিদ্দিকী কী এমন বলেছিলেন যে, দেশে গিয়েও বেচারা শান্তি পাচ্ছে না। কি যে বলেছিল, তা শয়তান চৌধুরী খুব ভালো করেই জানেন। কিন্তু তার দুঃখ একটাই যে, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ হলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অপমান করে কথা বলে কেউ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। সারা জীবন তাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। পালিয়ে বেড়াতে হয়। নিজের ছায়া দেখেও কেঁপে উঠতে হয়। এমন তো হবেই, এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কী আছে।

লতিফ সিদ্দিকী বলেছিলেন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ খুব চতুর ও বুদ্ধিমান ছিল। সে নিজের জাতির (নাউযুবিল্লাহ) ....

আগে শুনতাম যে, লতিফ সিদ্দিকী পড়াশোনা করা লোক। হজের ইতিহাস তো এদেশের অশিক্ষিত লোকেরাও জানে। মানবজাতির শুরু থেকেই কা'বাগৃহকে ঘিরে ইবাদত চলে এসেছে। আধুনিক হজ্জও পূর্ণতা দান করেছেন। তাহলে লতিফ সিদ্দিকী সারা জীবন কী পড়াশোনা করলেন? নিশ্চয়ই তিনি কেবল গল্প-

উপন্যাস ও পত্রিকা পড়েই কাটিয়েছেন। দুর্নীতি ও দম্ভচর্চা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রতি তার মনের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ জন্মেছে। আল্লাহ তাকে প্রকাশ করে দেবেন বলে তার মুখ বেলাগামী হয়ে পড়েছে। মনের কথা বলে ধরা খেয়ে গেছেন। যোগাযোগ, প্রভাব ও অতীত কাজে লাগিয়ে শেষরক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু খাস দিলে তওবা ছাড়া তার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ধ্বংস, লাঞ্ছনা, গযব আর নরক তার জন্য অবধারিত। মহানবীর প্রতি ঘৃণা অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষপোষণ এমন পাপ যার প্রায়শ্চিত্ত করে সাত-পুরুষও শেষ করা যায় না। আ. গাফফার আরও বলেছে, সাহাবী আব্দুর রহমানকে তার বিড়ালপ্রীতির জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম দিয়েছিলেন আবু হুরায়রা। বিড়ালওয়ালা বলে তাকে সব সাহাবী চিনতেন। তিনিও নবীজির দেয়া নামটিই ভালবেসে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর অর্থ ছাগলের বাপ এথাটি গাফফার চৌধুরী কোথায় পেলেন? বকর শব্দটি শুনতে বাংলা বা উর্দু বকরির মত শোনা যায়, সুতরাং মহাজ্ঞানী সাংবাদিক বানিয়ে ফেললেন আবু বকর মানে ছাগলের বাপ। একজন মূর্খ সাংবাদিকের ছাগল হতে আর কী লাগে। চরমোনাইয়ের পীর সাহেব যাকে গাধা চৌধুরী নাম দিয়েছেন। তিনি নিজে নিজের নাম ফেলতে চাইলেন ছাগল কিংবা পাগল সাংবাদিক। আফসোস তার লাগামহীনতার জন্য। দুঃখ হয় তার পরিমিতি বোধের চরম অভাবের জন্য।

গাফফার চৌধুরী বলেছেন, আল্লাহর ৯৯ নাম কাফেরদের দেবদেবীর পুরানো নাম। তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফেরদের দেব-দেবীর মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছেন, কিন্তু লা-শারিক আল্লাহর নাম ও গুণ প্রচারে সেই দেবতাদের কোন কোন নাম গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহর একটি নাম রহমান। এই রহমান ইসলাম পূর্ব যুগের এক দেবতার নাম। মহানবী এই গুণবাচক নামের মধ্যে (রহমান অর্থ দয়াশীল) ইসলাম বিরোধী কিছু খুঁজে পান নি। যা ইসলামের আগেই ছিল। ইসলাম এসব এডপ্টি বা আত্মীকরণ করে নিয়েছে। গাফফার চৌধুরী এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। মক্কার মুশরিকদের দেবদেবীর নাম লাত, মানাত, ওজ্জা, হোবল ইত্যাদি ইতিহাসে পাওয়া যায়। এরও পূর্বের যুগের দেবতাদের নাম ইয়াগুস, নাসর, সুয়া ইত্যাদি নাম পবিত্র কুরআন, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদিতে রয়েছে। আল্লাহর ৯৯ নাম হযরত মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নায় আমরা পেয়েছি। বিস্ময় লাগে বয়োবৃদ্ধ এই কলামিষ্ট এত কম জানাশোনা ও সীমিত পড়ালেখা নিয়ে এতটা ব্যাল বাজান কেমনে? তার উচিত নিজের জ্ঞানের পরিধিতে থেকে কলম লিখে

যাওয়া। ক্ষমতা থাকলে আগামী কোন লেখায় আল্লাহর ৯৯ নামের কোন নামটি কাফেরদের কোন দেবতার নাম ছিল জানালে প্রীত হবো।

এখানে জনবা চৌধুরীর বড় ভুল হয়ে গেছে তার নিজের অজান্তেই। 'রহমান' নামটি মহানবী সা. রেখে দেননি বা বাদও দেননি। এ নামটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তার গুণবাচক নামের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। জনাব আব্দুল গাফফার চোধুরী বাঙালি মুসলমানকে বাংলা ও ধর্ম নিরপেক্ষ নাম রাখায় যতটা উৎসাহ দিয়েছে, তার একাংশও তিনি বাঙালি হিন্দুদের দিতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষ ফার্সি উর্দু ও আরবি নাম রাখার জন্য? বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয় ও ইসলামী স্বকীয়তা মোচনের জন্যে জনাব চৌধুরী যত চেষ্টা-চিন্তা করেছেন, যত কালি-কাগজ ব্যয় করেছেন এর এক শতাংশও কি তিনি তার পছন্দের সংস্কৃতিমনা হিন্দুদের জন্যেও করতে পারেন না? ওদের কি একটি বারের জন্যেও বলতে পারে না একটু উদার হতে। একটু সংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত হতে। একটু পার্শ্ববর্তী বাড়ির চির প্রতিবেশী মুসলমানদের ঐহিত্যবাহী এক আধটি নাম অন্তত গ্রহণ করতে। যে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সদা-সর্বদা বলা হয়, বাংলা নাম রাখো। ধর্মনিরপেক্ষ নাম রাখ। আরবি-ফার্সি নাম বাদ দাও। বাঙালি হও। অতীতে বাঙালি মুসলমানদের বাংলা নাম রাখার বিষয়ে অনেকেই বিশেষ প্রচারণা চালিয়েছিলেন। এদের দলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবও ছিলেন। তখন মুজাহিদে আযম শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, বাংলা নামকরণের কাজটি অন্যদের না বলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নিজেরই শুরু করা উচিত। সুবিধা হবে ভেবে এর তরজমাটুকুও আল্লামা ফরিদপুরী রহ. করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখন থেকে আমরা তাকে ডাকব পন্ডিত শ্রীযুক্ত বলি নারায়ণ। এরপর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মরহুম ফরিদপুরীর কাছে তওবা করে এ প্রস্তাবনা থেকে ফিরে আসেন।

আমি যদি হলফ করে বলি তাহলে আশা করি তা ভঙ্গ হবে না যে, কোটি কোটি বাঙালি হিন্দুর মাঝে এমন একজন ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তার সন্তানের নাম ধর্মনিরপেক্ষ আরবি-ফারসি বা উর্দু শব্দে রাখতে আগ্রহী। অথবা ইসলামী ইতিহাস-এতিহ্য-সংস্কৃতির গন্ধ আছে এমন কোন নাম। একটু ভেঙ্গেই বলি- ভারতবর্ষের ৭০ কোটি হিন্দুর মাঝে এমন একজন হিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নাম আব্দুল্লাহ বা আ. রহীম। ওমর, খালিদ, জাবের, যুবায়েরও পাওয়া যাবে না। এসব তো মুসলিম আরব ও স্বর্ণযুগের মনীষীদের নাম। কিন্তু ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসা মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকবর্গ, উদারপন্থী কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক এমন কি নাস্তিক (মুসলমান পরিচয়ধারী) ব্যক্তিত্ব কারো নামই কি হিন্দু মা-বাবারা তার সন্তানের জন্যে? বাবর, হুমায়ুন, আকবর, শাহজাহান, আলমগীর ইত্যাদিও তো রাখতে

দেখা যায় না হিন্দুদের সমাজে। ভারতের মাটি পানি ও বাতাসের সাথে মিশে আছে এসব নাম। এসবের উৎস উৎপত্তি সবই তো ভারতবর্ষ কেবল ভারত। পক্ষান্তরে সারা ভারতে, বাঙালি ভারতে, বিশেষ করে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে হাজার হাজার উষা, পুষ্প, শ্যামল, তপন, স্বপন, পরশ, সীপন, বিপুল, কণা, রীনা, বীনা, রীতা, শমী, উশা, যুথী, সাবিকা, রাধিকা, বিপাশা, বিশাখা, অজন্তা, রাজিব, সঞ্জয়, সজীব, লতা, শিখা, সুমন ইত্যাদি নাম পাওয়া যাবে। যাদের মুসলিম মা-বাবা নির্দ্বিধায় এসব নাম রেখেছেন। এরপরও এই বাঙালি মুসলমানদের প্রতি জনাব চৌধুরীর সংশয়পূর্ণ বাংলা নাম রাখার এত উপদেশ কেন? বাঙালি মুসলমানদের আরো উদার, অসাম্প্রদায়িক ও গোঁড়ামিমুক্ত হওয়ার উপায় কি? তাহলে কি হিন্দু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত শব্দ সংযোগ মুসলমানদের গোটা নামটিই শরৎ বাবুর সংজ্ঞায় 'পূর্ণাঙ্গ বাঙালি' করে নেয়ার নসীহত করাই তার উদ্দেশ্য?

তিনি কি পছন্দ করেন যে, শুধু 'তপন' নয় 'তপন কান্তিদাস' নাম রাখতে শুরু করবে বাঙালি মুসলমানরা? শুধু 'পুষ্প' নয় শ্রীমতি পুষ্প' 'রানীদাস' রেখে নিতে হবে? শ্রী শ্রীমতি যুক্ত করার উদার্থ আহ্বান থেকে তো এমনই আঁচ করা যায়। আলোচনার এক পর্যায়ে আহমদ ছফা বললেন, জার্মানদের এক উৎসবে আমি অ্যাম্বাসাডারসহ অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির কথা বললাম। ওরা একটু ভড়কে গেল। আমি তখন সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম, গোটা মুসলিম বিশ্বে এমনকি অপেক্ষাকৃত বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলিম নাগরিকদের এদেশে (বাংলাদেশে) বনী ইসরাঈলের তথা তওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের নামে নাম রাখা হয়েছে এমন কোটি মুসলমান পাওয়া যাবে। কেবল বাংলাদেশের কথাই বলি-এখানে অন্তত দু'লাখ ইব্রাহিম, দু'লাখ ইসমাঈল, দু' লাখ মুসা, দু'লাখ ঈসা, হারুণ, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, সোলাইমান ইত্যাদি নাম পাওয়া যাবে। খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিকেও পাওয়া যাবে না যার নাম মুহাম্মদ? তাহলে বুঝা গেল মুসলমানরাই উদার।

আসলে শযতান চোধুরীর কষ্টটা আমরা বুঝি। তিনি যেমন বাংলাদেশ চাইতেন তেমন বাংলাদেশ পাননি বলেই তার যত যন্ত্রণা। কিন্তু তার জেনে রাখা উচিত যে, টুপি-দাড়ি, হিজাব-পর্দা, আজান-নামায, মসজিদ, মাদরাসা, আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, হজ্ব-যাকাত, রোজা, যিকির ইত্যাদিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন তাদের কিয়ামত পর্যন্তও বাস্তবায়ন হবে না। তিনি (তার কথা মত) যতই ধর্ম পাল্টান আর বাঙালিত্বের ঢোল-বাজনা বাজান না কেন বাংলাদেশের মানুষ তাদের ধর্ম পাল্টাবে না। তারা বাঙালিত্বও ছাড়বে না।

রাসূল সা.কে নিয়ে কটূক্তিকারী কুলাঙ্গার নাস্তিক আফিস মহিউদ্দীন

আসিফ মহিউদ্দীন তার ফেসবুক ওয়ালে হযরত রাসূল সা.কে নিয়ে লেখে 'মুহাম্মদ সা. নিজেকে আইডল বা নিজেকেই ঈশ্বর না বলে একটি কল্পিত ঈশ্বরকে উপস্থাপন করেছেন। মানুষ যেন ব্যক্তিপূজায় আসক্ত না হয়, তাকেই যেন মানুষ ঈশ্বর বানিয়ে পূজা করতে শুরু না করে, সে ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন। তাই তার সমস্ত রচনাই তিনি আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এর রচয়িতা হিসেবে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন।

আরেক লেখায় সে লিখেছে, 'ধর্মান্ধ মুসলিমদের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কে মুহাম্মদের ছবি আঁকল, কে ধর্মের সমালোচনা করল। অথচ এতে মুহাম্মদ ও আল্লাহর কখনই কিছু যাবে আসবে না। ব্যাপারটা এমন নয় যে, মুহাম্মদের ছবি আঁকা হলে স্বর্গে মুহাম্মদ সাহেব কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে আত্মহত্যা করছেন। আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, তার উম্মতরা ঠিকই তাকে একজন পীরে পরিণত করেছে।'

ফেসবুকে বিশ্বনবীর একটি কাল্পনিক ছবিকে দেখিয়ে সে লেখে, "এই ছবিটা মুহাম্মদের উম্মাদ উম্মতদের উদ্দেশ্যে একটা জবাব হতে পারে।" আসিফ কেবল নিজেই নাস্তিক নন, অন্যদেরও তিনি এ বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন। থাবা বাবার একটি ফেসবুক স্টাটাস যেটি ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট আপডেড করা, তাতে থাবা বাবা ওরফে রাজিব লিখেছেন, 'ঈশ্বর কি আস্তিক না নাস্তিক' এর প্রথম উত্তরদাতা হলেন আসিফ মহিউদ্দীন। আসিফ এর কমেন্টে লিখেছে, "অবশ্যই নাস্তিক। মানে আমাগো দলে আর কী। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি । সে বলে সে স্বয়ং। তেমনি নাস্তিকও বিশ্বাস করে না তারে কেউ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর একজন নাস্তিক।"

আসিফ (গত সেপ্টেম্বর ২০১১, রাত ১১ টা) ব্লগে একটি পোস্ট লেখেন। সেখানে ইসলাম ও কুরআনকে কটাক্ষ করে তার লেখা হলো- 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির নাস্তিকানির নাজিম'। গত বছরের ৫ মে পবিত্র কুরআন শরীফকে মহাপবিত্র 'আহাম্মকোপিডিয়া' লেখার মতোও ধৃষ্টতা দেখায় এ ব্লগার। পরে তীব্র প্রতিবাদের মুখে এ পোস্টটি সে তার ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলে। (এর স্কিনশর্ট এখানে আছে)

ইসলামের বিধান পর্দা বা বোরকা নিয়ে সে লিখেছে, "বোরকা পরাটা সমর্থন করি না, বোরকা হিজাব মূলতঃ আরবির বর্বর সমাজের প্রতীক। একটা সমাজে অত্যধিক বোরকার প্রাদুর্ভাব থাকা মানে হচ্ছে সেই সমাজের পুরুষগুলো সব একটা ধর্ষক। সেই ধর্ষকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সকল নারীকে একটা

জেলখানা নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এই সব অজুহাতে নারীকে যুগ যুগ ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কখনো ঘরের ভেতরে, আবার কখনো বোরকা নামক চলমান জেলখানার ভেতরে।" আসল কথা হল এই সমস্ত নাস্তিক কুলাঙ্গাররা সব সময় চেষ্টা করে ইসলামকে কিভাবে ছোট করা যায়। আসলে তাদের মত পাগল, ছাগলদের কথায় আমাদের হাসি ছাড়া আর কিছুই আসে না।

প্রথম আলোর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র

কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার বিষয়টি কোন রাষ্ট্র বা সমাজই অনুমোদন করে না। যারা এধরণের কাজ করে তাদের কর্মের নিরিখেই নির্ণীত হবে তারা কতটুকু অপরাধী। কোন অপরাধই যাতে সমাজে বিস্তৃত হতে না পারে, সে জন্যই আছে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা। এটা অপরাধীর প্রতি কোন জুলুম নয় বরং এটাই সভ্যতাকে সচল রাখার যথার্থ উপায়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে এটাই স্বাভাবিক। কেউ অপরাধ করলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে এটাও স্বাভাবিক। জনগণ সরকারের কাছে আইনের এ প্রয়োগটুকু চায়, এর বেশি কিছু নয়।

সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭) প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আলাপন' এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা হলে দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিক্ষোভের প্রচন্ডতা দেখে এটিকে অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা করে, এজন্য দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় 'আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থীৎ শিরোনামে সম্পাদক মতিউর রহমানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আমরা যদি মনে করতে পারতাম তাদের দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা আন্তরিক এবং এজন্য তারা সত্যিই অনুতপ্ত, তাহলে সবার মতো আমরাও খুশি হতাম।

কিন্তু প্রথম আলোই আমাদের এব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধায় ফেলে দিলো। ওই দিনই (২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭) প্রথম আলো (২য় পৃষ্ঠায়) তার নিজস্ব প্রতিবেদকের বরাত দিয়ে 'আলাপন কার্টুন প্রকাশ নিয়ে অদ্ভূত ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্বেগ প্রকাশ' শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাবে। তাতে বলা হয়, 'সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠন ফ্রান্সের 'রিপোর্টাস উইদাউট বোর্ডস' অবিলম্বে প্রথম আলোর প্রদায়ক কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের মুক্তি দাবি করেছে।'

স্মর্তব্য, সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ঘটনার পর পরই আলাপনের ওই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে, যাতে করে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো

সম্ভবহয়। প্রথম আলো নিজেই যেখানে ওই কার্টুনিস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে এবং আর কোন কার্টুন তারা ছাপবে না বলে জানিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দুখ প্রকাশ করেছে, সেখানে তার মুক্তির জন্য নিজস্ব প্রতিবেদককে দিয়ে তার মুক্তির দাবি তোলা কতটুকু যৌক্তিক? বিদেশী সংস্থার বরাত দিয়ে এই দাবি তুলে তারা যে জনগণের সেন্টিমেন্টের প্রতিই অশ্রদ্ধা পোষণ করেছে, তা-ই নয়, আইনের প্রতিও যে তারা শ্রদ্ধাশীল নয়, তাই কি প্রমাণ করে না? তাহলে জনগণের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার জন্য কেন ক্ষমাপ্রার্থনার নাটক করা? বিষয়টি এখানেই থেমে গেলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু ওই প্রতিবেদক আরো একটু অগ্রসর হয়ে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি' এবং মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধ দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলনের যৌথ বিবৃতির বরাত দিয়ে আরো বলে 'এই কার্টুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কিছু বলা হয়নি।'

আমার প্রশ্ন হচ্ছে- যদি তাই হবে, তাহলে তারা ক্ষমা চাইল কিসের জন্য? নিজস্ব প্রতিবেদককে দিয়ে এই বক্তব্য প্রকাশ করে তারা কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তারা যা করেছেন, ঠিক করেছেন? নাকি ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের পরামর্শ। অর্থাৎ যখনি ফেরাউন মুসা আ. এর দাওয়াতের প্রতি ঝুঁকে যেত এবং নিজের ভুল বুঝতে পারতো তখন সে তার মন্ত্রী হামানের কাছে পরামর্শ চাইত। আর হামান তাকে এই কথা বলে বলে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতো যে, 'আপনি এই দেশের বাদশা ও খোদা। আপনি ভুল করেননি। ঈমান গ্রহণের প্রয়োজন নেই। মাথা নত করার প্রয়োজন নেই।'

আর তার পরামর্শে ফেরাউন উভয় জাহান হারিয়ে জাহান্নামী হল। আর আমাদের তারা কাফের মুরতাদ, নাস্তিকদের কথা শ্রবণ করে ক্ষমা থেকে ফিরে যাচ্ছে। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন কবীর চৌধুরী, হেনাদাস, কলিম শরাফী, বিচারপতি কে এম হাসান, এডভোকেট গাজিউল হক, হাসান আজিজুল হক ও অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। আলেম সমাজের পক্ষে বায়তুল মোকাররমের খতিব মরহুম মাও. ওবায়দুল হক (রহ.) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে দু'টি প্রস্তাব দেন, তার একটি ছিল প্রথম আলো কর্তৃপক্ষকে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং অন্যটি ছিল প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল করে এজন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রথম দাবীটি প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ দৃশ্যত পূরণ করলেও দ্বিতীয় দাবিটি এখনো অপূর্ণই রয়ে গেছে। সরকার এখনো প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল করেননি এবং কার্টুনিস্ট ছাড়া যারা এ কার্টুনটি ছেপে কোটি কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে, এখন পর্যন্ত তাদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি।

জনগণের দাবী, অনতিবিলম্বে প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল ও এ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, জনগণের মতো সরকারও চাইবে না কেউ আইন নিজের হাত তুলে নিক। যেখানে জাতিসঙ্ঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং আমাদের সংবিধানও কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানাকে অপরাধ গণ্য করে এবং প্রথম আলো নিজেও যেখানে দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের কৃত অপরাধ, সেখানে এসব অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিতে বাধা কোথায়? অন্যের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়াটা কেবল দুর্নীতি নয়, মহাদুর্নীতি। তাহলে এসব দুর্নীতিবাজকে আইনের হাতে তুলে দিতে সরকারের আপত্তি বা অপারগতা কেন? ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ প্রথম আলোর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তাদের নিজস্ব প্রতিবেদক আইন ও সালিস কেন্দ বরাত দিয়ে আরো একটি মারাত্মক আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশন করেছে। তাতে বলা হয়েছে, 'জরুরি অবস্থা চলাকালে সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ থাকলেও কোন কোন সংগঠনের বিক্ষোভ-সমাবেশ, লিফলেট বিতরণের প্রতি সরকার কেন নমনীয়, তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। তাদের এ বিস্ময়ের কারণ বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা চাচ্ছিল এ ঘটনায় ব্যাপক জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটবে এবং পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আর বিশ্বকে তারা দেখাবে, দেখো বাংলাদেশ কেমন জঙ্গি রাষ্ট্র। তাদের এ আশা পূরণ না হওয়ায় তারা মর্মাহত ও বিস্মিত।

সরকার কেন আলেমদের সহায়তায় নমনীয় আচরণের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ নিল, তা তাদের বোধগম্য না হলেও জনগণ কিন্তু তাতে স্বস্তি পেয়েছে। আজকের এ বিবৃতিটি যথেষ্ট উস্কানিমূলক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উসকে দেয়ার এ প্রচেষ্টা দুঃখজনক। প্রথম আলো রাসূল সা. কে নিয়ে কেবল ব্যক্তি কার্টুন প্রকাশ করেই ক্ষ্যন্ত হয়নি, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর জনতার ওপর পুলিশকে উসকে দেয়ার কাজটিও তারা করল এ বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে। অপরাধীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনার পরপরই তাদের গ্রেফতার করা উচিত ছিল। সরকার তাদের গ্রেফতার না করায় আমরা খুবই শংকিত। কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুলাঙ্গার সালমান রুশদি রাসূল সা.কে কটাক্ষ করেছে

ভারতীয় কুলাঙ্গার নামদারী মুসলমান লেখক সালমান রুশদি (স্যাটানিক ভার্সেস) উপন্যাস প্রকাশ করে। উপন্যাসটি ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল বলে বিশ্বের বহু মুসলিম দেশের মুসলমানরা ক্ষেপে গিয়েছিল। ইরানের শিয়া ধর্মীয় নেতা

আয়াতুল্লাহ খোমেনি তার মস্তকের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল করে তার প্রতিবাদ করেছিল এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তার উপন্যাস পুড়িয়ে ছিল।

সালমান রুশদি একটা জানোয়ার। এই সকল জানোয়ারদের চরিত্র কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাসলিমা নাসরিন, সালমান রুশদির কুকুরের মতো কাজের প্রমাণ- তাসলিমার বইগুলোতে আলোচনা করেছে এইভাবে যে, কোন কোন কুকুর তার সাথে কিভাবে কি করেছিল? নাস্তিকতা মানুষকে জানোয়ার বানায়। কেননা, নাস্তিকরা কোন ধর্ম মানে না। আর ধর্মছাড়া কোন বিবাহ নেই। অর্থাৎ কুকুর যাকে পায় তার সাথেই যৌন সম্পর্ক করে। আর নাস্তিকরাও যার সাথে মন চায় তার সাথে কুকর্মের মত যিনা করে। নাস্তিকদের কাছে বোন হোক, আর মেয়ে হোক তাদের সবাই সমান।

'যে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান।' (সূরা নিসা-১১৫)

গোস্তখে রাসূল কাব বিন আশরাফের করুণ পরিণতি

ইহুদী গোত্র বনু নযীরে কাব বিন আশরাফ নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিল। নামজাদা কবি হওয়ার কারণে সকল গোত্রের ওপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল। তদুপরি সে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ায় ইহুদীদের মাঝে সে নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল। ইহুদি ধর্মযাজকদেরকে ভাতা ও বৃত্তি প্রদান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারণে বাধ্য করত।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় হলে কা'ব খুব ব্যথিত হয়। সমবেদনা জানাতে মদিনা থেকে ছুটে যায় সুদূর মক্কায়। সেখানে গিয়ে নানাবিধ কবিতা ও শোকগাথা রচনা করে নিহত সরদারদের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশদের উত্তেজিত করে তোলে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান চালানোর জন্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে। তার কবিতার মাধ্যমে কুরাইশগণ নবউৎসাহ জেগে উঠল। ঠিক যেভাবে বর্তমান যুগে মিডিয়া, ফেসবুক আর বিভিন্ন ব্লগের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। তার কবিতা ও রচনা সে কাজই করল। অর্থাৎ কিভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করা যায়।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)থেকে বর্ণিত (একবার) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে

প্রস্তুত আছো? কেননা, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি?তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম খোশগল্পের) কথার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা, বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কা'ব বিন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল) আমাদের কাছে সদকা চায়। সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (অপরাগ হয়ে) আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।

কা'ব বিন আশরাফ বলে উঠল, আল্লাহর কসম! পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে। আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা তো তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক খাদ্য ধার চাই। কা'ব বিন আশরাফ বলল, ধার পেয়ে যাবে, তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধন চান? সে বলল, তোমার স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। আপনার নিকট কি করে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখবো আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমার পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে ভর্ৎসনা করা হবে যে মাত্র এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।

অবশেষে তিনি কা'ব বিন আশরাফকে পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'বের দুধভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাত্রে তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দূর্গে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হলো। এসময় তার স্ত্রী বলল, সময় (এত রাতে) তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে (তাদের কাছে যাচ্ছি।)

আমর ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কাবের স্ত্রী বলল, আমি তো এরূপ একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি, যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব বিন আশরাফ বলল, ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা নেজাবাজির জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। কা'ব বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যেন সাথীদেরকেও প্রবেশ করায়। অর্থাৎ ভিতরে আসুন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. তিনি অপর দুই

সাহাবীকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে (দিকনির্দেশনা দিয়ে) বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুঁকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে (অনুমান করবে) যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব।

কা'ব চাদর দিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বলেন, আজকের মতো এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। কাব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা আছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং তার সাথীদেরকেও শুঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে আরেকবার শুঁকবার জন্য অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তারা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন। (বুখারী ২/৪২৫, হাদীস নং-৩৮১১)

গোস্তখে রাসূল আবু রাফের শাস্তি

'আবু রাফে' নামক এক ইহুদীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্যই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সব সময় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে বেড়াত এবং কষ্ট দিত এবং একাজে অন্যদেরকে সাহায্য করত। হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিককে অধিনায়ক বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারীদের কতিপয় সাহাবীকে আবু রাফেকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দূর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন নিজেদের পশুপাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। দলনেতা আব্দুল্লাহ বিন আতিক তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের জায়গায় বসে থাক। আমি যাচ্ছি, গিয়ে দেখি। ইবনে আতিক বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বারক্ষীর সাথে (কিছু) কৌশল অবলম্বনে রত হলাম। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন, ফলে কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলাম যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছি। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী (দুর্গের লোক মনে করে)

তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ! ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দিব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেক বা খুঁটির সাথে চাবিটি লটকিয়ে রাখল। এরপর আমি চাবিটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটি নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফের নিকট রাত্রের বেলা গল্পের আসর জমতো। এ সময় সে তার উপর তলার কামড়ায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এসময় আমি এক একটি দরজা খুলছিলাম আর ভিতর থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

এসময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন অংশে যে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফে বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছে? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা প্রচন্ড প্রচন্ড জোরে আঘাত কররাম। আমি তখন ভয়ে কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চিৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞাসা করলাম, আবু রাফে! এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমাদের মায়ের সর্বনাশ হোক!কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রা.) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারীর ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতে সিঁড়ির শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আঁছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা

খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজায় সোজা বসে রইলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না।

ভোররাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর ওঠে ঘোষণা করল, হিজাজ অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট বললাম, দ্রুত চল। আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা লম্বা করে দিলে তিনি এর উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল যেন তাতে কোন আঘাতই পাইনি। (বুখারী, ফাতহুল বারী ৭/৩৬৩)

নবীজির ব্যাপারে কটূক্তিকারী ইবনে খাতালের করুণ পরিণতি

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ইবনে খতাল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিশ্রী গান বা কবিতা আবৃত্তি করত। তিন কারণে এ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১। হত্যা ২। মুরতাদ হওয়া ৩। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবী মূলক বক্তব্য। (আসারিমুল মাসলূল, পৃ. ১৯৮)

"সে মুসলমান হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে একজন আনসারি খাদেম দিয়ে যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। পথে যখন এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য অবস্থান নিল। তখন খাদেমকে একটি বকরি জবাই করে খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। ইবনে খাতাল ঘুম থেকে জেগে দেখল, খাদেম খাবারের ব্যবস্থা করেনি। তখন সে তার উপর আক্রমণ করল এবং তাকে হত্যা করল। এরপর সে মুরতাদ হয়ে গেল। তার এক দাসী ছিল এবং দাসীর এক সই ছিল। তারা উভয়ে মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুৎসা রটনা করে গান গাইত। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে খাতালের সঙ্গে তাদের দুইজনকেও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" (সুনানে কুবরা ৮/২০৫)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কাবিজয়ের দিন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি যখন শিরস্ত্রাণ খুললেন তখন তার খেদমতে এসে একজন আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইবনে খাতাল কাবার পর্দা আঁকড়ে ধরে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ শুনে হুকুম দিলেন, তাকে হত্যা কর।

(বুখারী শরীফ- ২/৬১৪)

আল্লাহর বিধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীর শাস্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে লেখেছেন এমন শাস্তি যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।" (সূরা আহযাব-৫৭)

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

"তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং (তার সম্পর্কে) বলে, 'সে তো আপাদমস্তক কান।' বলে দাও তোমাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সে তারই জন্য কান বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা (বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তাদের জন্য সে রহমত। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা তওবা-৬১)

কান শব্দের ব্যাখ্যা : 'কান' শব্দটি আরবী ভাষায় একটি প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ। আরবি ভাষায় যে ব্যক্তি সকলের কথা শোনামাত্র বিশ্বাস করে, তার সম্পকে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির তো সবটাই কান'। কিংবা 'সে আগাগোড়া কান'। বাংলা ভাষায় বলে, 'কানপাতলা'। মুনাফিকরা পরস্পারিক আলাপচারিতার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসম্পর্কে এরূপ ন্যাক্কারজনক শব্দ ব্যবহার করেছিল।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

"তারা কি জানে না কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধীতা করলে সিদ্ধান্ত স্থিত রয়েছে যে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন, যাতে সে সর্বদা থাকবে এই তো চরম লাঞ্চনা। (সূরা তওবা, আয়াত নং-৬৩)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারা লাঞ্ছিত হবে, যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীগণ। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্চনাকর শাস্তি।" (সূরা মুজাদালা-৫)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا۝

"আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে ও মুমিনের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।" (সূরা নিসা-১১৫)

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝

"নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীতায় লিপ্ত হলে আল্লাহর আযাব তো সুকঠিন।" (সূরা আনফাল-১৩)

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননাকারীর শরয়ী বিধান

মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রা. এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছিল। তিনি তাকে হত্যা করে দিলেন। এরপর বললেন, "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দিবে তোমরা তাকে হত্যা করে দিবে।" (আসসারিমুল মাসলূল, পৃ.২৭২)

হযরত হুসাইন রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা হবে।" (আসসারিমূম মাসআলু, পৃ. ২৭)

"ইবনে কিনানা রহ. বলেন, যদি কোন ইহুদী বা নাসারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে গোস্তাখি করে, তাহলে প্রশাসকের প্রতি আমার পরামর্শ হল, এমন গোস্তাখকে হত্যা করে তার লাশ ধ্বংস করে দিতে হবে, অথবা সরাসরি আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে।" (আশশিফা, ২/৪৫৩)

"হযরত আবু মুসআব (রা.)কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে নাসারা এ কথা বলে যে, হযরত ঈসা(আ.) সরদারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন, তার কী হুকুম? আবু মুসআব রা. উত্তরে বলেন, তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।" (আশশিফা-২/৪৫২)

বিশ্বের মুফতি ও ইমামদের দৃষ্টিতে রাসূল অবমাননাকারীর শাস্তি

চার ইমামের ফতোয়া :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী কাফের ও হত্যার যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম

মালেক (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এই চার ইমাম থেকে এই ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৮২, ফাতাওয়া শামী, ৩/৩১৯)

ইমাম ইবনে হুমাম (রহ.) লিখেন, "যে ব্যক্তিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটূক্তিকারী, সে তো আরো আগেই মুরতাদ হবে। আমাদের মতে এমন ব্যক্তিকে হদ হিসাবে হত্যা করা জরুরি। তওবা গ্রহণ করে, তার হত্যা মাফ করা যাবে না।" (ফাতহুল কাদীর, ৪/৪০৭)

"তার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং মানুষের আদালতেও কবুল হবে না। বরং তাকে হদ হিসেবে হত্যা করা হবে।" (খোলাসাতুল ফাতাওয়া, ৪/৩৮৬)

"ইবনে কাসেম রহ. বলেন, ইমাম মালেক (রহ.) এর কাছে মিশর থেকে একটি ফতোয়া চাওয়া হল। তিনি যেই উত্তর পাঠিয়েছেন তাতে আমি গোস্তাখে রাসূল সম্পর্কে যে হত্যার ফতোয়াটি দিয়েছিলাম তার সমর্থন পাওয়া যায়। মিশরের সেই ফতোয়াটি ইমাম মালেক রহ. আমাকেই লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি লিখেছিলাম তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। এরপর আমি ইমাম মালেক রহ.কে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনার অনুমতি হলে এটাও লিখে দিতে চাই যে, হত্যার পর তার লাশ জ্বালিয়ে দিতে হবে। এই কথা শুনে তিনি বললেন, অবশ্যই গোস্তাখে রাসূল এই শাস্তিরই উপযুক্ত। তারপর আমি তাঁর সামনেই তা লিখে দিলাম। তিনি আর কোন দ্বিমত করেন নি। এই ফতোয়া মিশরে পাঠানোর পর, ফতোয়া অনুসারে সেই গোস্তাখের বিচার হয়েছে এবং হত্যার পর তার লাশ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। (আশশিফা ২/৪৫৩)

গোস্তাখে রাসূল সম্পর্কে ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) লিখেন, "মুসলমানদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, (কটূক্তি করবে) সে কাফের।" (ফতোয়া শামী-৩/৩১৭)

মুফতি কেফায়াতুল্লাহ রহ. লিখেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা আম্মাজান আয়েশা রা. এর ব্যাপারে যে বেয়াদবী করে এবং এমন গোস্তাখের প্রতি যে অসন্তুষ্ট নয় উভয়ই কাফের। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে গোস্তাখি করবে, সে কাফের।" (কিফায়াতুল মুফতি- ১/৩১) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. লিখেন, "আম্বিয়া আ. এর শানে গোস্তাখি করা কুফর।"

(ইমদাদুল ফতোয়া ৫/৩৯৩)

বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেম অহিদুয যামান বলেন, "কোন নবীর তাচ্ছিল্য ও অবমাননা কুফরী... কোন মুসলমান না বরদাশত করতে পারে, না হযরত ঈসা আ. এর ব্যাপারে, না অন্য কোন নবী বা অলির ব্যাপারে। যে কেউ হযরত ঈসা আ. এর সঙ্গে বেয়াদবী করবে, তাকেও আমরা হত্যা করব। যেমন হত্যা করব যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করবে তাকে।" (মাওলানা অহিদুযযামান কৃত সুনানে ইবনে মাজার অনুবাদের টীকা, পৃ. ৩৯৬, আহলে হাদীস একাডেমী, কাশ্মীরি বাজার, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত)

বেরেলভী আলেমদের ফতোয়া :

মাওলানা আহমাদ রেজাখান লিখেন- "নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন মুসলমানের যবানে কোন কুফরি কালিমা বের হয়ে গেলে তাকে আমরা কাফের বলব না এবং কুফরের শাস্তিও দিব না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে গোস্তাখি এমন কুফর, যা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় করলেও তার ক্ষমা নেই।"

(ফাতাওয়া রেজাবিয়্যাহ, ৬/৪০)

"মুরতাদ যদি তার ইরতেদাদ থেকে তওবা করে, তবে তার তওবা কবুল করা হবে। তবে কিছু মুরতাদ আছে, যেমন গোস্তাখে রাসূল, তার তওবা কখনো কবুল হবে না।" (বাহারে শরীয়ত, ৯/১৬৬)

"কোন মুসলমানের এতে দ্বিমত নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কষ্ট দেয় বা তাঁর অবমাননা করে, সে নিজেকে মুসলমান দাবি করলেও মুরতাদও হত্যাযোগ্য বলে গণ্য হবে।" (আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ৩/১০৬।)

"রেসালাতের অবমাননার বিধান বাহ্যিক শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বক্তার নিয়ত বা উদ্দেশ্য ধর্তব্য নয়। এমনকি বাহ্যিক কোন আলামত বা নিদর্শনেরও গ্রহণযোগত্যা নেই।" (নাসীমুর রিয়াজ, শরহুশ শিফা, ৪/৪২৬)

ইন্টারনেট, দ্বীনী খিদমতের ও রাসূল অবমাননা জবাবের এক উর্বর ক্ষেত্র

এক.

ইন্টারনেট আবিষ্কারকে গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মনে করা হয়। হাজার মাইলের দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানসহ সবরকম বাধা দূর করে তথ্যের আদান-প্রদানকে সহজ ও গতিময় করতে করতে এর বিকল্প নেই। ১৯৬০ সনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি বা আরপা (ARPA) পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে তৈরি করা এই নেটওয়ার্ক আরপানেট নামে পরিচিত ছিল। এরই বাণিজ্যিক

সংস্করণ ইন্টারনেট। ১৯90 এরপরের দিকে যার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া) ইন্টারনেটের প্রাথমিক ব্যবহারটা ই-মেইল আদান-প্রদানেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। একসময় ব্যবহারকারীরা নিজেদের পরিচিত অন্যান্য সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে। জন্ম হয় ওয়েবসাইটের।

ইন্টারনেট আবিষ্কারের পরই শুরু হয় ব্যক্তিগত, সামাজিক, ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটকে সহজে 'ইন্টারনেটভিত্তিক ঠিকানা' বলে ব্যক্ত করা যেতে পারে। একেকটি ওয়েবসাইট একটি ডোমেইনের অধীনে হাজারো পাতার সমষ্টি হতে পারে। ডোমেইন হলো ওয়েব ঠিকানা হিসাবে ব্যবহৃত নামটি। বাস্তব পৃথিবীতে যেমন প্রত্যেকের বাড়ির একটি হাউজিং নম্বর থাকে, যা দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায়। ডোমাইন ঠিক সেরকম। যেমন- ইসলামডটকম একটি ডোমেইন। এর অধীনে হাজারো পাতার সমষ্টিতে একটি ওয়েবসাইট। নানা রকম ওয়েবসাইটের এক প্রকার ব্লগ। ব্লগ শব্দটি ওয়েব ও ব্লগ শব্দদ্বয়ের সন্ধি। এর অর্থ অনলাইন দিনলিপি। কিন্তু বর্তমানে শুধু দিনলিপি নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ব্লগে স্থান পায়। ব্লগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নানা মতের মানুষ, লেখক বা ব্লগারের লেখার ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও মতামত জানাতে পারে। যা আর কোন গণমাধ্যমে সম্ভব নয়।

দুই.

২০১১ সনের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইন্টারনেটে মোট রেজিস্ট্রিকৃত ডোমেইনের সংখ্যা ৫৫ কোটি। ২০০৮ এ যা ছিল মাত্র ১৮ কোটি বিশ লক্ষ। (সূত্রঃ stat-ichrain.com) আর একেকটি ডোমেইনের অধীনে থাকতে পারে হাজারো পাতা। তাই সর্বমোট পাতার সংখ্যা বলা মুশকিল। ১৯৯৫ সনের ডিসেম্বরে বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ। আর ২০১১ সনের মার্চ মাসে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দুই শত নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষে। যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩০.২ শতাংশ। (সূত্র : internetworldstats.com)

২০১২ সনের একটি পরিসংখ্যানে এশিয়াতে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেখানো হয়েছে প্রায় ১০৭৭ মিলিয়ন বা প্রায় ১০৮ কোটি। যা ২০১০ এ ছিল ৮২৫ মিলিয়ন বা ৮৩ কোটি। ২০10 এ বাংলাদেশে মোট ফেইসবুক ব্যবহারকারী ছিল প্রায় দশলক্ষ। যা ২০১২ তে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ লক্ষে। আর একই সময়ে বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় আশি লক্ষ। (সূত্র : internetworldstats.com)

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলো খুব সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার যে কোন গাণিতিক হারকেও হার মানায়। খোদ বাংলাদেশেও এই হার উর্ধ্বমুখী। যা আগামী বছরগুলোতে আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। আগামীতে একেকজন মোবাইল ব্যবহারকারীই হবেন একেকজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

তিন.

সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম ব্লগ চালু হয় ২০০৫ এ। ২০০৬ থেকে মোটামুটি তা জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। বাংলা ভাষায় ব্লগ চালু হওয়ার পর তা মূলত বিভিন্ন সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী, নবীন কবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে বাংলা ব্লগ ইতিহাসের শুরু থেকেই ইসলাম বিদ্বেষী লেখার দৌরাত্ম লক্ষণীয়। জনপ্রিয়তা ও হিট (ব্লগের ভিজিট সংখ্যা) বাড়ানোর জন্য অনেকেই তখন ইসলাম বিরোধী ব্লগ লেখা শুরু করে। দেখা যায়, গঠনমূলক কোন লেখা দিলে তাতে মন্তব্য পাওয়া যায় হাতে গোনা কয়েকটি। আর ইসলাম বিরোধী ব্লগ লিখলে তাতে মন্তব্য-উত্তর ও নানা তর্ক-বিতর্ক মিলিয়ে মন্তব্য ছাড়িয়ে যায় শতককে। এভাবেই জন্ম হয় বেশ কিছু তরুণ স্বঘোষিত নাস্তিকের। যারা নিজেদের নাস্তিক পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পায় এবং নাস্তিকতার আড়ালে মূলত ইসলামের কুৎসা রটায়। বিশেষ করে ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবন নিয়ে যাচ্ছে তা লিখতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্লগগুলোর সঞ্চালকদের এসব লেখার বিষয়ে তেমন কোন পদক্ষেপ দেয়া যায় না। তা হয়ত তাদের ব্লগে হিট বাড়ানোর জন্য, নতুবা নিজ মতার্দশের অভিন্নতার জন্য।

নব্য নাস্তিক পরিচয়ধারী এসব ব্লগাররা পরবর্তীতে আরো নতুন কিছু বাংলা ব্লগ সাই খুলে এবং এগুলোর কয়েকটি শুধু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্যই। সেসব সাইটে আজ থেকে বছর তিনেক আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে প্রকাশ করে অশ্লীল কমিকস বই। যেগুলো বছরের পর বছর পড়া হয় ও ডাউনলোড করা হয়। এছাড়া অন্য ব্লগগুলোতেও তুলনামূলক ইসলাম বিরোধী লেখা বেশি প্রকাশ হয়। যারা এসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাদেরকে অনেক সময় সঞ্চালকবৃন্দ ব্যান (ব্লগ বা মন্তব্য প্রকাশ করার অধিকার হরণ) করেন। মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ছায়াতলে এসব নাস্তিকদের সহযোগিকা করে যায়। আর যখন এগুলোর কোন উত্তর দেয়া হয়, তখন একের পর এক অশ্লীল গালাগালি করে উত্তরদাতাকে হেনস্থা করা হয় এবং 'ছাগু' সহ অশ্লীল উপাধি দেয়া হয়। ফলে এক শ্রেণীর

পাঠক, যারা নীরবে পাঠ শেষে চলে যান, তারা হৃদয়ে নিয়ে যান ইসলাম নিয়ে অনেক সন্দেহ। ধীরে ধীরে এসব সন্দেহ তাদেরকে ঈমান ছাড়া করে।

চার.

ইন্টারনেটে ইসলাম বিদ্বেষ নতুন নয়। প্রায় আট-দশ বছর আগে আগে কিছু একটা খুঁজতে গিয়েই একদিন আলী সীনা নামের এক ব্যক্তির ওয়েবসাইটের সাথে পরিচিত হই। নিজেকে তিনি এক্সকমুসলিম বা পূর্বে মুসলিম ছিলেন বলে দাবী করেন। আরো দাবী করেন যে, তিনি পরবর্তীতে খ্রিস্টান হয়ে গেছেন ইসলামের প্রতি নিরুৎসাহী হয়ে। ফেইথফ্রীডম বা মুক্তবিশ্বাস নামে তার নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট আছে। নিজেকে আরবের বাসিন্দা বলেও দাবী করেন তিনি। তার সেই সাইটটিতে মুসলিমদের প্রতি মোট এগারো কি বারোটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া ছিল। সবগুলোই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবাহ এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন রা. নিয়ে ছিল প্রশ্নগুলো। সাইটের ব্যানারে লেখা আছে, "যদি কোন মুসলিম আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার সাইট মুছে ফেলব।" আপাতদৃষ্টিতে যা খুব নিরীহ একটি ব্যানার ও আবেদন। আলী সিনার প্রশ্নের জবাবে ইংরেজী ও আরবীতে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট হয়েছে এবং অনেক উলামা তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার একই কথা, উত্তর যথার্থ হয়নি। অনেকটা 'বিচার মানি' তালগাছ আমার'-এর মত।

এমনকি তাকে সরাসরি বাহাসে আসতেও আহ্বান জানানো হয়েছে। সে রাজী হয়নি। তাকে ফোনে বা অনলাইনে কথা বলতে আহ্বান করা হয়েছে। সেটাতেও সে রাজী হয়নি। পরবর্তীতে ডা. জাকির নায়েকও তাকে কনফারেন্সে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাও সে রাজী হয়নি। মূলত আলী সীনা তার আসল নাম কিনা, তাও সে কখনো স্পষ্ট করেনি।

এর অনেকদিন পর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তার বিভিন্ন লেখা থেকে সংগৃহীত প্রমাণ দেখতে পাই যে, সে আসলে একজন ইহুদী, যে কখনোই মুসলিম ছিল না। ২০০৮ এ ইসরাঈলের জেরুজালেম পোস্ট নামের সংবাদপত্র তার একটি সাক্ষাৎকার ছাপে। যেখানে সে বলে, "ইসলামকে সংস্কার করার একমাত্র উপায় হলো, কুরআনকে নিক্ষেপ করা, এর নব্বই শতাংশই নিক্ষেপ করা উচিত। আপনাকে ইসলামের ইতিহাসকেও ছুঁড়ে ফেলতে হবে; আর সীরাতকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে পুরো একশত ভাগ।" (সূত্র : Jerusalem post, 2008)

মুলত মুসলিমদের মাঝে দ্বীন নিয়ে নানাবিধ সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যই এ কাজ করছে সে। বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, আলী সীনা কোন ব্যক্তি নয়,

আলী সীনা একটি গ্যাং। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করাই যাদের লক্ষ্য। অবশ্য আলী সীনা ব্যক্তি বা গ্যাং যাই হোক, তারা একা নয়। সম্প্রতি সেন্টার অফ আমেরিকান প্রোগ্রেস নামের একটি বেসরকারী আমেরিকান গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে উঠে আসে আরো ভয়াবহ তথ্য। "দ্যা রুটস অফ ইসলামফোবিয়া নেটওয়ার্ক ইন আমেরিকা" বা "আমেরিকায় ইসলামবিদ্বেষী নেটওয়ার্কের গোড়া" শিরোনামে তারা শতাধিক পৃষ্ঠার একটি গবেষণা প্রকাশ করে। এতে ওঠে আসে যে, আমেরিকার বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদান করে কিছু গবেষণা সংস্থাকে। যাদের একমাত্র কাজই হলো ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো। এসব সংস্থার গবেষণা দলে রয়েছে স্কলার, সম্পাদক ও প্রচারক। বিধর্মী নারী-পুরুষের সমন্বিত স্কলারবৃন্দ ইসলামের কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম বিরোধী তথ্য বানিয়ে থাকে। সম্পাদক টিমের হাতে সম্পাদনা হয়ে প্রচার টিমের মাধ্যমে সেগুলো প্রচার পায়। এই টিমে বেশ কয়েকজন মিস ইনফরমেশন-এক্সপার্ট বা ভুল তথ্যবিশারদ রয়েছে, যারা এ রকম ভুল তথ্য তৈরী করে থাকে।

বিশ্বের নানা জায়গায় কোন দুর্ঘটনা হলেই তারা সেগুলো মুসলিমদের উপর চাপিয়ে সংবাদ তৈরী করে। তাদের নেটওয়ার্কে কিছু বড় বড় সংবাদ মাধ্যম আছে। তারা সেগুলো প্রকাশ করে। আবার তাদের সাথে আমেরিকার বিভিন্ন পার্টির কিছুসংসদ সদস্যও আছে। যারা সেগুলো নিয়ে সংসদেও ঝড় তোলেন। আবার কিছু তৃণমূল সংগঠন আছে, মানবাধীকার সংগঠনের মতো। তারা সেসব ভুল তথ্যগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। সাথে কিছু ধর্মীয় সংগঠনও এসব তথ্য ব্যবহার করে ধর্মীয় আবেগকে ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়।

একই তথ্য যখন বিশ্বের বড় বড় মিডিয়ায় প্রকাশ পায়, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের পার্লামেন্টে আলোচিত হয়, সেখানকার মানবাধিকার ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো উচ্চারণ করে, তখন বহু মিথ্যাও সাধারণ মানুষের কাছে সত্য হয়ে উঠে। আর বিশ্বের তাবৎ মিডিয়া লুফে নেয় সেসব সংবাদ। তৈরী হয় ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ। আমেরিকাভিত্তিক এই গবেষণা সংস্থাটি রিপোর্টের শেষে উল্লেখ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামবিদ্বেষ আমেরিকার নাগরিকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার খাতিরেই তারা এ বিষয়ে গবেষণা করে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, গবেষণা টিমটি কোন মুসলিমদের নয়। (সূত্র : Americanprogress.org) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলা ভাষায় যারা ইন্টারনেটে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ায়, তারা কোন না কোন ভাবে এদের সাথে সম্পৃক্ত। বহু লেখকের প্রোফাইলে গিয়ে আলী সীনার সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের লেখাগুলোই অনুবাদ করে বাংলায় তারা প্রকাশ করেন মাত্র।

পাঁচ.

বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে যারা ধার্মিক, নাস্তিকদের প্রচার সাধারণত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবে যারা সাধারণ মুসলিম, নাস্তিকদের লেখা তাদের সংশয়বাদী করে তোলে। সংশয় থেকে ধীরে ধীরে ঈমানহীনতা তৈরি হয়। নাস্তিকদের যেসব লেখা অশ্লীল গালিগালাজ, সেগুলো সাধারণত তেমন ক্ষতিকারক নয়। তবে যেগুলো কুরআন-হাদীসের সূত্রসহ দেয়া হয়, সেগুলো সাধারণ মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যখন তারা দেখে যে, এসবের কোন উপযুক্ত উত্তর দেয়া হয়নি, তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে, নাস্তিকদের দাবীগুলোই সত্য।

এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অবদানের বিকল্প নেই। নাস্তিকদের রেফারেন্সগুলো মূলত আগপিছ বাদ দিয়ে বা মাঝ থেকে তুলে ধরা যেগুলো কেবল উলামায়ে কেরাম উত্তর দিতে পারেন। তাই অনলাইনে ব্লগসমূহে উলামায়ে কেরামের ব্যাপক অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবী। অনলাইনে ব্লগ লেখা এবং অনাগত অনলাইনের নানা ফিৎনা বুঝা ও মুকাবিলা করার জন্য তাই উলামায়ে কেরামকে প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এছাড়া যে কোন ফিৎনার মূল জানা ও পড়াশোনার জন্য ইংরেজীর কোন বিকল্প নেই।

তাই মাদরাসার নেসাবে কম্পিউটার শিক্ষা ও ইংরেজী কথন, লিখন ও বুঝার যোগ্যতা অর্জন হয় এমন বিষয় সংযোজন করা অতীব প্রয়োজন। কওমী মাদরাসাসমূহের বোর্ডগুলো এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলে বিষয়টি সহজ হতে পারে। মাদরাসার নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকা উচিত। ওয়েবসাইটে ছাত্র, উস্তায সবাই লেখা প্রকাশ করবে। এছাড়া উস্তাযদের বয়ান, প্রকাশিত বই ইত্যাদিও আপলোড করা হবে। ফতোয়া বিভাগগুলো অনলাইনে ফতোয়া দিবেন। তাহলে সাধারণ মুসলিমরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এছাড়া লেখন, মাওলানা, মুহাদ্দিস, মুফতী, খতীব, বক্তা ও ওয়ায়েয প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থাকা উচিত। আরবের প্রায় প্রত্যেক আলেমেরই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট আছে। নাস্তিকদের অপরাধের জবাবে একটি গণআন্দোলন সচেতনভাবে শুরু হতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ন করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই।

ছয়.

বাংলা ভাষায় ইসলামিক ওয়েবসাইটের শুরু কবে হয়েছে তা বলা কঠিন। islamhouse.com এর বাংলা বিভাগটাকেই সবচেয়ে পুরানো বাংলা ইসলামিক সাইট বলে মনে হয়। তবে islam.com.bd এর রেজিস্ট্রেশন হয়

২০০৬ এ। ডটবিডির যাত্রা তখন প্রথম দিকে। এরও আগে ২০০৫ এ রেজিস্ট্রেশন করা হয় banglakitab.com সাইটটি। যাতে বিভিন্ন ইসলামিক বই স্ক্যান করে আপলোড করা হত, এখনোও করা হয়। জনপ্রিয় ইসলামিক ম্যাগাজিন মাসিক মদীনার mashikmadina.com রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০১ এ। ওয়েব আর্কাইভে দেখা সে সময়ের সাইটটিকে বেশ মানসম্মত বলেই মনে হয়। অবশ্য বর্তমানে ডোমেইনটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। মাসিক মদীনার সাইটের আগে আর কোন বাংলা ইসলামিক সাইটের অস্তিত্ব নজরে আসেনি। (সূত্র : who.is Ges web. archibe.org)

ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রটি খুব উর্বর। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরা যাক, কোন সম্মানিত খতীব সাহেব মসজিদে জুমার বয়ান করছেন। তার বয়ান সর্বোচ্চ এক হাজার মানুষ শুনলেন। এই শ্রোতারা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর অনেকেই হয়ত ভুলে যাবেন কী আলোচনা হয়েছে। কিংবা অন্যকে এ বিষয়ে জানতে চাইলেও জানানোর সঠিক পথ পাবেন না। খতীব সাহেব যদি এই একটি বয়ান পেশ করার সময় রেকর্ড করে নেন এবং পরবর্তীতে নিজস্ব ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করেন, তাহলে তা পৌঁছে যেতে পারে অসংখ্য মানুষের কাছে এবং বয়ানের আবেদন বেঁচে থাকবে বছর বছর। 'অসংখ্য' বলতে হল এ জন্য যে, আসলেই তা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভভ নয়। ধরুন, খতীব সাহেবের বয়ানটি তার ওয়েবসাইট থেকে এক ভাই শুনলেন। তার ভালো লাগলো। তিনি তার ফেসবুকে তা শেয়ার করলেন। কিংবা কেবল লাইক দিলেন। তার বন্ধু শত শত। তাদের মধ্যে কারো পছন্দ হলো। তিনিও লাইক দিলেন বা শেয়ার করলেন। তার বন্ধুদের কারো আবার পছন্দ হয়ে গেল। এভাবে এটা ঠিক কত হাজার বা লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, তা ঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। এটাতো ফেসবুকের কথা বলা হলো। ফেইসবুকের শেয়ারকারীদের মাঝে কারো পছন্দ হলে তিনি তা ইউটিউবে আপলোড করে দিবেন। ইউটিউব যেহেতু গুগলের প্রতিষ্ঠান, তাই সার্চ রেজাল্ট বা ইন্টারনেটে কোন বিষয় খোঁজার ফলাফলে ইউটিউবের ফলাফলগুলো অগ্রাধিকার পায়।

উদাহরণস্বরূপ খতীব সাহেবের বয়ানের বিষয় ছিল 'এপ্রিল ফুল'। তো বয়ানটি ইউটিউবে আসার পর কেউ গুগলে খুঁজলে তা প্রথম দিকে চলে আসবে। ইউটিউব থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে কোন ফাইল কপি করে নেয় শত শত ওয়েবসাইট। ইউটিউবে কোন কিছু আসা মানে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরো শত শত ওয়েবসাইটে চলে যাবে। খতীব সাহেবের ফেসবুক যদি টুইটার সংযুক্ত থাকে, তাহলে তা টুইটারেও একইভাবে ঝড় তুলবে। এপ্রিল ফুলের এই বার্তা পৌঁছে যাবে আরো লক্ষ মানুষের কাছে। গণমাধ্যমকমীদের কাছেও। ফেসবুক-টুইটার থেকে কোন

পছন্দকারী আবার তা কোন ব্লগে প্রকাশ করলেন। এভাবে তা আবার পৌঁছে যাবে অসংখ্য ব্লগ পাঠকের কাছে খতীব সাহেব যদি লিংকডইন ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেইসবুক-টুইটার হয়ে তা লিংকডইনেও পোস্ট হয়ে যাবে। পৌঁছে যাবে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবিদের কাছে। এভাবেই এক বছরেই তা শেষ হবে না। বরং প্রতি বছর যখনই এপ্রিল ফুলের তারিখ ঘনিয়ে আসবে, আবারও তা সচর হয়ে এভাবে ঘুরবে চক্রের মাধ্যমে। এর কারণ হলো, মানুষ এখন অনলাইনেই বেশি পড়তে পছন্দ করেন। বিশেষ করে নিজের বন্ধু বা আত্মীয় কোন লেখা বা লিংক লাইক বা পছন্দ করলে প্রত্যেকেই তা পড়তে আগ্রহী হন। এটাই সামাজিক গণমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ার শক্তি। আর এ কারণেই ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা এত তুঙ্গে। ফেইসবুক-টুইটারের এই অনলাইন চক্রের মাধ্যমে যে কোন বার্তা মুহূর্তেই পৌঁছে দেয়া সম্ভব বিশ্বের যে কোন গণমাধ্যমের কাছে। এভাবে বিশ্বকে খুব সহজেই জানিয়ে দেয়া যায় প্রকৃত সত্য। আর দ্বীনের খিদমত করা যায় কল্পনাতীত ভাবে।

সাত.

ইন্টারনেটের বিশাল এ ময়দানে খিদমতের আরো অসংখ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান। বাস্তব পৃথিবীতে আমরা কোন খিদমতের চিন্তা করলে নানা সীমাবদ্ধতা সামনে চলে আসে। কিন্তু ইন্টারনেটে সেগুলো খুব সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পরিচালিত কয়েকটি ইসলামী ওয়েবসাইটের কিছু খিদমাত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

ক.

.....এই ওয়েবসাইটটি সাউথ আফ্রিকার মাদ্রাসা ইনয়ামিয়াহ কর্তৃক পরিচালিত। মুফতী ইবরাহীম দেসায়ী দেওবন্দী দা.বা. এর তত্ত্বাবধান করছেন। ২০০৪ এ শুরু হওয়া এই ওয়েবসাইটটি মূলত ফাতওয়ার ওয়েবসাইট। দারুল ইফতা থেকে প্রতিদিনই বেশ কিছু প্রশ্নের দালিলিক উত্তর প্রদান করা হয় এখানে। ইংরেজী ভাষায় কুরআন-সুন্নাহর দলীলসহ হানাফী ফিক্বহের অনুসারীদের কাছেই জনপ্রিয়। সাইটটিতে ইংরেজী ভাষায় আকিদা, সালাত, সাওম, হাজ্ব, যাকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক বিষয়, ইসলামের ইতিহাস, সীরাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাজার হাজার উত্তর রয়েছে।

খ.

darulirfta-deoband.org- এই সাইটটি দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতার ওয়েবসাইট। ২০০৬ এ প্রতিষ্ঠিত এ ওয়েবসাইটটিতে আরবী, উর্দু ও ইংরেজীতে হাজারো ফাতওয়া রয়েছে।

গ.

islamhouse.com সাইটটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর প্রায় ৫০টি ভাষায় ইসলামী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই, অডিও, ভিডিও ও ফাতওয়া আপলোড করা হয়ে এতে। সাইটটিতে হাজার হাজার পেজ রয়েছে এবং প্রতিবছরই শত শত মানুষ সাইটটির মাধ্যমে মুসলিম হয় বলে বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ঘ.

dorar.net সাইটটি ইসলামী জ্ঞানের বিশ্বকোষের মতো। এতে আক্বিদা, ফিক্বহ, সুনান, তারীখ, বিভিন্ন মিল্লাত ও দ্বীন ও ফিরাক ইত্যাদি বিষয়ে শত শত প্রবন্ধ ও বই রয়েছে। হাদীস খুঁজতে দেয়া হলে পূর্ণ সূত্রসহ চলে আসে। এমন আরো নানাবিধ সুবিধা নিয়ে সাইটটি সাজানো। এছাড়া আরো হাজারো ওয়েবসাইট আছে, যেগুলোতে বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করা হচ্ছে। ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম, রেডিও, অডিও-ভিডিও সাইট, কুরআন-সুন্নাহ ফিকহসহ নানা বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ফোরাম, আলেমদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। প্রিয় পাঠকদেরকে sultan.org/a সাইটটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী ওয়েবসাইটের সূচী দেয়া আছে। সাইটগুলো ভিজিট করলে ইন্টারনেটভিত্তিক দ্বীনি খিদমতের পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক দিন। আমীন।

যারা রাসূলের স্ত্রীদেরকে নিয়ে কটূক্তি করে তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড

উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং অন্যান্য পুত-পবিত্র স্ত্রীর প্রতি অপবাদকারীদের হুকুম কুরআন মাজীদের এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যে ব্যক্তি সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুতপবিত্র অর্ধাঙ্গিনী, আসমান থেকে পুতপবিত্র বলে যার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, যে আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর প্রতি অপবাদ দিবে সে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির ও মুরতাদ। কারণ সে সুস্পষ্টভাবে কুরআনে কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও অস্বীকারকারী। যেমনিভাবে হযরত মারয়াম সিদ্দীকা বিনতে ইমরান আ. এর পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফরী এরূপভাবে আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে উম্মে রুমানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও সংশয় রাখা নিঃসন্দেহে কুফরী। যেরূপভাবে কল্যাণহীন অশুভ ব্যর্থ ইহুদীরা হযরত মারয়াম সিদ্দীকা (আ.) এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার ফলে অভিশপ্ত ও ক্রোধে

পতিত হযেছে। তেমনিভাবে রাফিযী শিয়ারা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীকের প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে অভিশপ্ত ও ক্রোধে নিপতিত হয়েছে। সিদ্দীকা (রা.) এর প্রতি অপবাদ আরোপকারারী হল, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইয়াহুদী। কোন এক রাফিযী আহলে বাইতের কোন এক ইমামের সামনে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি ভর্ৎসনা করল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় গোলামকে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন-

هذا رَجُلٌ طَعَنَ على النبي ﷺ وقال الله تعالى : اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة النور) فإِنْ كانت عائشةُ خبيثةً فالنبيُ صلى الله عليه وسلم خبيثٌ. فهو كافرٌ, فاضربوا عنقه, فضربوا عنقه وأنا حَاضِرٌ.

"যে ব্যক্তি আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর প্রতি অপবাদ দিল, বস্তুত সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভর্ৎসনা করল। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ রয়েছে, খবীস রমনী খবীস পুরুষের জন্য। (সূরা নূর-২৬) অতএব (নাউযুবিল্লাহ) যদি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) খবীস হন তবে (নাউযুবিল্লাহ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অবশ্যই খবীস হওয়া আবশ্যক হবে। আর যে খবীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবীস বলবে সে নিঃসন্দেহে কাফির এবং হত্যার যোগ্য। রাফিযীর গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। তার গর্দান যখন উড়িয়ে দেয়া হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

এরূপভাবে হাসান ইবনে যায়েদ (রা.) এর সামনে এক ইরাকী আম্মাজান আয়েশা রা. এর শানে বাজে বকতে আরম্ভ করে। তখনই হযরত হাসান ইবনে যায়েদ উঠে প্রচন্ড জোরে এক ডান্ডা দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানেন। সাথে সাথে মাথার মগজ বেরিয়ে যায়। ফলে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। (আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল) এমনিভাবে পবিত্র সহধর্মিনীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণকারীও কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি প্রকাশ্যে মিম্বরে ইরশাদ করেছেন-

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي

"হে মুসলিম সম্প্রদায়! কে আছে যে, এই শত্রুর মুকাবেলায় আমায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের বিষয়ে কষ্ট দিয়েছে।" (বুখারী শরীফ)

এদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মধ্য থেকে কারোও ব্যাপারে কোন অপবিত্র শব্দ জবান থেকে বের করে চাই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ই হোন অথবা অন্য কোন সহধর্মিণী, সেটা তাঁর জন্য কষ্ট-তকলিফের কারণ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় সে নিঃসন্দেহে কাফের। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا○

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আহযাব-৫৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কে আছে যে, আমাকে সে ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে।" প্রিয়নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলার সাথে সাথেই হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাকে হত্যা করার জন্য মনে-প্রাণে উপস্থিত।

একারণেই উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ দিবে সে ফাসেক ও বদকার। আর যে খবিস তার খবীসীপনার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ দিবে সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির। তা তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণকে কুরআনে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (মুসলমানদের জননী) আখ্যায়িত করেছেন।

النَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ○

"নজীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা নিটকতম। নবীর স্ত্রীগণ ঈমানদারদের জননী।" (সূরা আহযাব-৬ নং আয়াত) আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর যে ঘটনাটি নিয়ে বেঈমান ও নাস্তিকেরা আলোচনা করে। উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেন, আম্মাজান আয়েশা রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে লটারী দিতেন। এতে যার নাম আসত তাঁকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা রা. বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরাইসীর যুদ্ধে) তিনি যাবার ইচ্ছা করলে আমাদের ব্যাপারে লটারী দিতেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। (অর্থাৎ নামানোর সময় হাওদার ভিতরে থাকত। বাইরে বের হত না) এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন।

ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে (এক জায়গায় অবতরণ করলেন) তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনা (ছাউনি) অতিক্রম করে (একটু দূরে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফর শহরের পুঁতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হওদা (পালকী) উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম।

তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি। কারণ মহিলাগণ তখন খুবই হালকাপাতলা গড়নের হতেন। মোটা ছিলেন না। তাদের দেহ মাংসও ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেতেন। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হালকা হওয়ার বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্য দল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাদের কোন আহ্বায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তারা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমাকে নেয়ার জন্য আমার কাছে ফিরে আসবেন। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পরলাম।

বনু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রা.) (যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার ও ক্লান্ত লোককে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।) সৈন্য দলের পিছু পিছু আসতেন। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থান স্থলের কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত

মানুষের ছায়া দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে।

তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমি তৎক্ষণাৎ চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলি নি এবং তাঁর থেকে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলেন। (অর্থাৎ উটের সামনের পা বাঁকিয়ে দিলেন যাতে উম্মুল মু'মিনীন সহজে তার পিঠে আরোহণ করতে পারেন।) আমি গিয়ে তাতে পা রেখে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন। পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচন্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সৈন্যদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একটি জায়গায় অবতরণ করেছিলেন।

আম্মাজানা আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল (মুনাফিক) সে অপবাদের কথাগুলো প্রচার এবং তার সামনে এগুলো আলোচনা করা হত। আর এমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং সেগুলো প্রচার করত।

আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমরা মদিনায় আসলাম। মদিনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কারণ, এ অসুখের পূর্বে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। শুধু এতটুকু ছিল যে, তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু এ জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। অবশেষে যখন কিছুটা সুস্থ হলাম তখন একদিন উম্মে মিসতাহ রা. এর মার কাছে জানতে পারলাম।

আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন,

আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন বাড়িতে গিয়ে আমি আমার আম্মাকে বললাম, মা লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটি! এ বিষয়টি হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমনীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা রা. বলেন, আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে? আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রু বন্ধ হল না। আমি একটু ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কেঁদেছিলাম।

তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে হযরত আলী ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) কে ডেকে পাঠালেন। তারা আসলে তাদের কাছে স্ত্রী আয়েশা রা. এর ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাঁর কাছে আহলে বাইত সম্বন্ধে যা জানা ছিল সে মুতাবিক পরামর্শ দিল। অতঃপর সে বলল, আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া মন্দ জানি না। হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছেন। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসীকে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথা বলবে। দাসী বারীরাকে ডেকে বললেন, হে বারীরা! তুমি তাঁর মধ্যে এমন কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি?যা তার সতীত্বে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

বারীরা(রা.) বললেন, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী মেয়ে রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলত।

এরপর সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) এর ব্যাপারে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে কে আমাকে সাহায্য করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি

না। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। এরপর সকালে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট আসলেন। অথচ আমি দু'রাত একদিন যাবত ক্রন্দন করেছিলাম। সে সময় আমার অশ্রুও বন্ধ হয়নি, ঘুমও আসেনি। মনে হচ্ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে কলিজা ফেটে যাবে। তখনও আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসাছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল।

তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলাম। ঠিক এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা রা. বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি। বসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা! তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে। যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার নিকট তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বললেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আম্মাকেও এমন কথা বললাম, তিনিও এমন উত্তর দিলেন। তখন আমি উত্তর দিলাম, আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না তথাপিও এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে এবং আপনারা তা সত্যায়ন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে

বিশ্বাস করবেন না। ... সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হল। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন তা হলো, 'আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন' আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, একথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য দাঁড়াও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি এখন তাঁর সামনে দাঁড়াব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না। (কেননা তিনি আমার দোষমুক্তির বার্তা নাযিল করেছেন।) তিনি বলেন, (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হল এই-

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)

"যারা সতী-সাধবী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে -সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে ষে, আল্লাহই সত্যপ্রকাশক। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সুচরিত্র পুরুষ সুচরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্যে আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা নূর, আয়াত- ২৩) এ স্থানে সুবহানাকা শব্দ এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ পুত-পবিত্র। তাঁর পবিত্র রাসূলের স্ত্রী ব্যভিচারিনী বানাতে পারেন না। অতএব, তোমাদের জন্য ফরয ও আবশ্যক হল, এটা শুনা মাত্রই বলা-سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ যেমন সা'দ ইবনে মুআয, আবু আইউব আনসারী এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) এ সংবাদ শুনামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাদের মুখ থেকেই একথা মুখনিঃসৃত হলো- سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (বুখারী, পৃ. ৩৫৭; দুররে মানছুর ৫/৩৪)

কুলাঙ্গার কার্টুনিস্টের নির্মম পরিণতি

যদিও মানুষের কাজকর্মের পূর্ণ প্রতিদানের ক্ষেত্র আখিরাত। কিন্তু দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন পূর্বের নবী-রাসূলগণের যুগে এই দৃষ্টান্ত কখনো কখনো হত অত্যন্ত ব্যাপক ও মর্মান্তিক। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার পরিণাম গোটা কওমকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার অনেক ঘটনা কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। কওমে আদ ও কওমে ছামুদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা কার না জানা আছে। নূহ (আ.) এর মহাপ্লাবন সম্পর্কে তো মুসলিম শিশু-কিশোররা পর্যন্ত অবগত। এইসব আযাব-গযব আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি কুফরী ও নাফরমানীর কারণেই। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী এই যে, গোটা উম্মতকে এক সঙ্গে আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হবে না। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা এই সৌভাগ্য উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করেছেন। বলাবাহুল্য, এই সৌভাগ্য ও অবকাশ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুমিন উম্মতের জন্য নয়; বরং এর সুবিধা তো বেশি ভোগ করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফের ও নাস্তিক উম্মত, যাদের শরীয়তের পরিভাষায় 'উম্মতে দাওয়াত' বলা হয়। অর্থাৎ তারা বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা 'উম্মতে ইজাবাত' বা নবীজির দাওয়াতে সাড়া দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তো কাফির-মুশরিকদেরও কর্তব্য ছিল, বিশ্ব নবীর এই অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনে নিজেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন আজাব থেকে আত্মরক্ষা করা। কিন্তু তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই এই নেয়ামতের শোকর গোযার করে এবং ইসলাম কবুল করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতে ইজাবাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকাংশই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নাফরমানীতেই লিপ্ত থাকে। এদের মধ্যে কিছু নরাধম তো এমনও আছে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শানে প্রকাশ্যে গোস্তাখীতে লিপ্ত হয় এবং এতেই তাদের পৈশাচিক স্বভাব শান্তি লাভ করে। এ ধরণের দুর্ভাগা মানবসন্তানের প্রতি কখনো কখনো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এমন আযাব ও গযব নাযিল করেন যে, তা যুগ যুগ ধরে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

অতি সম্প্রতি ডেনমার্কের এক কার্টুনিস্টের কথা বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়েছে। সে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে কটূক্তি স্বরূপ ব্যঙ্গচিত্র করে কার্টুন বানিয়েছিল। তার কৃতকর্মের কারণে সে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের ধিক্কার ও অভিশাপ কুড়িয়েছে। এরপর

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে এবং মুসলমানরা তার কথা প্রায় ভুলে যান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা গোস্তাখে রাসূলকে ভুলেননি। সম্প্রতি নিজ গৃহে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তার মৃত্যু ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। গোটা দেহ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরের কোথাও আগুনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। ডেনমার্ক সরকার তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে চাইলেও ধীরে ধীরে তা প্রচারিত হয়ে গেছে। এই লোকটি যখন তার পাপকর্ম প্রকাশ করছিল তখন গোটা বিশ্বের মুসলমান বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। কিন্তু যথারীতি অমুসলিম শক্তি তার পক্ষাবলম্বন করেছে এবং তাকে সুরক্ষা দিয়েছে। কিন্তু তার অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষের 'সুরক্ষা' কত দুর্বল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি বিদ্রোহ করে কখনো রক্ষা পাওয়া যায় না। তার পক্ষাবলম্বনকারীরা শুধু এইটুকু করতে পারছে যে, তার মৃত্যু সংবাদের ব্যাপারে প্রচার রোধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে কি ঐ দুর্ভাগার কোন উপকার হয়েছে? সত্যিই আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন এবং তা রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

বগুড়া পলিটেকনিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক প্রকাশ

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের যা বার্ষিক স্যুভেনিরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক প্রকাশ করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই পলিটেকনিকের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও বিভাগীয় প্রধানকে স্ট্যান্ডরিলিজ করেছে। একই সঙ্গে স্যুভেনির প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর শহিদুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত ও ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক রচয়িতা ছাত্র আব্দুল হালিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আটককৃত ছাত্রকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। জানুয়ারী ২০০৮ ইং।

বৃটেন ও ফ্রান্স সরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা

১ম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির কাছে তুরস্ক হারার পর ১৯২০ সালের দিকে যখন উসমানী খিলাফতের একদম ভঙ্গুর অবস্থা সেই সময় বৃটেন ও ফ্রান্স সরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করে। এমনকি ঐ নাটকের টিকেটও বিক্রি করা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে উসমানী খিলাফতের সর্বশেষ খলিফা হয় আব্দুল মাজিদ। বৃটেন ও ফ্রান্স সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে নিয়ে ঐ ব্যঙ্গাত্মক নাটকটি মঞ্চস্থ না করার। এর উত্তরে বৃটেন ও ফ্রান্স সরকার খলিফা আব্দুল মাজিদকে তাদের দেওয়া মত প্রকাশ করার স্বাধীনতার কথা বলে। এর উত্তরে মুসলিম জাহানের সর্বশেষ খলিফা আব্দুল মাজিদ বৃটেন ও ফ্রান্স সরকারকে বলেছিলেন, 'আপনারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঐ ব্যঙ্গাত্মক নাকটটি মঞ্চস্থ করেন তাহলে আমি জিহাদে আকবরের ঘোষণা দিব।' খলিফার এই কথা শুনে বৃটেন ও ফ্রান্স সরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে ঐ ব্যঙ্গাত্মক নাটকটি আর মঞ্চস্থ করার সাহস পায়নি। জিহাদে আকবর বলতে আমরা হয়তো বুঝেছি যে বড় জিহাদ। আসলে তা নয়। জিহাদে আকবর মানে হলো কোন বাদশাহ যখন জিহাদে আকবরের ঘোষণা দেন তখন আর কোন ছেলে পুরুষ ঘরে থাকতে পারবে না। তাকে অবশ্যই কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আর আজকে খিলাফত বিলুপ্ত হবার প্রায় ১০০ বছর পর পশ্চিমা বিশ্বে কত লক্ষবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কত ব্যঙ্গাত্মক নাকট মঞ্চস্থ করা হয়েছে, কত অশ্লীল কার্টুন আঁকা হয়েছে- তার পরিসংখ্যান নেই। এমনকি বর্তমানে ইউকিপিডিয়ায় পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করা হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের শাস্তি

মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) এর দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছে। হযরত উমর রা. তাকে হত্যা করেন। অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা বা কোন নবীকে গালি দিবে তোমরা তাকে হত্যা করবে।

(আসসারিমুল মাসলূল ৪/৪১৯)

মক্কা বিজয়কালে হুয়াইরিস ইবনে নুকাইজকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেছিলেন। এ ব্যক্তিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত।

(আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২৯৮)

উমরের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে কোন নবীকে গালি দিবে, সমালোচনা করবে তাকে হত্যা করা হবে। এটাই তার শাস্তি। মক্কা বিজয়কালে ইবনে খাতালের বান্দীদ্বয়কেও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে হত্যা করা হয়। যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ কবিতা-গান আবৃত্তি করত।

(আসাহহুস সিয়ার-পৃ. ২৬৬)

আল্লামা তাহের বোখারী (রহ.)লিখেন, যদি কোন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয় বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্মীয় কর্মকান্ড নিয়ে মন্তব্য করে বা তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমালোচনা করে, তার কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দোষ-ত্রুটি চর্চা করে সে ব্যক্তি নবীর উম্মত হোক বা অন্য কোন নবীর উম্মত, মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রিত কাফের হোক বা শত্রু কাফের, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, গালি, অবমাননা করা মন্তব্য, বক্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছায়, বুঝে শোনে হোক বা অসাবধানতাবশত, সর্বাবস্থায় সে চিরস্থায়ী কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। তার এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য বলে ধার্য হবে এপার ওপার উভয় আদালতে। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী ওলামা মুজতাহিদীন সকলের ঐক্যমতে তার অপরিবর্তনীয় শাস্তি মৃত্যুদন্ড। মুসলিম শাসকদের জন্য কঠোর হস্তে এই বিধান বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৬/৩৮৬)

নবীজির সমালোচনাকারী, ব্যঙ্গবিদ্রূপকারী, ইসলাম ধর্মত্যাগকারী সাধারণ মুরতাদের মত নয়, যে ধর্ম ত্যাগ করল সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অন্য কারো জন্য ক্ষতিকারক নয়। এ কারণে সে তওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য ও সাজা মাপ হতে পারে। তবে যে ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করবে, সমালোচনা করবে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে সে সাধারণ অপরাধী নয়, সে তো বিশ্ব মানবতার শান্তির দূত রহমাতুল্লিল আলামীনের সাথে বেয়াদবী করেছে। যা গোটা মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। তাই তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য নয়। সারকথা হলো, যে ব্যক্তি নবীগণের যে কোন নবীর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করবে সে নিকৃষ্টতম কাফের। তার শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদন্ড। যদি সে ঈসা আ.কে নিয়েই এমন করুক না কেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী চিঠি অবমাননার কারণে পারস্য সম্রাটের করুণ পরিণতি

৭ম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের কাছে পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। পারস্যের বাদশাহ কিসরার কাছে পাঠালেন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.কে। কিসরার বাদশাহ খসরু পারভেজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানে তো সাড়া দিলই না; বরং চরম আক্রোশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রটি ছিরে টুকরো টুকরো করে ছুড়ে ফেলল। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা শুনে বললেন, ... "হে আল্লাহ! আপনি তার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে দিন।" এরপর কিসরা তার ছেলে শিরওয়ার হাতে নিহত হয়। (বুখারী শরীফ)

দেখুন সেই চিঠি-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الله، إِلَى كِسْرى عَظِيْمِ فَارِسَ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وآمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَشَهِدَ اَنْ لا اله الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ له, وأن محمدًا عبدُه ورسوله. أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ. فَإِني انا رسولُ الله الى الناسِ كافةً لِيُنْذَرَ مَنْ كَان حَيًّا ويُحق القول على الكافرين, أَسْلِمْ تَسْلَمْ. فَإِنْ اَبَيْتَ. فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوْسِ.

"মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য কিসরার নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়েতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর হুকুম (ইসলাম) এর দিকে আহ্বান করছি। কারণ, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সমস্ত মানবজাতির প্রতি রাসূল। যেনো জীবন্ত অন্তর বিশিষ্ট (প্রাণবন্ত) লোক ভয় পায়, আর কাফিরদের উপর প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আর অস্বীকার করলে সমস্ত অগ্নি উপাসকদের গুনাহ আপনার উপর হবে।" (বুখারী শরীফ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাফা রা.কে নির্দেশ দিলেন এই চিঠি যেন বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাবীকে দেন। বাহরাইন অঞ্চল তৎকালীন সময়ে পারস্য সম্রাটের অধীনস্থ ছিল। বাহরাইনের শাসক এই সম্মানিত পত্র পারস্য সম্রাটকে দেন। তিনি সে পারস্য সম্রাট যিনি খসরু পারভেজ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন নওশেরাওঁয়ার নাতি। সে চিঠি টুকরো টুকরো করে ফেলেন। যার ইতিহাস হলো, কিসরার স্ত্রীর নাম ছিল শিরীন। তার প্রতি কিসরার ছেলে শেরওয়াইহ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। তাকে কবজা করার জন্য পিতাকে সে আহত করিয়ে দেয়। কিসরা অর্থাৎ খসরু পারভেজ জানতে পারলেন, এ কাজ হল আমার ছেলে শেরওয়াইহের। ফলে তিনি তার বিশেষ ভান্ডারে একটি ডিব্বায় বিষ রেখে দেন। তার উপর লেখে الدَّاءُ النَّافِعُ لِلْجِمَاعِ(সহবাসের উপকারী ঔষধ)। অতঃপর খসরু পারভেজ মৃত্যু বরণ করেন। এ বার তার ছেলে শেরওয়াইহ যখন বিশেষ ভান্ডার খুলে দেখলেন, তাতে الدَّاءُ النَّافِعُ لِلْجِمَاعِ লেখা, ফলে সে খুব খুশী হল

এবং যৌনশক্তির ঔষধ মনে করে খেয়ে ফেলেন এবং বিষক্রিয়ায় সেও মৃত্যু বরণ করেন। আর রাতে তার সৎমা শিরিন ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা করে। শেরওয়াইহ ভয়ে তার বাবার সময়ের বড় বড় উজির নাজিরদেরকে হত্যা করে, এতো ব্যক্তি ও সত্তার উপর ধ্বংস এল, রাজ্যের উপর বিপদ এল যে, শেরওয়াইহের মৃত্যুর পর তার এক কম বয়স্কা কন্যা শাহী মসনদে সমাসীন হয়। রাষ্ট্রীয় দলাদলি এভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তার রাজত্বের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

রাসূলের সুন্নাত নিয়ে কটূক্তি করা ও ঈমান ধ্বংসকারী

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত খারাপ ভাষায় পাগড়ীকে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং কটূক্তিমূলক খুবই মারাত্মক ভাষায় গালি-গালাজ করে, তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর : কেউ যদি প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নাত নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিংবা অপছন্দ করে গালি-গালাজ করে, অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাহলে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই সতর্কতামূলক এই ব্যক্তির ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করা জরুরী। (মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৭৭; উমদাতুল কারী ১৫/২২; ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/২৬৩; মুহীতুল বুরহানী ৫/৫৬১)

৬৬৫ হিজরী বসরা এলাকার এক বক্তা মেসওয়াকের ফযীলত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু সাল্লাম নামের এক কুলাঙ্গার মজলিসে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত মেসওয়াক নিয়ে কটূক্তি, ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করল। সবার সামনে অপবিত্র মুখে আজে বাজে কথা বলতে লাগল। খুব জোরালেভাবে বলতে লাগল আমি মেসওয়াককে আমার পায়খানার রাস্তায় ব্যবহার করব (নাউযুবিল্লাহ)। এই নির্লজ্জ ভরপুর মজলিসে তার মেসওয়াকটি কিছুক্ষণ পায়খানার রাস্তায় রেখে বের করে আনল।

এরপর আল্লাহ্ তাকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত তার পায়খানার রাস্তার ও পেটের পীড়া লেগে থাকল। নয় মাস পর তার পেট থেকে ইদুরের মত একটি জানোয়ার বের হল। তার চারটি পা ছিল, মুখটি ছিল মাছের মত, চারটি দাঁত বাইরে বের হয়েছিল, এক বিঘত লম্বা লেজ ছিল এবং পিছনের অংশ খরগোশের মত ছিল। বের হওয়ার পর বিকট শব্দে একটা চিৎকার দিল। আবু সাল্লামের মেয়ে জানোয়ারটির মাথা পাথর দিয়ে পিষে দিল। এরপর আবু সাল্লাম দুই দিন জীবিত ছিল, তৃতীয় দিন সে এই কথা বলে মৃত্যুবরণ করল যে, ঐ জানোয়ারটি আমাকে হত্যা করেছে। এই অত্যাশ্চর্য জানোয়ারটা ঐ এলাকার অনেক মানুষই দেখেছে। কেউ জীবিত দেখেছে কেউ মৃত দেখেছে।

(সাপ্তাহিক খতমে নবুওয়াত করাচি ৬/৩৭)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর করুণ পরিণতি

ইতিহাসের গ্রন্থাদি অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবী করেছিল। এবং সে এই মতবাদের উপর পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি গোলাম আহমদ এ যুগের নবী।" একথা সত্য যে, মিথ্যুক গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে হক্কানী আলেম আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. বলেন, সে পত্রের মধ্যে মুবাহালা করে মির্জা যেন আযাব নিজেই টেনে আনল। তার ছেলে মির্জা বশির উদ্দীন ছিরাতুল মাহদীর প্রথম খন্ডের ১১ নং পৃষ্ঠার ১১ নং পরিচ্ছেদে লিখেন- যা সে তার মা হতে নকল করে। মির্জা কাদিয়ানী প্রথমতঃ পাতলা পায়খানা হলে আমরা তার সেবায় নিয়োজিত হই। এইভাবে কয়েকবার পায়খানা আর বমি হওয়ায় তার শরীর এতটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সে বাইরে যাওয়ার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এ কারণে শয়ন কক্ষেই একটি টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়। লাহুরে ১৯০৮ ইং রোজ মঙ্গলবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়। ভন্ড ও কাফেরদের মৃত্যু তো এমনিভাবেই হয়। (তাফসীরে মাজহারী ২/২৫৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কটূক্তিকারীনী উম্মে জামিলের নির্মম পরিণতি

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলও অশুভ আচরণে স্বামীর সহকর্মী ছিলো বিশেষ করে সে অসাধারণ যোগান দিত। সে লোকদের নিকট মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অপব্যাখ্যা সরবরাহে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥)

"ইন্ধন বহনকারীনী তার স্ত্রীও (অগ্নিতে পতিত হবে) তার গলায় খেজুরের ছালের তৈরি রশি ভাগ্যে রয়েছে" সে বন-জঙ্গল থেকে কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চলাচলের রাস্তায় পুঁতে রাখত। একদিনে ঘটনা : কাঁটাযুক্ত সেই লাকড়ীর বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। বোঝা মাথায় নিয়ে বিশ্রামের জন্য একটি পাথরে বসে বোঝাটির রশি গলার সাথে পেঁচানো ছিল। পেছন থেকে একজন ফেরেশতা রশি ধরে টান দিলে গলার ফাঁস লেগে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় এ জগত ছেড়ে পরকালের অগ্নিকুন্ডে নিপতিত হয়। উম্মে জামিল বস্তুত সত্যের পথে প্রতিরোধের যোগান দিয়ে যেতো। সত্যের কণ্ঠ, মুক্তি ও চির কল্যাণের বাণী রোধ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, তাই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আর পরকালের মজা তো পেতেই হবে। এমনিভাবে মুফাসসিল মুফা ও তার দোসরদের জন্যও রয়েছে এমন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যকারীনী বাদীর শাস্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ সাহাবী। তাঁর একটি দাসী ছিল। (যার থেকে ওই সাহাবীর সন্তানও ছিল) দাসীটি প্রায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে থাকতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করত। অন্ধ সাহাবী বিভিন্নভাবে তাকে এর থেকে বারণ করতেন। কিন্তু সে নিবৃত হতো না। সাহাবী তাকে বকাবকি করতেন। কিন্তু সে কোনভাবেই নিবৃত হতো না। একবার সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী শুরু করলে অন্ধ সাহাবী কৌশলে তার পেটের উপর খঞ্জর রেখে শরীরের পুরো শক্তি দিয়ে চেয়ে ধরলেন এবং ওই কুলাঙ্গার দাসীকে হত্যা করলেন। তার দুপায়ের মাঝে বেরিয়ে আসল শিশু। রক্তাক্ত হয়ে গেলো সেখানে থাকা সবকিছু বের হয়ে এলো। সংবাদটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছলে উপস্থিত করা হলো সকলকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, একাজ যে করেছ দাঁড়িয়ে যাও। অন্ধ সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। অসংখ্য মানুষের ভিড় ঠেলে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এগিয়ে গেলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে। কম্পিত বদনে হাজির হলেন। বললেন, এ দাসীকে আমি হত্যা করেছি। সে আপনার সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করত, বেয়াদবী করত আপনার শানে। আমি বহু চেষ্টা করেছি তাকে বারণ করতে। কিন্তু সে কোনভাবেই নিবৃত হয়নি। এর থেকে আমার দুটি ফুট ফুটে সন্তানও রয়েছে। সে আমার খুবই অনুগত দাসী ছিল। কিন্তু আজ রাতে সে যখন আপনার ব্যাপারে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করল তখন আমি খঞ্জর নিয়ে তার পেটে সজোরে ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক এ সাহাবীর কোন শাস্তি হবে না। (কানযুল উম্মাল ৭/৩৬৭) চিন্তা করে দেখুন মালিকের ঈমানী জযবা উতরে উঠল। সকাল হওয়ার অপেক্ষা করেনি।

মহানবীকে ব্যঙ্গ করার প্রতিশোধ নিয়েছি

'মহানবীকে ব্যঙ্গ করর প্রতিশোধ নিয়েছি।' ফ্রান্সের প্যারিসে পত্রিকা অফিসসে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে হত্যার পর চিৎকার করে একথা বলতে থাকে বন্ধুকধারীরা। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে প্যারিস পুলিশ জানিয়েছে,

হামলাকারীরা বের হয়ে যাওয়ার সময় উচ্চঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে। তারা বলতে থাকে, 'মহানবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রতিশোধ নিয়েছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে রাজপাল রঙ্গিলা রাসূল বই প্রকাশ ও তার উচিত শিক্ষা

আলিমুদ্দীন রহ. ৮ ই যিলক্বাদাহ ১৩২৬ হি. মোতাবেক ৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ ই. বৃহস্পতিবার সুরিয়ানেওয়াল বাজার চিতে আলাহ কাটরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার ইসলামী শিক্ষা ছিল ফরযে আইন পরিমাণ। তবে রাসূলের ভালোবাসা ছিল টুইটম্বুর। তার স্বভাব ও রুচি এমন ছিল যে, তিনি ভদ্র শিক্ষিত ও আলেম সমাজের সঙ্গে উঠাবসা করতে এবং দ্বীনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ও শুনতে পছন্দ করতেন। ১৯২৮ ইং পিতার সঙ্গে কাজের জন্য কুহাট গিয়েছিলেন। সেখানকার বনু বাজারে ফার্নিচারের কাজ করতেন। প্রায় এক বছর সেখানে কাজ করার পর পিতার সঙ্গেই ১৯২৯ ইং মার্চ মাসে লাহোর চলে আসেন। তখন 'রঙ্গিলা রসূল' বই সম্পর্কে সভা সমাবেশ ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনা চলছিল। আলিমুদ্দীনের বড় ভাই মিয়া শায়েখ মুহাম্মদ দীন, 'মজলিসে আহরারের' সমাবেশগুলোতে গুরুত্বসহকারে উপস্থিত হতেন এবং খেলাফত মুভমেন্টের কাজগুলোকে খুব উৎসাহিত করতেন। আলিমুদ্দীন বই ভাইয়ের সঙ্গে দিল্লি গেটের মাহফিল শুনতে গেলেন। আলোচক ছিলেন সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী। সারা রাত আলোচনা হয়ে ফজরের আযানের সময় শেষ হল। আলোচনার বিষয় 'রঙ্গিলা রসূল'। আলিমুদ্দীনের বড় ভাইয়ের কাছে উক্ত বইয়ের বিষয়বস্তু এবং ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যারা ইতিপূর্বে রঙ্গিলা রসূলের প্রকাশক, রাজপালকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তথ্য জনার পর চুপ থাকলেন।

দু-একদিন পর আলিমুদ্দীন তার বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজপালকে যে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে, (আল্লাহর কাছে) তার পুরস্কার কী হবে? বড় ভাই বললেন, ঐ সৌভাগ্যবানকে শূলে চড়ানো হবে। তিনি মুচকি হেসে বললেন, এ তো খুব ভালো পুরস্কার।

হাজি কাশ্মীরি রহ. লিখেন, 'আমার মরহুম আব্বাজান বলতেন- এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য আলিমুদ্দীন ও তার সাথীদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। তাদের সবাই চাচ্ছিল এই সৌভাগ্য যেন সেই অর্জন করতে পারে। শেষে সবার সিদ্ধান্তক্রমে লটারীর ব্যবস্থা করা হল। লটারীতে যার নাম আসবে, এই বরমাল্য তাকেই পরানো হবে। অবশেষে সৌভাগ্যের দ্বার আলিমুদ্দীনের জন্যই উন্মুক্ত হল।

৬ই এপ্রিল শনিবার। বসন্তের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের কমনীয়তা প্রকৃতিপ্রেমীদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আলিমুদ্দীনের চোখেমুখে নতুন এক জ্যোতির্ময়তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সকাল থেকেই কেউ যেন তার দুই ঠোঁটে মুচকি হাসির আল্পনা এঁকে দিয়েছে। উচ্চতর পদে নিযুক্তির ফরমানপত্র যেন হাতে পেলেন। দ্বিপ্রহরের সময় ভাবির সঙ্গে কোন বিষয়ে ঠাট্টা করায় তিনি একটু রাগের ভাব করলেন। তখন আলিমুদ্দীন বললেন, "ভাবি! আমি আজ বড় খুশী। অনেক বেশী খুশী। আজ আমার কিসমত খুলে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্বাচন করে নিয়েছেন। আমি এক সুবিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী হতে যাচ্ছি। আজ আমি রাজপালকে টুকরো টুকরো করব।"

৬/৪/১৯২৯ ইং দুপুর প্রায় একটা বাজে। আলিমুদ্দীন রাজপালের দোকানে পৌঁছে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রাজপাল কোথায়? রাজপাল নিজেই তখন গতিতে বসা। উত্তর দিল, আমিই রাজপাল। কিন্তু মুহূর্তেই চমকে গিয়ে বলল, কেন তাকে দিয়ে কী কাজ? চোখের পলকে আলিমুদ্দীন রাজপালের উপর ছুরি দিয়ে সজোরে আক্রমণ করে বসলেন। বললেন, ব্যস। ওকে দিয়ে এটাই আমার কাজ। রাজপাল জীবনের তরে নিঃশেষ হয়ে গেল। মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ল, রাজপালকে হত্যা করা হয়েছে। খুব ধীরস্থিরভাবে কাছের একটি ছোট্ট নদীতে এসে আলিমুদ্দীন রক্তাক্ত ছুরি ও কাপড় ধৌত করতে লাগলেন। ছুরি ধুইতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল, রাজপাল হয়তো এখনো মরেনি। এই চিন্তা আসা মাত্র পুনরায় রাজপালের দোকানে ফিরে এলেন। ততক্ষণে পুলিশ চলে এসেছে। তাকে পেয়ে গ্রেফতার করল। এই ঘটনার পর আলিমুদ্দীনকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শান্ত দেখা গেছে। তার চেহারায় কোন ভয় বা শঙ্কার সামান্যতম আলামতও ছিল না।

ফৌজদারি আদালতে মামলা ওঠার পর, আরেক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন আলিমুদ্দীন। সেখানে নতুন করে তাকে আবার ইশকে রাসূলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাকে গোস্তাখে রাসূলের হত্যার দায় অস্বীকার করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল। তার সামনে এখন একদিকে হত্যার দায় অস্বীকার করে জীবনে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ, অপর দিকে হত্যার দায় স্বীকার করে মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার নিশ্চিত ঝুঁকি। একদিকে ইশকে রাসূলের কাশিশ ও আকর্ষণ অন্যদিকে পুরো দুনিয়া আশেকে রাসূলের প্রাণ রক্ষার দাবি নিয়ে তার সামনে দন্ডায়মান। এ অবস্থায় তিনি এক কঠিন দোটানা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন, এখন কী করবেন বা কী করা দরকার। অস্বীকার করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। আপন বড় ভাই সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করছেন, নির্বাক চাহনিতে বোন তার ভাইকে বেঁচে থাকার আকুতি জানাচ্ছেন, মা তার সামনে মমতার

আঁচল প্রসারিত করে ছেলে ছেলে বলে যেন তার করুণা ভিক্ষা চাইছেন। পিতা তার পিতৃত্বের ভালোবাসাপূর্ণ সবটুকু কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাদের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে দাবি মানাবার চেষ্টা করছেন। সবার একটাই দাবি, তোমার নিজের নয়; আমাদের জন্য হলেও অন্তত একবার শুধু বলে দাও, আমি তাকে হত্যা করিনি।

কথা বলার মুহূর্ত উপস্থিত। জজ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি হত্যার অপরাধ করেছ? অনেক গভীর চিন্তা করে, খুব বুঝেশুনে মাথা তুললেন। উচ্চারণ করলেন, 'মাইনে কেসি ইনসান কো কতল কারণে কা কো-ই জুরর নেহি কিয়া' (আমি কোন মানুষ হত্যার অপরাধ কখনো করি নি) যবান বন্দিতে এমন সুচিন্তিত বাক্য প্রয়োগ করলেন, যার দ্বারা দুই দিকই সামাল দেয়ার চেষ্টা করলেন। একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, তিনি নিজের অপরাধ অস্বীকার করছেন। কারণ তিনি রাজপালকে মানুষ মনে করতেন না।

সাক্ষ্য প্রমাণ ও স্বীকারোক্তির পালা শেষ উকিল জজদের জেরাও সম্পূর্ণ। বিচারকের রায় শোনানোর ঠিক আগ মুহূর্তে, আশেকে রাসূল আলিমুদ্দীন চিৎকার করে বলে উঠলেন, রাসূলের দুশমনকে আমিই হত্যা করেছি; আমিই অভিশপ্ত রাজপালকে জাহান্নামে পাঠিয়েছি।' দুনিয়ার সকল আকর্ষণের মোকাবেলায় আলিমুদ্দীনের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসাই প্রাধান্য পেল। সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারক তাকে মৃত্যুদন্ডের ফয়সালা শোনালেন। কিন্তু আলিমুদ্দীন সম্পূর্ণ শান্ত ও দৃঢ়চিত্ত; কোন দুশ্চিন্তাই আচ্ছন্ন করল না তাকে। বরং তখন যেন তার আপাদ মস্তক আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল। গুণগুণ করে গেয়ে উঠলেন-

"রাসূল বিরহে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে, প্রেমকাননে তো প্রতীক্ষার একটি শ্বাস নিঃশ্বাসের জীবনও অনেক কঠিন।"

অবশেষে অক্টোবর। আলিমুদ্দীনের আত্মীয়-স্বজনরা যখন তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। তখন জেলারদের কাছে তারা জানতে পারলেন, তিনি আজ খুব আনন্দিত। তারা বললেন, আজ হযরত মুসা (আ.) এর দীদার নসিব হয়েছে। স্বপ্নে এসে তিনি আমাকে সুসংবাদ শোনালেন, আলিমুদ্দীন! তোমাকে মোবারকবাদ। আল্লাহ তোমার কুরবানী কবুল করেছেন। আখেরী নবীর দরবারে তোমার খুব আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং আমি এজন্য খুশি যে, খুব শিগগিরই 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পৌঁছে যাব।"

পাহারাদার নওয়াব দীন বলেন, পরদিন সকাল ছয়টায় তাকে ফাঁসি দেয়ার কথা। রাত দুইটা থেকে তিনটার ভিতরে দেখলাম, তার কুটরিতে এমন একটি আলো নেমে আসল, যাতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে আলোর

প্রখরতায় আমার চোখ বন্ধই হয়ে গেল। এরপর আবার হঠাৎ সেই আলো গায়েব হয়ে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার! আলোর সঙ্গে সঙ্গে আলিমুদ্দীনও গায়েব হয়ে গেল। আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। কারণ ইংরেজরা তো আলিমুদ্দীনকে না পেয়ে এখন আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলাবে। এরপর রাত চারটায় আবার সেই আলো নেমে আসল। কুঠরির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এবার আলিমুদ্দীনও উপস্থিত। আমি তার পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দাও। আমি না বুঝে তোমাকে কত কিছুই না বলেছি। তিনি বললেন, আরে বুজুর্গ! আপনার কথায় আমি কিছু মনে করি নি; আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন, শান্তিতে রাখুন। আমি বললাম, বেটা! তুমি এমন কাজ করেছ, যা কেউ করতে পারে না। তোমার উপর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ছায়া আছে। আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি, একটু বল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তিনি বললেন, আমি তো এখানেই ছিলাম। তারপর আমি বললাম, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদগ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোহাই দিয়ে বলছি, বল তুমি কোথায় গিয়েছিলে? অবশেষে আলিমুদ্দীন বাধ্য হয়ে বললেন, বুজুর্গ শোন! হযরত আলী (রা.) এসেছিলেন। তিনি সঙ্গে করে আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানকার কথা আমি কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না। সেখানকার বর্ণনা দেয়ার ভাষাও আমার নেই। সেখানে আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পেশ করা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, তুমি যদি মুক্তি চাও, তবে এখন তোমাকে মুক্ত মনে করতে পার। আর যদি কেয়ামত পর্যন্ত সম্মান পেতে চাও, তবে তোমাকে আবার সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে। এরপর আমার চাওয়ার ফলে হযরত আলী রা. আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

ফাঁসির পূর্বে সকলের সাথে সাক্ষাৎ

২৮ শে অক্টোবর। আলিমুদ্দীনের আত্মীয়-স্বজনরা যখন তার সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাতের জন্য কারাগারে যেতে চাইলেন, তখন তিনি খবর দিয়ে দিলেন, তার কাছে গিয়ে যে কান্নাকাটি করবে, তার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন না। প্রথম গ্রুপ যখন তার কুঠরির কাছাকাছি পৌঁছে আলিমুদ্দীন তাদের এগিয়ে আসলেন। এই গ্রুপে ছিল শুধু মহিলা। আলিমুদ্দীন তার মাকে বললেন, মা! খোদার শোকর আমার এমন মৃত্যু নসিব হচ্ছে, যা প্রকৃত অর্থে মৃত্যুই নয়। মানুষ তো সাপের কাপড়েও মরে যায়। কিন্তু আমার মৃত্যু তো আদর্শিক মৃত্যু। কান্নাকাটির কোন প্রয়োজন নেই। তোমার সঙ্গে আমার প্রতি অষ্টম দিনে সাক্ষাত হবে

ইনশাআল্লাহ। আমার জানাযা লাহোর নিয়ে যাবে। জেলারকে আমি বলে দিয়েছি, যখন আমার ফাঁসির সময় হবে, তখন যেন আমার হাত না বাঁধে। কারণ আমি স্বেচ্ছায় বীরের মত প্রাণ দিতে চাই। বরং ফাঁসির রশিতে চুমু খেয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে চড়তে চাই ইনশাআল্লাহ। ভাইকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আপনি একা নন সকল মুসলমানই আপনার আপন ভাই। আমার সঙ্গে হিন্দুদের কোন দুশমনী নেই। আমি যখন লাহোর কারাগারে ছিলাম, তখন ভগত সিংহকে বলেছি, রাজপাল মূলত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লোক ছিল। সে চাচ্ছিল হিন্দু মুসলমানদের মাঝে একটা দাঙ্গা তৈরি হোক। এ জন্য আমি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছি, যাতে আমার দেশের মানুষ নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারে। কারণ, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়, সেখানে কখনো নিরাপত্তা থাকতে পারে না। আরো বললেন, আমি কিছু কবিতা লিখেছি। শেষ সাক্ষাতের সময় দিয়ে দিব। এরপর অসিয়ত করলেন, আমাকে যেন পারিবারিক গোরস্থানে এবং কাঁচা কবরে দাফন করা হয়। শেষে বললেন, আমার বন্ধু তাহেরুদ্দীনকে এবং তার সঙ্গীদেরকে সালাম বললেবন।

৩০ শে অক্টোবর। আলিমুদ্দীনের নিকটাত্মীয়দেরকে শেষ সাক্ষাতের জন্য ডেকে নেয়া হয়েছে। সাক্ষাতের জন্য তাদেরকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১৪জন করে। প্রথম গ্রুপে গিয়েছে আলিমুদ্দীনের পিতা মিয়া মালেমান্দের সঙ্গে। আলিমুদ্দীন তাদেরকে মুচকি হেসে সাক্ষাত দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন করে তাদের সবার খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করলেন। পিতাকে বললেন, আমার কবর আপনার নিজের হাতে তৈরি করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আলিমুদ্দিন তখন রোযা রেখেছেন। মেহমানদেরকে তার কলস থেকে একটু একটু করে পানি পান করালেন।

দ্বিতীয় গ্রুপ আলিমুদ্দীনের মায়ের সঙ্গে উপস্থিত হল। এরা সবাই মহিলা। আম্মাজানকে বললেন, তিনি যেন আফসোসের পরিবর্তে গর্ব করেন যে, আমি এমন এক সন্তান জন্ম দিয়েছি, যে অচিরেই শাহাদাতের সর্বোচ্চ মাকাম অর্জন করতে যাচ্ছে। এ তো আপনারই উন্নত তারবিয়াত ও নেক দোয়ার ফসল। না হয় আমার মতো এমন গোনাহগার ও গাফেল কী করে এই মাকামে সমাসীন হতে পারে।

তৃতীয় গ্রুপ কাফেলা আলিমুদ্দীনের বড় ভাই মিয়া মুহাম্মদের সঙ্গে তার সামনে উপস্থিত হল। সবারই খোঁজখবর নিলেন এবং বড় ভাইয়ের সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন।

চতুর্থ গ্রুপ কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন আলিমুদ্দীনের বড় বোন মেরাজ বেগম। এ কাফেলাও শুধু নারীদের। তাদেরও একজন একজন করে সবার খোঁজখবর নিলেন। বোনের সাথে অত্যন্ত মোহাব্বতের সঙ্গে কথা বললেন। বললেন, বোন তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। আজ থেকে তুমি শহীদে শানে রেসালাতের বোন হিসাবে পরিচিত হবে। কোন বোনের আবেগ আকুতি শব্দের জালে তুলে আনা যায় না। সুতরাং এখানে বোনের কী অভিব্যক্তি ছিল, সে সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থাকাই শ্রেয়। সেই দৃশ্য আসলে লেখার বা শোনার না। তা ছিল দেখার এবং অনুভব করার। দেখার জন্যও অবশ্য সেই রকম পবিত্র চোখ দরকার। সর্বশেষ কাফেলা তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধ-বান্ধবদের ছিল।

২৬ শে জুমাদাল উলা, ১৩৪৮ হিঃ মোতাবেক ৩১ শে অক্টোবর ১৯৩৯ ইং বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দীন ফজরের নামায আদায় করে কেবলামুখী হয়ে দরুদ অজিফা আদায় করলেন। সাড়ে ছয়টায় ডাক্তার ও দারোগা এসে সুসংবাদ দিলেন, আলিমুদ্দীন সাহেব! যেই মোবারক মুহূর্তের জন্য আপনি প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন, সেই মুহূর্ত উপস্থিত। তিনি বললেন, আমিও উপস্থিত। চলুন। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সর্বশেষ কোন তামান্না আছে কি? আলিমুদ্দীন মুচকি হেসে বললেন, শুধু দুই রাকাত শোকরানা নামায। দুই রাকাত নামায আদায় করলেন এবং মঞ্জিলে মাকসুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। .... এরপর বললেন, তোমরা সবাই আমার কালিমার সাক্ষ্য হও। এরপর তিনি উঁচু আওয়াজে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং ফাঁসির রশিটি চুম্বন করে দরুদ সালাম পাঠ করতে করতে নিজেই ফাঁসির রশি গলায় পরিধান করলেন। এরপর রশি আবার গলা থেকে খুলে ফেললেন। এরপর ঠিক সাতটার সময় তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে মিলিত হলেন। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, নভেম্বর-৮৯ ইং) (মাসিক না'ত, লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং পৃ. ৭৭) (গবাজি আলমুদ্দীন শহীদ, রায় কামাল পৃ. ৬৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারী মুনশিরাম সোয়াম শ্রদ্ধানন্দর উচিত শিক্ষা

শ্রদ্ধানন্দ ছিল হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রধান 'দায়ী' ও কালের কলংক 'শোদ্ধ আন্দোলনের' প্রতিষ্ঠাতা। আর আসল নাম ছিল মুনশি রাম। রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর তার নাম হয়ে যায় সোয়ামি শ্রদ্ধানন্দ। সে ছিল ঐ সমস্ত লোকদের অন্যতম, যাদেরকে ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল এবং হিন্দুদেরকে শক্ত করার জন্য তাদের চালের ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। সে ছিল বেনারসের বাসিন্দা। কর্মজীবনে পুলিশের সাধারণ পদ (বেশি সম্ভব পাব

ইন্সপেক্টর) থেকে শুরু হয়। সেখানে খুব ভালো করতে না পেরে আদালতে মোক্তারের চাকরিতে যোগদান করে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেষে রাজনীতি করার শখ জাগে এবং কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেয়। যেহেতু পুলিশ আদালত ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন অঙ্গনে কাজ করেছে, এজন্য অনেক বিষয়ে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। অবস্থা অনুধাবন এবং উপস্থিত সমাধান ও বক্তৃতায় ছিল অদ্বিতীয়। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনেও বেশ বিজ্ঞ ছিল। ইংরেজরা সব সময়ই এমন লোকের সন্ধানে থাকত। তাকে পেয়ে লুফে নিল এবঙ তার পর থেকেই সে মুনশি রাম থেকে সোয়ামি শ্রদ্ধানন্দ হয়ে গেল।

শ্রদ্ধানন্দের এক চেলা 'জুড়পুট' নামে একটা বই লিখল। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অন্যান্য অনেক নবী বিশেষত হযরত ইবরাহিম খলীলুল্লাহ, হযরত লুত, হযরত আইউব, হযরত ইসহাক আ. এর ব্যাপারে একেবারে উলঙ্গপনার সঙ্গে এই পরিমাণ গোস্তাখি করা হয়েছে, যা কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে গোস্তাখি কুফরের সর্বনিকৃষ্ট স্তর। সোয়ামি শ্রদ্ধানন্দের লাগানো এই আগুন আর মুসলমানদের হৃদয়ের আকুতি একসঙ্গে আল্লাহর আরশকে স্পর্শ করল। আল্লাহ মুমিনদের দিলের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য গোস্তাখে রাসূলের সাজার ব্যবস্থা করলেন। ডিসেম্বর ১৯২৪ ইং এর ঘটনা। জনাব রায় কামাল লিখেন, সোয়ামি শ্রদ্ধানন্দ দিল্লিতে তার নতুন বাজারের বাড়িতে (তার কেন্দ্রীয় দফতরে) অবস্থান করছিল। গায়রতমান্দ এক নওজোয়ান সাংবাদিক তাকে ধিক্কার দিয়ে লাগাতার পিস্তলের কয়েকটি ফায়ার করে তার গোস্তাখির প্রায়শ্চিত্য করে দিল। আক্রমণকারী আব্দুর রশিদ শহীদ নামে ইতিহাসের পাতায় শোভাবর্ধন করলেন। 'ইসমাত' 'মুনাদি' 'দ্বীন ও দুনিয়া' ইত্যাদি পত্রিকার হস্তলিপির কাজ করতেন। দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার দিলের সম্পর্ক। দিল্লির উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য ইসলাম ও কোরআনের মুহাব্বত ইশকে রাসূল দ্বারা তার অন্তরকে আরো পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।

আর্য হিন্দু ও শুদ্ধি আন্দোলনকারীদের নিত্য নতুন ফেতনা উঠত, আর আব্দুর রশিদ শুধু চিন্তা করতেন, কিভাবে এই ফেতনার উৎস নির্মূল করা যায়। অবশেষে তার মাথায় একটা ধারণা আসল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যারা কাঁদা ছোড়াছুড়ি করে, তাদের মূল হোতাকে কুপোকাত করতে হবে। স্থির করলেন, এটাই করণীয়। কয়েকদিনের মধ্যে দিল্লি থেকে আফগান চলে গেলেন। সেখানে থেকে একটি পিস্তল ও কয়েক রাউন্ড গুলি কিনে নিয়ে আসলেন।

এবার সুযোগের অপেক্ষা। আল্লাহর কুদরত দ্রুতই তাকে সুযোগ করে দিল। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৬ ইং শ্রদ্ধানন্দ তার কেন্দ্রীয় দফতরে শুয়ে আছে। আব্দুর রশিদ তার এই সুযোগে তার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৌঁছে গেলেন শ্রদ্ধানন্দের আশ্রমে। ঘটনাক্রমে এই গোস্তাখের কাছে তখন কোন খাদেম ছিল না। সে প্রথমে এক নজরে তার কামরার তদন্ত করে নিল। এরপরই লাগাতার পিস্তলের ট্রিগার চাপতে থাকলেন এবং একে একে ছয়টি বুলেটই গোস্তাখে রাসূলের বুক ঝাঁঝরা করে দিলেন। ফেতনাবাজের ফেতনাবাজি চিরতরে শেষ করে দিলেন এবং জাহান্নামে পৌঁছে দিলেন। গাজি আব্দুর রশিদ শুরুতেই আদালতে হত্যার দায় স্বীকার করলেন। জজ ফাঁসির রায় দিলেন।

আত্মীয়দের সাথে শেষ সাক্ষাৎ

কারাগারে সর্বশেষ সাক্ষাতের জন্য তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আটজন মহিলা ও বিশজন পুরুষের অনুমতি মিলল। সাক্ষাতকালে তিনি মুচকি হেসে বললেন, আপনারা কোন প্রকার চিন্তা করবেন না। এটা তো অনেক খুশির বিষয় যে, আমার মত গোনাহগার মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করছে। ধর্মের ব্যাপারে কারো পরোয়া করা ঠিক নয় এবং সর্বদা দ্বীনের উপর অটল থাকাই আসল ইবাদত। আব্দুর রশিদ এক পর্যায়ে বললেন, আমি গোস্তাখে রাসূল শ্রদ্ধানন্দকে এজন্য হত্যা করেছি যে, একদিন স্বপ্নযোগে আমাকে সাইয়েদুল শুহাদা হযরত হোসাইন রা. বললেন, তোমাদের শহরে আমার নানাকে অবমাননা করা হয়, আর তোমরা চুপ করে বসে আছ?

গাজি আব্দুর রশিদকে ১৪ ই নভেম্বর ১৯২৪ ইং সকাল আটটায় ফাঁসি দেয়া হয়েছে। যখন তাকে ফাঁসির ঘরে নেয়া হল, তখন তার ঠোঁটে মুচকি হাসি লেগে আছে। অনুমতি নিয়ে তিনি দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন। তারপর চেহারায় যখন কাপড় পরানো হচ্ছে তখন তিনি উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করলেন এবং বললেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন এবং ফাঁসির রশিতে বুঝলেন। তাঁর শরীরে ফাঁসির কোন আলামত ছিল না। গর্দানে ছিল আকর্ষণীয় সৌন্দর্য। শরীরও শক্ত হয় নি। তার দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে গিয়ে বলেছেন, আমার ধারণা যখন তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে চড়ে নারায়ে তাকবিরের ধ্বনি দিয়েছিলেন, তখনই শরীর থেকে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। (মাসিক না'ত, লাহোর, সংখ্যা ৪,৪/৪৩; মাসিক দরবেশ, লাহোর, মে ১৯৯৪ ইং পৃ. ৩৬)

নাথোরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে বই প্রকাশ ও তার উচিত শিক্ষা

সাইয়েদ আলে আহমদ রেজবী লিখেন- "সময়টা ছিল ১৯৩৩ ইং এর শুরুর দিকে। আর্য হিন্দু সমাজ হায়দারাবাদ সিন্ধের সেক্রেটারী নাথোরাম তারীখে ইসলাম নামে একটা বই প্রকাশ করল। যাতে সরদারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কঠিন বদ-যবানি করা হয়েছে। তা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কঠিন আন্দোলনে নেমেছে এবং বিভিন্ন সভা সমাবেশ করছে। মাওলানা আব্দুল হামিদ সিন্ধি ও অন্যান্য মুসলিম নেতারা হায়দারাবাদে নাথোরামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। প্রশাসন তার বই বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সামান্য কিছু জরিমানা করে এক বছরের কারাদন্ড দিয়েছে। তার উপর আবার সে জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছে। মুসলমানরা এতে অত্যন্ত কষ্ট পেল। তাদের অন্তরে তখন কী পরিমাণ জ্বালা ও উত্তেজনা বিরাজকরতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাথোরামের কটূক্তির কথা শুনে গাজি আব্দুল কাইউম এর ঈমানী গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল। এই কথা শোনার পর আব্দুল কাইউম জিজ্ঞাসা করলেন, সিন্ধে এত মুসলমান থাকা সত্ত্বেও ঐ গোস্তাখকে কেউ জিজ্ঞাসা করল না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে গোস্তাখি করার মত স্পর্ধা তুমি কোথায় পেলে? আমরা কি তাহলে এই পরিমাণ গায়রতশূন্য হয়ে গেলাম? এরপর বললেন, আমার কাছে একটি ছোট্ট চাকু আছে। তা ভেঙ্গে আমি ঐ বেয়াদবের জন্য একটি বড় চাকু তৈরি করব।

চাকু খরিদ করার পর তিনি তার বন্ধুকে বললেন, আমি এই ধারালো অস্ত্রটি একমাত্র নাথোরামের জন্যই সংগ্রহ করেছি। দোয়া করুন আল্লাহ যেন আদালতেই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত করান। আমি এই অভিশপ্ত ও তার দোসরদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার প্রিয় রাসূলের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিচার ইংরেজদের আদালতে নয়, বরং কোন গায়রতমান্দ মুসলমানের খঞ্জরেই সম্ভব। আদালত পাশে বসলেন। প্রস্তুতি নিয়ে চাকু বের করলেন এবং নাথোরামের পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। অপরিচিত এক ব্যক্তি এসে তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু শানে রেসালাতের হেফাজতকর্মী ছিলেন রাগে অগ্নিশর্মা। নিজেকে ছাড়িয়ে আবারো নাথোরামের পেটে চাকু চালালেন। অবস্থা খারাপ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবস্থা আশংকাজনক ছিল। তাকে সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু চিকিৎসা

পর্যন্ত পৌঁছার আগেই সে জাহান্নামে পৌঁছে গেল। আব্দুল কাইউম রহ. ঠিক দুপুরে, আদালতের ভিতর এই বেয়াদবের পাপের প্রায়শ্চিত্য করলেন। এরপর পুলিশের সামনে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, আমি খুব বুঝে শুনে ঠান্ডা মাথায় নাথোরামকে হত্যা করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে যারা গোস্তাখি করে, তাদের পরিণতি এমনই হওয়া চাই।

১৯৩৪ ইং মার্চ নাথোরামের আপিলের শুনানি শুরু হয়েছে। হিন্দু মুসলমানদের বিশাল জমায়েত জেরা শুনতে এসেছে। নাথোরাম তার সাথীদের সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে আদালত কক্ষে এসে এজলাসের কাছে একটি বেঞ্চে বসল। সামান্য সময় পরই মুসলিম নওজোয়ান আদালতের কামরায় প্রবেশ করল। তার পাশে বসে নাথোরামকে হত্যা করে। উসলভিন নামের এক ইংরেজ জজ এজলাস থেকে নামতে নামতে মুসলিম যুবকের দিকে রক্ত চক্ষু করে কর্তৃত্বের স্বরে বলল, তুমিই তাকে হত্যা করেছ না? যুবক খুব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উত্তর দিল হ্যা। এছাড়া আর কী করার ছিল আমার? আদালত কক্ষে রাখা তাদের ইংরেজ বাদশাহর ছবির দিকে ইশারা করে বললেন, যদি কেউ তোমাদের এই বাদশাহকে গালি দিত, তাহলে তোমরা কি করতে? তোমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে কি তোমরা তাকে হত্যা করতে না? তারপর নাথোরামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ শুকরের বাচ্চা আমার প্রাণের নবী বাদশাহদের বাদশাহ্ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে গোস্তাখি করেছে। সুতরাং এটাই তার শাস্তি। যে ব্যক্তিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়, তার শানে গোস্তাখি করে, আমার বিশ্বাস সে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করে। এই বিশ্বাস ও প্রেরণা থেকেই আমি আমার জীবনকে শাহেন শাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উৎসর্গ করেছি। আমি ঈমানী জযবা থেকেই নাথোরামকে মৃত্যুর ঘাটে নিপতিত করেছি। আমি বিশ্ববাসীর কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে আক্রমণকারী যিন্দা থাকতে পারবে না। আমি ঘোষণা করছি, আমি নাথোরামকে হত্যা করেছি এবং সে জাহান্নামের লাকড়ি হয়ে গেছে।

১৩ ই অক্টোরবর আব্দুল কাইউমের আশা অনুযায়ী করাচির আদালত তাকে মৃত্যুদন্ডের রায় শোনাল। তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে, বিচারকদের রায় শুকরিয়ার সঙ্গে বরণ করেছেন এবং আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিয়ে আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে এসেছেন। ১৪ ই অক্টোবর ১৯৩৪ ইং সকাল দশটায় আব্দুল কাইউমের সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাত হল। সাক্ষাতকালে তিনি কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন এবং তখন তাকে খুব হাসি খুশী মনে হয়েছে। তার

আম্মাজান বলেছিলেন, বেটা আমি তোমার উপর এই জন্য খুশি যে, তুমি শানে রেসালাতের হেফাজতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ।

সেই রাতে কারাগারে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকদিন পর্যন্ত সেই ঘটনার বিশ্লেষণ পত্রিকাগুলোতে শিরোনাম হতে থাকল। ঘটনার বিবরণ, ১৫ই অক্টোবর রাতে করাচি সেন্ট্রাল জেলের পাহারাদার দেখল, গাজি আব্দুল কাইউম রহ. এর কুঠরির দরজা খোলা। কুঠরির ভিতরটা নূরে আলোকিত। দুইজন সাদাপোশাক পরিহিত নূরানী চেহারার লোক আব্দুল কাইউম সাহেবের সামনে বসে তার সঙ্গে কথা বলছেন। পাহারাদার এই দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং দৌড়ে গিয়ে অলৌকিক কাহিনী গেয়ে বলল এবং তারাও এসে স্বচক্ষে দেখল। এরপর সতর্ক ঘন্টা বাজানো হল। জেলকর্তৃপক্ষ সবাই একত্র হয়ে তার কুঠরিতে দেখতে গেল, কিন্তু তখন দরজা বন্ধ। কুঠরি অন্ধকার। আব্দুল কাইউম একা। এরপর তার ফাঁসি হয়। (মাসিক দরবেশ, লাহোর, মে ১৯৯৪, পৃ. ৫০-৫১) (মাসিক না'ত, লাহোর সংখ্যা ৪,৪/৮)

রাসূলের কটূক্তিকারী পালামলের করুণ পরিণতি

স্বর্ণকার পালামল ছিল সম্পদশালী। তার পিছনে হিন্দু বণিক সম্প্রদায়ের হাত ছিল। প্রথমে সে বণিক গ্রুপের সমর্থনে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা নিয়ে উপহাস করত। সে অনেকবার গরীব মুসলমানদের ব্যাপারে এই কথা বলেছে যে, 'ঋণ ফেরত দেয় না আবার মুসলমান হয়ে ঘুরে'। একবার বলল, 'মুসলমানদের খোদা তার বান্দাদের কাজ থেকে যাকাত ভিক্ষা চায়। অথচ তাদের নিজেদেরই রুটি-রুজির ব্যবস্থা নেই।' মুসলমানদেরকে সাদাসিধে এবং চুপ থাকতে দেখে দিন দিন তার স্পর্ধা আরো বেড়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম করজ দিবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং- ২৪৪) যখন এই আয়াত নাযিল হয় একথা শুনে এক মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদি বলল, আল্লাহ ফকীর, আর আমরা হলাম ধনী। এতে হযরত আবু বকর রা. অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অভিযোগ পেশ করল। আবু বকর রা. কে ডাকা হলে এই আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, ইহুদী মিথ্যাবাদী।

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৮১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۝

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে, হোক না কেন সকল বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতিগোত্র।"

(সূরা মুজাদালা, আয়াত নং-২২)

এক পর্যায়ে আল্লাহওয়ালাদেরকে গালি দেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হল। হিন্দুদের একত্র করে নামায নিয়ে ব্যঙ্গ করা, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে তাদের নিয়ে হাসি তামাশা করা তার দৈনন্দিনের রুটিনে শামিল হয়ে গেল। দৈনিক ইনকিলাব একদম খোলামেলা বেয়াদবী আরম্ভ করল। ১৬ই মার্চ যখন মুসলমানরা নামায আদায় করছিল, তখন এই অভিশপ্ত শুধু নামায নিয়েই বিদ্রুপ করে নি; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জাত ও সত্তা সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে এভাবে প্রকাশ্যে গোস্তাখি করার ফলে পুরো শহরের মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান নেতৃবৃন্দরা আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মামলার সবকিছু সামনে রেখে রায় লিখলেন। আমি এই নতিজায় পৌঁছেছি যে, আসামি বাস্তবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননা করেছে, যার ফলে মুসলমানরা উত্তেজিত হয়েছে এবং কঠিন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এজন্য পালামলকে ছয় মাসের কারাদন্ড ও দুই শত রুপি জরিমানা করা হল। স্বর্ণকার পালামলের বিরুদ্ধে তাওহীদে রেসালাতের দায়ে মামলা চলতে থাকল। আসামি ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে লাহোরের সেশন জজ মিস্টার ভান্ডারির আদালতে আপিল দায়ের করল এবং এখান থেকে তাকে রায় হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য জামানতের ভিত্তিতে মুক্তি দিয়ে দেয়া হল।

গভীর রজনী। সারা দুনিয়া ঘুমিয়ে আছে আঁধারে কোলে মাথা রেখে। জগতের মানুষ ঘুমের আবেশে হারিয়ে গেছে নিদ্রাপুরীতে। এই প্রাকৃতিক আঁধারকে ভেদ করে হঠাৎ মুহাম্মদ সিদ্দীকের জীবনাকাশে ভাগ্যতারা ঝলঝল করে উঠল। সে আলোতেই তিনি পেয়ে গেলেন চির সুখের আভাস জান্নাতের ঠিকানা। অর্ধ রজনীতে স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন,

কুসুরের ভূখন্ডে এক বদ নসীব হিন্দু আমার শানে একের পর এক গোস্তাখি করে যাচ্ছে। তুমি গিয়ে বদবখতের নাপাক যবানে লাগাম টেনে দাও।
জানবাজ এই নবীপ্রেমিক ঘুম থেকে উঠেই প্রিয় রাসূলের জন্য নিজের প্রান পণ করলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি আক্রোশে টগবগ করতে থাকলেন। আর অন্তরে প্রতিশোধের এমন এক আগুন জ্বলে উঠল, যার লেলিহান শিখা উত্তরোত্তর শুধু বেড়েই চলল। তিনি অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন, কবে তিনি কুসুরের মাটিতে পৌঁছবেন এবং ঐ হিন্দুর বাচ্চাকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবেন।
১০ ই সেপ্টেম্বর মুহতারাম আম্মাজানের কাছে আরজ করলেন, আম্মাজান! আমাকে স্বপ্নযোগে দেখিয়ে বলা হয়েছে, এই কুলাঙ্গার তাওহিদে রেসালাতের অপবাদে নাপাক হয়েছে। তাকে গোস্তাখির মজা দেখিয়ে দাও, যাতে ভবিষ্যতে আর কোন অসভ্য এই অপরাধের দুঃসাহস না করে। আমি মামার কাছে যাচ্ছি। গোস্তাখ সেখানেই থাকে। আমাকে বলা হয়েছে এই অসভ্য কুকুরের অপমৃত্যু আমার হাতেই হবে এবং আমাকে ফাঁসির শাহাদাতের সুধা পান করানো হবে। আপনি দোয়া করুন, দরবারে রেসালাতে যেন আমার কোরবানী কবুল হয় এবং আমি যেন আমার এই ফরজ দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দিতে পারি। মাজননী আনন্দের সঙ্গে সন্তানকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। একজন মুমিন নারীর জন্য এর চেয়ে বড় খুশির বিষয় আর কী হতে পারে যে, তার সন্তান দ্বীনের কাজে ব্যবহৃত হবে?
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ইং সন্ধ্যার ঘটনা। মুহাম্মাদ সিদ্দীক বাবা বুল্লে শাহের দরবারের কাছে নিম গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনুসন্ধিৎসু চোখে দু'জন আগন্তুকের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। এর মধ্যেই এক ব্যক্তি আসল যে তার চেহারার অধিকাংশই নেকাব দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার গতিরোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? কোথায় থেকে এসেছ? এখানে কী কর? সে নাম বলতে দ্বিধা করল। ঘটনা হাতাহাসি পর্যন্ত গড়াল। মুহাম্মদ সিদ্দীককে একা দেখে তারও সাহস হল। বলতে লাগল, মুসলমানরা এই পর্যন্ত আমার কী-ই বা করতে পেরেছে, আর এই লোকটি বা কোন কেয়ামত ঘটিয়ে ফেলবে?
এ পর্যায়ে মুহাম্মদ সিদ্দীক চিনে ফেললেন, এটাই সেই গোস্তাখ যাকে জাহান্নামে পৌঁছানোর জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ সিদ্দীক বলেন, আমি তাজেদারে মদীনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম। কয়েকদিন থেকেই তোর সন্ধানে আছি। বদ-যবান নাপাক জানোয়ার! তুই আজ অপমানজনক মৃত্যুর হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাবি না। এই বলেই তিনি কোমর থেকে চামড়া ছিলার একটি যন্ত্র বের করলেন এবং ধিক্কার দিয়ে একের

পর এক তাকবীর চালালেন। সাড়ে সাতটার সময় এই গোস্তাখ যাকে মানুষ লালাহ পালামল শাহ বলত, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্যের শিকার হল। অভিশপ্ত গোস্তাখের চিৎকারে এবং আশেকে রাসূলের তাকবীর ধ্বনিতে ততক্ষণে অনেক মানুষ সেখানে জড় হয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য হল, গোস্তাখের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগে তিনি তার বুকের উপর থেকে নামেন নি। মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের পোশাক তাঁর নাপাক রক্তের ছিটায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আশপাশেও শুধু রক্ত আর রক্ত। গোস্তাখের চেহারা শুধু বিকৃত হয়েছে। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী, তার শরীরে চল্লিশটা জখমের নিদর্শন ছিল। উপস্থিত লোকদের বিবরণ হল, হত্যার পর তিনি পলায়ন করতে চাইলে খুব সহজেই পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে খুব শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে পাশের মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করে নিশ্চিন্তে মসজিদের সিঁড়িতে বসে পড়লেন। মাঝেমধ্যে মুচকি হেসে গুনগুনিয়ে কী যেন গেয়ে যাচ্ছেন। তখন হিন্দুদের চেহারাগুলো সব শুকিয়ে গেলেও মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবকে দেখাচ্ছিল খুব শান্ত তরতাজা ও হাসিখুশি চেহারার একজন নিশ্চিন্ত মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে তার এই আন্দায ও অবস্থান ছিল মুসলমানদের স্বকীয়তা, গায়রত ও শির উঁচু জাতি হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যখন গাজি সিদ্দীককে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন, তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে পালামলকে আমি হত্যা করেছি। কারণ এই অভিশপ্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননা করেছিল। সে জেনে বুঝে এই অপরাধ করেছে। রাজপালের ও আলিমুদ্দীনের কাহিনী তার খুব ভালো করে জানা ছিল। সব বুঝে শুনেই সে নিজেকে এই পরিনতির সম্মুখীন করেছে। যদি এই ঘটনার বিশ বছরও পার হয়ে যেত, তাহলেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। আমাদের ধর্মে, যে ব্যক্তি রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননার উপর খামুশ থাকে নিজের জান কোরবান করে না, সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না; বরং সে মুনাফিক। অন্য কারো বিষয় হলে তার বরদাশত করা যায়। কিন্তু সরদারে দোজাহান হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মান নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে, তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও উত্তেজনায় কোন প্রকারের ত্রুটি হতে পারে না। আমি যা করেছি খুব চিন্তাভাবনা করে দ্বীন ও ইমানী আত্মমর্যাদাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই করেছি। এ জন্য আমার সামান্যতম কোন আফসোস বা অনুতাপ নেই; বরং আমি এই কৃতিত্বের উপর গর্বিত ও আনন্দিত। আদালত আমাকে যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারে। তাতে আমার মোটেও কোন

দুশ্চিন্তা নেই। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে শাহান শাহে মদীনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন না কোন আশেকে রাসূল তার মুহাব্বতের আগুন জ্বালাতেই থাকবে। আমার তো একটি মাত্র প্রাণ। এর মূল্যই বা কী? আমার বিশ্বাস আমি যদি পুরো দুনিয়াও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদতলে উৎসর্গ করি, তবুও আমার প্রেম ও ভালবাসা এ কথাই বলবে যে, এখনো তাঁর গোলামীর হক আদায় হয়নি।

গাজি মুহাম্মদ সিদ্দীকের ফাঁসির রায়

রায় কামাল লিখেন- নিম্ন আদালতে মামলার রায়ের দিন হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক শহীদের আম্মা তরুণ ছেলের কপালে চুমু খেয়ে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, বেটা আমি অনেক খুশি। যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মান রক্ষার জন্য তুমি কোরবানির স্থলে যাচ্ছ, তার জন্য যদি তোমার মত আরো বিশটি ছেলে আমাকে উৎসর্গ করতে হয়, তবে রাব্বে কাবার কসম! তাতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করব না। দৈনিক ইনকিলাবসহ অন্যান্য মুসলিম সংবাদপত্রগুলোতে গাজি সাহেবের মায়ের এই দুঃসাহসিকতা ও ঈমানদীপ্ত বক্তব্য ও গাজী সিদ্দীক শহীদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তিনি তার মায়ের এই কথা শোনার পর তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং মায়ের কাছ থেকে জীবনের সকল অন্যায় অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এরপর বললেন, যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান রক্ষার জন্য পালামলকে হত্যা করে নিজেকে কোরবানীর জন্য পেশ করেছি। তার জন্য যদি আমাকে হাজার বারও মরতে হয় তাহলে আমি প্রতিবারই শানে রেসালাতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবো এবং এটাকে আমার ফরজ দায়িত্ব মনে করব।

নিম্ন আদালতে গাজি মুহাম্মদ সিদ্দিক শহিদকে ফাঁসির রায় দেয়া হল। আম্মাজানকে বললেন, ভালোবাসা শুধু কুরআন ও কুরআন ওয়ালার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সঙ্গে। আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গেই আপনার দিল লাগিয়ে রাখবেন। আমার কবরে যেন কখনো শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ না হয় এবং কাউকেও যেন তার অনুমতি দেয়া না হয়।

জেল কর্তৃপক্ষের বর্ণনা হল, ফাঁসির কাষ্ঠে চড়ার পর তার মুখে যে শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল তা হল, হে আমার আল্লাহ! তোমার হাজার শোকর। তুমি তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানের হেফাযতের জন্য কোটি কোটি মুসলমান থেকে আমার মত অধমকে নির্বাচন করেছ।

হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক শহীদ রহ. যখন শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মাহবুবের সান্নিধ্যে গমন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারী রাম গোপালের নির্মম পরিণতি

মুহাম্মদ কা'ব শরীফ লিখেন- "শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল। খবরে বলা হয়েছে, পল্লোল জেলাধীন গোভ গাঁয়ের পশু হাসপাতালের এক ইনচার্জ ডাক্তার; রাম গোপাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে তার গাধার নাম রেখেছে। (নাউযুবিল্লাহ) সংবাদ ছাপামাত্র মুসলমানরা ক্ষোভে উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। ইংরেজরা মুসলমানদের এই চাপে প্রভাবশালী অপরাধীর বিচার করার পরিবর্তে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নার নাবিন্দ জেলাকে গেরাও করে কেল্লায় রুপান্তরিত করল। রাম গোপালের গোস্তাখি বরদাশত করার মত সাধারণ কোন গোস্তাখি ছিল না। যে সংবাদে প্রতিটি মুসলমানের রক্ত টগবগ করে উঠেছে, সেখানে মুরিদ হোসাইনের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। তার ক্রোধ অগ্নিশর্মা হয়ে উথলে উঠল। তার আত্মমর্যাদাবোধ আরো কয়েক গুণ শক্তিশালী হয়ে জেগে উঠল। আগে থেকেই তিনি স্বপ্নযোগে গায়েবী ইশারা পেয়ে আছেন। সংকল্প করলেন, জীবন সম্পদের কুরবানী দিয়ে হলেও এই নির্লজ্জ আস্ফালনকারী পাপীকে এমন শিক্ষা দিবেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ কোন দিন এমন আস্পর্ধা দেখানোর আগে তার এই পরিণতির কথা একবার অন্তত স্মরণ করে।

রায় কামাল লিখেন- "মুরিদ হোসাইন শহীদ (রহ.) ১৯৩৬ ইং জুনের শেষ সপ্তাহে এই মহৎ মিশন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। প্রথমে লাহোরের কোয়েটায় ইসলামী কলেজে তার এক বন্ধুর কাছে অবস্থান নিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এরপরে অভিশপ্ত রাসূল কটূক্তিকারীকে হত্যা করার জন্য তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং গোপনে গোপনে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সফরের এক পর্যায়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি আজাদি আন্দোলনের মুজাহিদ; হাজী তারাংজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। অবশেষে মুরশিদে কামিলের অনুমতিক্রমে অবস্থা পর্যাবেক্ষণ ও নিখূঁত পরিকল্পনার জন্য লাহোরের পথে দিল্লি পৌঁছলেন।

মুনির নওয়াবি লিখেন- মুরিদ হোসাইন আর তার পীরে কামেলের সঙ্গে কী গোপনালাপ হয়, তা পীর মুরিদ ও তাকদিরের খালেক ব্যতীত আর কেউ জানত না। অবশ্য সাহেজজাদা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব আমাকে বলেছেন, মুরিদ হোসাইন হযরত খাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে যখন বের হলেন, তখন তিনি চোখের পানি মুছেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুই

বললেন না। এরপর এখান থেকে বের হয়ে গেলেন। মিল্লাতে ইসলামিয়ার এই সিংহ শিকার ধরার প্রস্তুতি নিয়ে ৭ই আগস্ট ১৯৩৬ ইং দিল্লি থেকে গন্তব্যের ত্রিশ মাইল দূরে কেল্লা এবং সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নারনাবিন্দ। মুরিদ হোসাইন সাহেব দিল্লি থেকে রেলে সওয়ার হয়ে হাঁসি স্টেশন নামলেন। সেখান থেকে তাকে আর মাত্র তিন চার মাইল সামনে যেতে হবে। নদীর তীর ধরে পায়ে হাঁটতে লাগলেন। সূর্য ডুবে গেল। ঘাসের ঝোপে রাত কাটালেন।

৮ই আগস্ট ১৯৩৬ ইং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এমন পথে হাসপাতালের কাছে পৌঁছে গেলেন, যেন কেউ সন্দেহ করার সুযোগ না পায়। পকেট থেকে ছোট্ট নোট বুক বের করে একটা সংরক্ষিত জায়গায় লেখেন এবং যাতায়াতকারীদের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখতে লাগলেন। অবশেষে হাট্টাগাট্টা একলোকের উপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। এটাই ছিল কালের কংলক সেই ডাক্তার, যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কটূক্তি করেছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই দুশমনে রাসূলকে শনাক্ত করতে কোন অসুবিধা হল না।

ডাক্তার রাম গোপাল হাট্টাগাট্টা বিশাল দেহের অধিকারী ছিল। পক্ষান্তরে মুরিদ হোসাইন ছিলেন হালকা পাতলা গড়নের। কিন্তু ইশকে রাসূল ও জযবায়ে ঈমানে টইটম্বুর দুঃসাহসিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। সাহসের মহড়া দিয়ে রাম গোপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে বাঁচার চেষ্টা করল। হাসপাতালের এক আমলা তার বউবাচ্চাসহ তাকে বাঁচানোর চেষ্টায় দ্রুত এগিয়ে আসল। মুরিদ হোসাইন সাহেব জান হাতে রেখে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি বুলন্দ করলেন এবং হিংস্র পশু কাহিকা দেখ আজ মুহাম্মাদের আশেক এসে গেছে বলে ছোট্ট খঞ্জরের এক আঘাতেই মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে তিনি মুসলমানদের কাছে মুরিদ হোসাইন হয়ে গেলেন। কুত্তাটা মরে গেল।

রাম গোপালকে হত্যা করার পর গ্রেফতারের জন্য মুরিদ হোসাইন নিজেই আত্মসমর্পণ করলেন। তাকে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল মুসলমানরা। কিন্তু সফল হওয়া যায়নি। সর্বশেষ তার জান বাঁচানোর জন্যে কিছু দিন লাহোরের মেন্টাল হাসপাতালেও রাখা হল। কিন্তু কিছুতেই তিনি পাগল সাজতে রাজি হলেন না। কারা জীবনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদারে ধন্য হয়েছেন মুরিদ হোসাইন রহ.। তখন তিনি নিয়মিত নামায আদায় করতেন, তেলাওয়াত করতেন এবং ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করে সময় কাটাতেন। শাহাদাতের দিন ধার্য হওয়ার জন্য তিনি সীমাহীন বে-কারার ছিলেন।

মুনির নওয়াবী লিখেন- শাহাদাতের দিন ধার্য হওয়ার পর তাকে তার পৈতৃক জেলা জহলম কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ঢাঙ্গার বাসিন্দা (মন্ডি বাহাউদ্দীন নাযের) এক শিখ আসামিও ফাঁসির অপেক্ষা ছিল। সে গাজি মুরিদ হোসাইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তিনি তার নাম রেখেছেন গোলাম রাসূল। কারা জীবনে গাজি মুরিদ হুসাইনের কয়েকটি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তার পাশের কুঠরিতে এক শিখ যাতক বন্দী ছিল সে রাতের অধিকাংশ সময়ই দেখত, গাজি মুরিদের কুঠরিতে অসংখ্য বাতি জ্বলছে এবং অনেক মানুষ দুরুদ ও সালাম পাঠ করছে। শিখ তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনার কাছে প্রতিদিন কেন আসে? তিনি বললেন, আমার মনিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আসেন এবং তার মজলিসে দুরুদ ও সালামের অজিফা পড়া হয়। তার এই কথা বলা মাত্র শিখ নিজ থেকেই বে-ইখতিয়ার বলে উঠল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। এরপর সে অসিয়ত করে গেল আমি গাজি মুরিদ হোসাইনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমাকে শিখদের গোরস্তানে দাফন না করে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করবে। সে অসিয়ত করল, আমার লাশ যেন জহলমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জনাব আব্দুল লতিফের হাওয়ালা করা হয়। তিনি আমাকে ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী জানাযা পড়ে জহলমের গোরস্তানে দাফন করবেন। পরে তার অসিয়ত মতই সব করা হল।

গাজি মুরিদ হোসাইনের শায়েখ ও পীর মামলা চলাকালে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে বললেন, গাজী! আমি তো আসলে কিছুই ছিলাম না। কিন্তু তুমি এমন মাকামে পৌঁছে গেছ যে, আমি তোমার জুতা বহন করাকেও আমার জন্য গর্বের বিষয় মনে করি। এরপর তিনি গাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিছু দেখেছ কি? গাজি সাহেব উত্তর দিলেন, যখন ঐ অসভ্যকে জাহান্নামে পাঠালাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং বললেন, গাজি! ফিরে যাচ্ছ না আমার কাছেই থাকছ? আমি আরজ করলাম, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদতলে থেকেই দো জাহানের কামিয়াবী অর্জন করতে চাচ্ছি।

রায় কামাল লিখেন- শহিদে ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজি মুরিদ হোসাইনের আশাআকাঙ্খার বাগানে এখন পূর্ণ বসন্ত যৌবন। মাহবুবের সান্নিধ্যে যাওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ই রজব ১১৫৬ হিজরী মুতাবিক ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ইং জুমাবার। ফাঁসির রশিতে ঝুলানোর সব প্রস্তুতি

সম্পন্ন। সারারাত কারাগারে কোরআনে কারীমের তিলাওয়াত, দরুদ ও কালিমায়ে তাইয়্যেবার যিকিরে অতিবাহিত করেছেন। মুসলিম কয়েদিরাও তার মুহাব্বত উৎকণ্ঠায় রাতটি জেগে থেকে পার করলেন। গাজি রাতের কিছু অংশ শোকরানা নামাজ আদায় করে কাটালেন। রায় কামাল লিখেন- জেল সুপার কয়েকজন পাহারাদাসহ তার কুঠুরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ফাঁসির সময় ঘনিয়ে এসেছে। প্রেমকাহিনীর পূর্ণতা দানের জন্য আমাদের সঙ্গে গন্তব্যের পথে চলুন। তার ঠোঁটে মুচকি হাসির অপূর্ব ঝলক। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! চলুন আমি উপস্থিত। জানবাজ আশেক বাইরে বের হয়েই নারায়ে তাকবীর ধ্বনি তুললেন সমস্ত কয়েদি সুউচ্চ কণ্ঠে তার জবাব দিলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। গাজি সাহেব প্রে সাগরে ভাসতে ভাসতে বীরবেশে শির উঁচু করে বুক টান করে দ্রুত পদে নাত পড়তে পড়তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ কা'ব শরীফ লেখেন- তাকে ১৮ই রজব মোতাবেক ২৪ শে সেপ্টেম্বর জুমার দিন শাহাদাতের সিংহাসনে হাজির করা হয়েছে। শাহাদাতের সময় তিনি দরুদ পড়ছিলেন। তাকে বলা হল, যবান বন্ধ করুন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার কাজ আমি করছি। তোমাদের কাজ তোমরা কর। কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে চড়লেন এবং হেফাজতে শানে রেসালাতের জন্য নিজের জীবন কোরবান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। মুনির নওয়াবি রহ. লিখেন, শাহাদাতের পর ফাঁসির কার্যক্রম সম্পাদনকারীরা তার নিকটজনদের বলেছেন, ফাঁসির সময় গাজি সাহেবকে খুব শান্ত ও আনন্দিত দেখা গেছে। দরুদ শরীফ ও কালিমায়ে শাহাদাতের ওজিফা পড়ছিলেন। তখন তাকে বলা হল, যবান বন্ধ রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাজ আমি করছি, তোমরা তোমাদের কাজ কর। এরপর তিনি দরুদ সালাম পড়তে পড়তে দেখতে দেখতেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

রাসূলের কটূক্তিকারীদের রক্ষা নেই

মঞ্জুর হুসাইন শহীদ রহ. প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে তার পিতা মুহতারাম মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মদ করমুদ্দীন মরহুমের অনেক সুখ্যাতি ছিল। তিনি চকওয়ালা জেলার ভীন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। অধিকাংশ মানুষের কাছে তিনি একজন বিচক্ষণ এবং উপস্থিত জবাবের অধিকারী মুনাজির (তার্কিক) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার রুহানী সম্পর্ক ছিল ছাইয়ালের সঙ্গে। তিনি শামছুল আরেফীন হযরত খাজা শামছুদ্দীন অথবা তার কোন খলিফার সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা আছে। তা নিম্নরূপ :

১৯৪১ ইংরেজীর কথা। এক কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক হিন্দু চৌধুরী খিয়াম চন্দ এস.ডি.ও ডোহামন থানার ডাক বাংলায় থাকত। এই অসভ্য ছিল আর্য হিন্দু রাজপালের (যাকে গাজি আলিমুদ্দীন জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন তার) আত্মীয়। আমাকে সর্বপ্রথম সাদিক আবছায করীম সাহেব বলেছেন যে, উক্ত এস.ডি.ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গোস্তাখি করেছিল। মঞ্জুর হুসাইনের আপন ভাই মাওলানা কাজী মাজহার হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা সমর্থন করলেন। কিন্তু কি গোস্তাখি করেছিলো এবং কখন থেকে সে এসব করছে, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে তার অবস্থা থেকে এতটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, এই নিম্ন স্বভাবের বদযবান হিন্দু, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে গোস্তাখি করেই থাকতে পারে। তাকে অবমাননার স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য কাজী সাহেব তার একান্ত বন্ধু মাস্টার আব্দুল আজীজ চকওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে তার বাড়িতে পৌঁছলেন। তার কপালে পিস্তলের ফায়ার করলেন, এরপর মাস্টার সাহেব বর্ষা দিয়ে সাতটি আঘাত করলেন। ততক্ষণ গোস্তাখি তার প্রায়শ্চিত্য করে ফেলেছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী শোয়া ছিল। মুজাহিদরা তাকে কিছুই বলেননি। কারন তার কোন অপরাধ ছিল না। তবে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আমরা তাওহিদে রেসালাতের প্রতিশোধ নিয়েছি। যত কিছুই হোক মুসলমানরা এত দুর্বল ও আত্মমর্যাদা বোধশূন্য হয়ে যায়নি যে, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনদের শায়েস্তা করার জন্য গাজি মুরিদ হুসাইন শহীদের উত্তরসূরীরা এখনো পৃথিবীর জমীনে বেঁচে আছে। ে

মৌলভী মঞ্জুর হুসাইন ১৯০৪ ইংরেজী জন্মগ্রহণ করেন। বি.এ. পর্যন্ত তিনি নিয়মতান্ত্রিক জেনারেল শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলেজ জীবনে তার শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির খুব আগ্রহ ছিল। এজন্য এ বিষয়ে তিনি বিশেষত্ব অর্জন করেন। মাওলানা মাযহার হুসাইন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মোটর যানের সামনে দাঁড়িয়ে যদি শক্ত করে ধরে রাখতেন, তাহলে ঐ গাড়ি যত স্পিডেই চালানো হত না কেন, একটুও নড়তে পারত না। আধা মোটা দুটি লৌহদন্ড একসঙ্গে করে হাতের বাহুতে বাঁকা করে ফেলতেন এবং এক ইঞ্চি মোটা লৌহদন্ড ঘাড়ে চেপে বাঁকা করে ফেলতেন। খালি বুকে অন্যের হাতে হামার দিয়ে পেটাতেন। ডিম হাতে নিয়ে দুই আঙ্গুলের শক্তির কারিশমা তিনি দেখাতেন। রাওয়াল পিন্ডি গার্ডেন কলেজ থেকে বের হওয়ার পরও তিনি এই পাহলোয়নি ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত এবং ইসলামী আধ্যয়ন তাঁর মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। ইংরেজদের কৃষ্টিকালচারের প্রতি তার মনে চরম ঘৃণা জন্মায়। পশ্চিমাদের কোন প্রকার ক্ষমতার প্রভাব তিনি

বরদাশত করতে পারতেন না। বিজাতির গোলামিতে থাকা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পরল।

প্রথমে তিনি নিজের সংশোধন করলেন এবং নিজেকে শরীয়তের ধাঁচে সাজালেন। কলেজে যেহেতু আরবি পড়েছিলেন এজন্য কুরআন হাদীস বোঝা তার জন্য সহজ ছিল। মরহুম পিতার কাছে হাদীস ও ফিকহের কিছু কিতাব পড়ে নিয়েছেন। তাবলীগের কাজও শুরু করেছেন। সশস্ত্র জিহাদের প্রেরণা তার মধ্যে প্রধান ছিল এবং আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার আগ্রহই তার সার্বক্ষণিক বাসনা ছিল।

১৯৩৮ ইং মুজাহিদে ইসলাম মৌলভী মঞ্জুর হোসাইন রহ. অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'খুদ্দামে ইসলাম' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। 'খুদ্দামে ইসলাম ময়দানে আমল মেঁ' শিরোনামে তাদের কার্যক্রমের একটি লিফলেট প্রকাশ করলেন। এই সংগঠনটি ছিল মূলত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তার অধীনে নিয়মিত প্যারেড হত এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হত যে, সংগঠনের সদস্যরা যেন কিছুতেই সংগঠনের সাংগঠনিক রহস্যগুলো কোথাও ফাঁস না করেন। এজন্য নিয়মিত শপথ নেয়া হত। ঘটনা ছিল, হিন্দু গোস্তাখে রাসূল চৌধুরী খিয়াম চান্দকে জাহান্নামে পৌঁছানোর পর, দুই বন্ধুসহ নিরাপদে সেখান থেকে সরে এসে আবাদ এলাকা (পাকিস্তানে) চলে গেলেন। এদিকে তার পিতাসহ কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে তার সন্ধানের জন্য গ্রেফতার করা হল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননাকারী চলচল সিং এর শেষ পরিণতি

চলচল সিং এবং তার স্ত্রী দিলজিত কূর যখন শিখদের উস্কানিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গোস্তাখি করল তখন তাদের এই কর্মকান্ড আশপাশের মুসলমানদের মাঝে অনেক ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে শিখরা মুসলমানদের জনসভায় এই অন্যায়কর্মের ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু তাতেও মুসলমানদের ক্ষোভ ও উত্তেজনা কমল না। কারণ যেই অসভ্য এই অন্যায় কর্ম করেছে, তারা সামনে আসেনি এবং ক্ষমাপ্রার্থনাও করেনি। এমন কি তাদের মধ্যে অনুতাপ অনুশোচনারও কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। এরপর আরেকটি সমাবেশের ব্যবস্থা করা হল। তাতে এই অসভ্য দম্পতিও ক্ষমা প্রার্থনা করল। তবে শিখ ধর্ম সে বর্জন করল না; বরং আগের অবস্থায়ই বহাল থাকল। চলচল সিং এই দুর্ভাগা প্রথমে মুসলমান ছিল। শুনেছি ভালো শিক্ষকও ছিল সে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক শিখ নারীর প্রেমে এমনভাবে

পাগল হল যে, তাতে তার জীবনের সব ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ নারীকে বিয়ে করার জন্য মুরতাদ হয়ে শিখ ধর্ম গ্রহণ করে সে তার গ্রামে বসতি গড়ল। যা শেখপুরা জেলায় অবস্থিত। চলচল সিং সত্য পরিত্যাগ করা মাত্র তার ভিতরের সব কুটিলতা এক সঙ্গে উগড়ে দিল। শিখদের উস্কানিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন কটূক্তি ও গোস্তাখি করতে লাগল। গ্রামের অধিকাংশ বসতি ছিল শিখ সম্প্রদায়। তারা ছিল অনেক ধনসম্পদ ও প্রভাবপ্রতিপত্তির অধিকারী। প্রশাসনের উপরও তাদের বেশ প্রভাব ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল নিতান্তই গরীব, দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন। শিখদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো যাদের কোন শক্তিই ছিল না।

প্রফেসর আফজাল হোসাইন আলাবী লিখেন- চলচল সিংয়ের গ্রাম থেকে শত শত মাইল দূরের বাসিন্দা সুফী আব্দুল্লাহ আনসারী এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং তাকে বললেন, আব্দুল্লাহ! এই মুরতাদ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তার যবানটা বন্ধ করে দাও। এতটুকু বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। আব্দুল্লাহর চোখ খুলল। তার কানে এখনো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং সে তার ভিতরে এক অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঈমানী শক্তি ও উত্তেজনা অনুভব করছে।

এম. এ. হাকিম অ্যাডভোকেট লিখেন- "তখন তিনি চক চব্বিশ শরীফে তার পীরের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম এবং সত্যিকারের আশেকে রাসূল। মুসলিমদের সম্বোধন করে বললেন, মুরতাদরা যেই মহাপাপ করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করার অধিকার রাখে না। মহানবীর সঙ্গে সে যেই বেয়াদবী করেছে, তার সাজা তাকে এই দুনিয়াতে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমি তাকে এই সাজা দিব ইনশাআল্লাহ। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নগণ্য একজন গোলাম হিসেবে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ছাড়ব।"

আলাবী লিখেন- তিনি কাউকে না বলেই গোস্তখ মুরতাদের গ্রামের দিকে ছুটে চললেন। চিন্তা করার বিষয়, একা এক মুসলিম যুবক শিখদের গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। এমন এক সন্ত্রাসীকে আক্রমণ করার জন্য, যে তার রক্তপাত ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডসহ নানা অপকর্মে পুরো জেলায় প্রসিদ্ধ। যার সামনে মুসলমানরা এতো অসহায় যে, তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের চোখের সামনে গালিগালাজ করার পরও তারা তাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইশকে রাসূরেল সুরা পানে মত্ত হয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম তামিলের জন্য ছুটে চলেছেন। শিখদের শক্তি সামর্থ্য, তার নিজের দৈন্য ও অসহায়ত্ব; কোন কিছুরই পরোয়া নেই তার। তার তো একটাই নেশা; কিভাবে তিনি প্রিয় প্রেমাস্পদ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম তামিল করবেন এবং পরকালের চিরস্থায়ী কামিয়াবী অর্জন করবেন। এই ধ্যানমগ্নতায় সূফী আব্দুল্লাহ ঐ শিখদের গ্রামে গিয়ে উঠলেন। সময় ছিল সকাল বেলা। চলচল সিং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, সে গ্রামের বাইরে এক কূয়ার পাড়ে বসা। অনেক শিখ তার পাশে যমিনে হাল চাষ করছে। কিছু শিখ ঐ কমবখতের সঙ্গে কূয়ার পাড়ে বসে গল্প করছে। আব্দুল্লাহ তাদের একদম কাছে গিয়ে বললেন, চলচল সিংএর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করব। অর্ধবয়সী এক শিখ ইশারা করে দেখিয়ে দিল, এই যে চলচল সিং সামনে বসা। আব্দুল্লাহ তখন বিজলীর মত এগিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলেন। আকস্মিক ধরাশয়ী হয়ে নিজেকে সামলে নেয়ার আগেই সূফী আব্দুল্লাহ তাকে চিৎপটাং করে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। চলচল সিং হাট্টাগাট্টা মোটা তাজা দেহের অধিকারী ছিল। এদিকে ইশকে নবীর শক্তি ছিল প্রেমমত্ততায় মাতাল। সুতরাং দেখতে দেখতেই তার গলা কেটে গেল। রক্তের ফোয়ারা বয়ে চলল।

আব্দুল্লাহ ছুরি মাটিতে রেখে দরবারে ইলাহীতে সিজদাবনত হয়ে মাওলায়ে কারীমের শুকরিয়া আদায় করলেন, যিনি তাকে প্রিয় হাবীবের হুকুম তামিলের তাওফীক ও শক্তি দান করলেন। সেজদা থেকে উঠে পলায়ন করার চেষ্টা করেননি, বরং খুব শান্ত শিষ্টভাবে সেখানেই বসে পড়লেন। এরপর এই দুঃসাহসী মুজাহিদ গাজি খুব শান্ত শিষ্ট ও স্বাভাবিকভাবে নিকটতম খালের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে গোসল করে কাপড় পরিষ্কার করে আল্লাহর দরবারে শোকরানা নফল নামাজ আদায় করলেন, যিনি এই মহৎ কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করে কামিয়াবি দান করেছেন।

আলাবী লিখেন- এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল তখন। গলাকাটা খবিস কাতরে কাতরে ঠান্ডা নিথর হয়ে পড়ে আছে। হত্যাকারী কয়েক কদম দূরেই নিশ্চিন্ত ও শান্তভাবে বসে আছে। কিন্তু কোন শিখের তার কাছে যাওয়ারও সাহস হল না। সবগুলো সেখান থেকে পালিয়ে পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ আসল। তখনও আব্দুল্লাহ খুব শান্তভাবে, গোস্তাখে রাসূলের লাশের পাশে বসে আছেন। যেন তিনি পুলিশের অপেক্ষা করছেন। পুলিশ সিপাহী এই দৃশ্য দেখে নির্বাক। শিখদের প্রতি তার প্রশ্নদৃষ্টি, সে একা মানুষ, আর তোমরা একদল! আশ্চর্যের কথা! তারপরও তোমরা চলচল সিংকে বাঁচাতে পারলে না? তার কাছে যেতেও

তোমরা সাহস করলে না? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর আরো বিস্ময়কর। সে একা কোথায়? তার সঙ্গে তো মুসলমানদের এক বিশাল কাফেলা!যার কারণে হত্যার আগেও আমরা তার সামনে যেতে সাহস করিনি এবং হত্যার পরও করিনি।

পুলিশ যখন গাজি আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে কি অস্ত্র সজ্জিত অন্য কো মুসলমান ছিল? তিনি নেতিবাচক জবাব দিলেন। এরপর তার ঠোঁটে একটি অর্থবহ মুচকি হাসি খেলে গেল।

বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন তিনি অত্যন্তই আনন্দিত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। যেন বিয়ের মজলিসে এসেছেন। তাকে চালান করে দেয়া। শেখুপুরা আদালতে মামলা চলতে থাকল। তার পক্ষে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মালিক মুহাম্মদ আনওয়ার অ্যাডভোকেট (যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত ছিলেন) এগিয়ে আসলেন। প্রায় এক বছর পর্যন্ত মামলার শুনানি হতে থাকল এবং শেষে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল। হবে না কেন? দরবারে রেসালাতে উপস্থিতি তো তার তাকদীরের লিখন ছিল। ফলে শাহাদাতের সুসংবাদ শুনে তার চেহারা খুশির আলোকরশ্মিতে জ্বলে উঠল। আমার জানা মতে তাকে লাহোরে নয়, বরং শেখুপুরায় শাহাদাতের সুধা পান করানো হয়েছে। খানকা ডোগরা এলাকার লোকেরা অনড় ছিল যে, তাকে চকচব্বিশের ছোট্ট গোরস্তানে এক বড় আল্লাহ ওয়ালার পাশে দাফন করবে। কিন্তু শহীদে শানে রেসালাতের ওয়ারিসরা তাতে সম্মত হননি। তারা তাকে নিজের গ্রামে নিয়ে গেলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসূলকে কটাক্ষ করে চলচ্চিত্র প্রকাশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র নিয়ে ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে উত্তাল সারা বিশ্ব। ‘ইনোসেন্স অব মুসলিম’ (পবিত্র মুসলমান) নামের ওই চলচ্চিত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বিজয়ী আদর্শ নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে। খুব কি অবাক হওয়ার মতো কিছু? মোটেই না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সারা জীবন সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। বিজয়ী আদর্শরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এ সত্য। তাই বলে, অন্ধকার যে একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে তা নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটাই আল্লাহর নীতি। তিনি আলো ও আঁধার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের খেলতে নামিয়ে বলেছেন, শুরু কর- আমি আলোর পক্ষেই আছি। সেই খেলা চলছে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত চলতেই থাকবে। আঁধারের পূজারীরা মক্কা থেকে আলোর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তাতে এখনো কোন দাড়ি পরেনি। পড়বেও না। তারা

তাদের চক্রান্তমূলক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা অব্যাহত রাখবেই। রাসূলের আদর্শকে 'বধ' করার ব্যর্থ চেষ্টা তারা চালাবেই। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে এই যুদ্ধে কোন ক্লান্তি আসবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের উপর নিজেদের বিজয়ী না করা পর্যন্ত তারা থামবে না। এর জন্যে কোন কিছুতেই তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি, করছে না। কখনো করবেও না। এটাই তাদের চরিত্র। আঁধারের অস্ত্র একটাই-মিথ্যা। সবসময়ই এই মিথ্যা দিয়ে আলোকে সে দমাতে চেয়েছে। দমানোর কসরত করে যাচ্ছে, করবে।

'ইনোসেন্স অব মুসলিম' তারই একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। এটা শুধু দাবিই নয়। আলোর মতই ধ্রুব সত্য। ইতিমধ্যে প্রায় সবার জানা হয়ে গেছে, চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পেছনে কারা ছিল, কারা অর্থ ব্যয় করেছে এবং কাদের মাধ্যমে ও কোন উদ্দেশ্যে এটি প্রচার করা হয়েছে। এসব এতইআলোচনা হচ্ছে যে, এখানে তা উল্লেখ করার দরকার মনে করছি না।

চলচ্চিত্রটি প্রকাশের পর লিবিয়ার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকান রাষ্ট্র, দূতসহ ৪জন নিহত হয়েছে। আর চলচ্চিত্রটির প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাকিস্তানসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে অন্তত ৩০জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন। সবকিছু ছেড়ে এই চলচ্চিত্রটি নিয়ে মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে আসেন। মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোয় জ্বালাও-পোড়াও হচ্ছে। আমরা দায়ি করছি না, তারা যা করছেন নিজেদের আবেগ আর ভালোবাসা থেকেই করছেন। প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব চেয়ে বেশি সম্মান ও ভালোবাসার অধিকারী। মুসলমানদের আবেগের কেন্দ্রও তিনিই। সাধারণ একজন মানুষ তার নিকটজনদের কারো চরিত্রকে নিয়ে কোন অবমাননা হতে দেখলে যে প্রতিক্রিয়া জানাত; রাসূলের চরিত্রকে বাজেভাবে উপস্থাপন করায় তাই করছেন বিশ্বের মুসলমানরা। আবেগের চোখে গ্রাহ্য নয়, তেমনি বিচার পাওয়ার কোন পন্থাও নয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কারণ এভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর ফলে, অপরাধীরই বেশি সুবিধা হয়। মানুষ প্রথম অপরাধের কথা ভুলে পরের প্রতিক্রিয়াকেই বড় করে দেখতে শুরু করে। এই কাজটি 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' এর প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছে। চলচ্চিত্রে যা করা হয়েছে তা কোন ভাবেই কারও প্রশ্রয় পাওয়ার যোগ্য নয়। যেকোন আইনেই এর কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু চলচ্চিত্রটি যেহেতু 'মুসলমানদের নবী'কে নিয়ে করা হয়েছে তাই কোন আদালতে এর বিচার হলো না।

বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সংগ্রামের ফসল হিসাবে ইতোমধ্যে সিনেমার পরিচালক 'নকুলা স্যাম বাসিল' মার্কিন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। যদিও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার দেশের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে ইতোপূর্বে

বাসিলকে গ্রেফতারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সিনেমা বন্ধ এবং পরিচালকের গ্রেফতারে আপাতত মুসলিম বিশ্বে স্বস্তি আসলেও এটি যে ক্ষণস্থায়ী সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ইহুদী-খ্রিস্টানচক্র বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদেরকে তাদের অস্তিত্বের জন্য প্রধান হুমকী বলে মনে করে। এ কারণেই একটি ইস্যু শেষ হলে আর একটি ইস্যু সামনে দাঁড় করানোর মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার কাজটি হাসিল করা এ চক্রের অন্যতম কুটকৌশল। যার প্রমাণ পাওয়া গেছে স্যাম বাসিলের ঘটনার রেশ না কাটতেই ফ্রান্সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র নির্মাণ। শুধু তাই নয়, বাইরের দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশের কিছু কলেজ শিক্ষকের নাস্তিক-মুরতাদ সাজার খায়েশও দেখা গেল ফ্রান্সের ঘটনার পরপরই। সচেতন মহলে আজ প্রশ্ন এভাবে একের পর এক ইসলাম-আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তারা বিভিন্ন অজুহাতে ব্যঙ্গ করেই যাবে আর মুসলমানরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে যেতেই থাকবে। এটাই কি সমাধানের একমাত্র পথ? এই ইঁদুর-বিড়াল খেলাতো কোন স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। বিষয়টি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দূরদর্শী চিন্তা প্রয়োজন। ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধনীতি প্রণয়ন করে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব এই ইঁদুর-বিড়াল খেলা বন্ধ করা। আমরা যারা তাগুতবিরোধী আন্দোলনে জড়িত আমাদের জন্য সদ্য বিতর্কিত এই সিনেমাটির বিশ্লেষণসহ ইহুদী-নাসারাদের পূর্বাপর বিভিন্ন কুটকৌশল সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সিনেমার আদ্যোপান্ত

'ইনোসেন্স অব মুসলিম' এর অর্থ অনেক পত্রিকায় 'মুসলমানরা অজ্ঞ' বা 'মুসলমানদের অজ্ঞতা' বলা হলেও শাব্দিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় আসলে 'মুসলমানদের নির্দোষিতা'। যেহেতু চলচ্চিত্রটি ব্যঙ্গ করে নির্মাণ করা, তাই এর নামও ব্যঙ্গাত্মক হবে। এটাই স্বাভাবিক। এখানে নামে মুসলমানদের নির্দোষ বা নিষ্পাপ (!) বলা হলেও সিনেমায় মুসলমানদের দেখানো হয়েছে দোষী এবং নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে। সিনেমাটির বিশদ বর্ণনা আসলে লিখনীতে দেয়া সম্ভব নয়, আর উচিতও হবে না। কারণ শত্রুকর্তৃক পিতার দিগম্বরকরণের বর্ণনার রসালো উপস্থাপন যেমন পুত্রের পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে নির্মিত সিনেমার বর্ণনা আকর্ষণীয়ভাবে দেয়া কোনক্রমে উচিত নয়। শুধুমাত্র ধারণা দেয়ার জন্য এতটুকুই বলা যেতে পারে যে, সিনেমাটি আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেয় করার

এক মহাযজ্ঞ। মানুষের যতগুলি খারাপ দিক থাকতে পারে তার সবই ছিল সেই সিনেমায় আমাদের নবীজির শানে। সন্ত্রাসী, ডাকাত, লুটেরা, পেটুক, নারীলোভী, স্ত্রীদের মধ্যে বে-ইনসাফ কায়েম, যুদ্ধবাজ, স্বার্থপর ইত্যাদি সকল দোষের সমাহার ঘটানো হয়েছে রাসূল সা এর মধ্যে।

আসলে এটি সচরাচর নির্মিত কোন সিনেমা নয়, এর কোন শৈল্পিক দিকও নেই, নেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও। পরিচালক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অন্যান্য সিনেমার যেমন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থাকে এটি আসলে তেমন নয়। এটি একটি রাজনৈতিক সিনেমা। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী টার্গেটকৃত মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে ইসরাইলীদের অপতৎপরতাকে বৈধতা দেয়াই মূল উদ্দেশ্য বলে বিশ্লেষকরা মতামত দিয়েছেন। যুক্তরাষ্টের লস এঞ্জেলসে বসবাসকারী ৫২ বছর বয়স্ক হাউজিং ব্যবসায়ী স্যাম বাসিলের ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস নিয়েও ইতিমধ্যে খবর প্রকাশ হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সে একজন মদ্যপ, নারী ব্যবসায়ী ও প্রতারক বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে তাকে ১৯৯৭ সালে অবৈধ মদ সরবরাহের দায়ে ১ বছরের কারাদন্ড এবং ভুয়া পিনকোড ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর চেষ্টার অভিযোগে ২০১০ সালে ২১ মাসের কারাদন্ড দেয়। যদিও এসব স্বভাব তার দেশ, ধর্ম ও কর্মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ সিনেমা তৈরী বা অভিনয়ের সাথে জড়িতরা মদসেবন ও বহুনারীর সাথে সম্পর্ক রাখবে না এটাতো আমাদের দেশেও অনেকটা অবাস্তব। সুতরাং ব্যক্তিগত চরিত্র যাই হোক এ ছবি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে মার্কিন-ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষা করা এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরণের হীন উদ্দেশ্যই ইহুদী-খ্রিস্টান একজোট হয়েছে তাও ঘটনা বিশ্লেষণে প্রমাণিত।

স্যাম বাসিল জানিয়েছে, বাণিজ্যিক চিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে তার সিনেমা তৈরীর পুরো খরচই (প্রায় ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫০ কোটি টাকা) যোগান দিয়েছে ১০০ ইহুদি শিল্পপতির চাঁদা তুলে। আর সিনেমাটির ট্রেইলার ভার্সনটি প্রচার করে দর্শক আকৃষ্ট করার কাজটি করেছে মার্কিন ২ খ্রিস্টান তৈরি জোনস ও মারিস সাদেক। এর মধ্যে তৈরি জেনিস হল সেই কুখ্যাত ধর্মযাজক যে ২০১০ সালে কুরআন পোড়ানোর ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের চক্ষুশুল হয়েছিল।

মহানবীকে নিয়ে ইহুদী চক্রান্তের পূর্বাপর

নবী হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশধর বনী ইসরাইল বংশের বিভ্রান্ত কিছু উত্তরসূরীই বর্তমান বিশ্বের অবৈধ রাষ্ট্রবাসী ইহুদী। ইয়াকুব (আ.)কে তারা জ্যাকব নামে ডাকে। এই ইহুদী জাতি অনেক নবী রাসূলের সান্নিধ্যে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক ভালবাসতেন বলেই অসংখ্য নবী রাসূল

তাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হেদায়াত গ্রহণ না করে সকল নবী রাসূলের সাথেই তারা উদ্ধত আচরণ করে গজবে নিপতিত হয়েছে। তারা অনেক নবীকে হত্যা করেছে। তারা নবী হযরত সোলায়মান ও হযরত ইলিয়াস (আ.) এর সাথে বেয়াদবী করেছে। হযরত জাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়াহ (আ.)কে হত্যা করেছে। ঈসা (আ.) কে তো শূলে চড়িয়ে হত্যা করার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নেন।

আর বনী ইসরাইলের নবী যার কিতাবের অনুসারী বলে ইহুদীরা দাবী করে সেই মুসা (আ.) এর সাথেও কিন্তু তারা কখনও ভালো আচরণ করেনি। আল্লাহর দিদার লাভের জন্য মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় ভাই হারুনকে কওমের দায়িত্বভার অর্পণ করে ইসরাঈলীদেরকে বুঝিয়ে গেলেন যে, তোমরা ঠিকমত আল্লাহর ইবাদত করবে। কিন্তু ৪০দিন পর তিনি ফিরে এসে দেখেন নবী হারুন আ. এর সাথে তারা বেয়াদবী করে গোটা জাতি পুনরায় গো-বৎস পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে। মুসা আ. তাদের সাথে অনেক রাগারাগি করার পর কিছু মানুষ তার সাথে ফিরে এলেও অনেকেই মূর্তিপূজায় নিয়োজিত থেকে যায়। এমনকি পরবর্তীতে ইহুদীরা প্ররোচনা দিয়ে ধনবান কারুনের মাধ্যমে মূসা (আ.) কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ারও চেষ্টা করে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, নবীদের সাথে তারা যতবারই বেয়াদবী করেছে নবীরা তাদেরকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে ইহুদীদের নানামুখী কুটকৌশল, ছলচাতুরি ও বর্বর আচরণে এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, কুরআনুল কারীমে এজাতিকে অভিশপ্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে যখন মদীনার সকল মানুষ সহানুভূতিশীল আচরণ করছিল তখনও এই অভিশপ্তরা রাসূলের শানে এতটাই বর্বর আচরণ ও ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং রাসূলের উপর পাথর ফেলে হত্যা করার চেষ্টাকরে যে, এ কারণে আল্লাহর রাসূল ইহুদীদের মহল্লা অবরোধ করে রাখেন।

১৫ দিন অবরোধের পর মরণাপন্ন অবস্থায় তারা ভুল স্বীকার করে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। ইহুদীগোষ্ঠীর চক্রান্তে জয়নবের মাধ্যমে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবারে বিষ প্রয়োগে হত্যা করারও চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে আল্লাহর হাবীবের ইন্তেকালের পর এরা নবউদ্যোমে ষড়যন্ত্র শুরু করে। বিভিন্ন এলাকায় ভন্ডনবীর প্রাদুর্ভাব ছিল এর মধ্যে অন্যতম। অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদীনের কঠোর পদক্ষেপের কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের এই চক্রান্তও ব্যর্থ হয়। অতীতে বিভিন্ন মিশনে ব্যর্থ হলেও তাদের কুকর্ম কিন্তু থেমে নেই। মার্কিন ও বৃটেনের

ছত্রছায়ায় মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করে হেন অপকর্ম নাই যে তারা করছে না।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে দখল করে পাশেই ক্যাসিনো (মাদক সেবন কামরা) বানিয়েছে। প্রতিদিন নীরিহ ফিলিস্তিন নারী-পুরুষ শিশু হত্যা করছে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধসহ মিসর, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক বিভিন্ন দেশের সাথে এরা গায়ে পরে একাধিকবার যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের সীমানা থাকলেও যুদ্ধের মাধ্যমে দখলকৃত ভূখন্ড ইসরাইলের কোন সীমানা নেই। জাতিসংঘ তাদেরকে ১৪০০০ বর্গ কি.মি. ভূখন্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রের সীমানা বলে স্বীকৃতি দিলেও ইসরাঈল তা অগ্রাহ্য করে ঘোষণা দিয়েছে 'যতদূর পর্যন্ত ইসরাঈলী সেনারা অবস্থান করবে ততদূর ইসরাঈলের ভূখন্ড'।

এভাবে তারা প্রতিনিয়ত গাজাসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের দখল বাড়িয়েই চলেছে। অবৈধ উপায়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে তারা অর্থ উপার্জন করে ইসরাঈলকে শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করারও সাহস দেখাচ্ছে। পাশ্চাত্যের প্রতাপশালী নেতা হিটলারও এদের বর্বরতাকে মেনে নিতে না পেরে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে মেরে মাটি চাপা দিয়েছিলেন এবং এই মাটি গর্ত করার কাজটিও করিয়েছিলেন কিছু ইহুদীকে দিয়ে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি অল্প কিছু ইহুদী বাঁচিয়ে রাখলাম, যাতে মানুষ এদেরকে দেখে বুঝতে পারে আমি কেন নির্বিচারে ইহুদীদের হত্যা করেছি।'

ইহুদী প্রভাববলয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

স্বীকৃতিহীন একটি রাষ্ট্রের একঘরে বাসিন্দা হয়েও আজ ইহুদীরা মার্কিনীদের সহযোগিতায় পরমাণুসহ বিভিন্ন অস্ত্র কারখানা গড়ে তুলেছে এবং বর্তমানে তারা নামে-বেনামে অস্ত্র বিক্রিতে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। তারা সময়ে অসময়ে নিজেদের স্বার্থের পক্ষে কাজ না করলে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানকেও ধমক দিতে পিছপা হয় না। মার্কিন সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই এদেরকে বর্বর হিসেবে সমঝে চলে। অবৈধ ছোট একটি দেশকে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত গুরুত্ব দেয় তা খুঁজতে গিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেল তা চমকে ওঠার জন্য যথেষ্ট।

আমেরিকায় বর্তমানে প্রায় ষাট লক্ষাধিক ইহুদী বাস করে, যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই থাকে নিউইয়র্ক-এ। ইহুদীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা বৈধ-অবৈধ উপায়ে প্রচুর অর্থ কামাতে পারে এবং সূক্ষ্ম মেধা খাটিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবাইকে টেক্কা দিতেও এদের জুড়ি নেই। এদের পূর্বপুরুষ কারুনের নাম আমরা সবাই জানি। তার গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে,

ধনভান্ডারের চাবি বহন করতে প্রায় ৭০টি উটের প্রয়োজন হতো। ধনকুবের মালিক হওয়ার ধারাবাহিকতায় আজও তারা শীর্ষস্থানেই রয়েছে। আমেরিকায় বসবাসকারী ৬০ লক্ষ ইহুদীর আয়ের পরিমাণ সেদেশের মোট জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার হোয়াইট হাউস, প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ, সামরিক বাহিনী, ব্যাংক-বীমা সর্বত্র ইহুদীদের দাপট চোখে পড়ার মত। এমনকি বর্তমানে মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় ৫০ ভাগের মালিকই নাকি ইহুদী। বিভিন্ন দুর্যোগে, নির্বাচনী কান্ডে ইহুদীদের বড় অংকের অর্থ প্রদানের কারণেই মূলত মার্কিন শাসকরা ইসরাঈলের ব্যাপারে নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন- 'তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা আল্লাহর এবং তোমাদের শত্রু...'।

ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহর রাসূলকে তার জীবদ্দশায় যেমন কষ্ট দিয়েছে, শত্রুতা করেছে, তেমনি তার ইন্তেকালের পরও ধারাবাহিকভাবে তাদের বংশধররা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। হিজরী ৫৭৭ সালের একটি ঘটনাই তার প্রমাণ। দু'জন খ্রিস্টান মুসলিম দরবেশের বেশ ধরে খানকা বানিয়ে সেসময় মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল। স্বপ্নের মাধ্যমে তৎকালীন সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গীকে জানিয়ে দিলে তিনি তল্লাশি চালিয়ে দরবেশদের আস্তানা থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারকের দিকে খননকৃত সুড়ঙ্গ দেখতে পান। যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর রাসূলের লাশ মোবারক চুরি করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করছিল।

তাগুতের মোকাবেলায় করণীয়ঃ

'আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ'। ইহুদী-খ্রিস্টান শুধু নয় ইসলাম বিরোধী সকল শক্তিই যে ইসলাম ধ্বংসের মিশনে ঐক্যবদ্ধ এ বাস্তব সত্যটিকে আমাদের মনে রাখতে হবে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ধর্মীয় অবমাননা হয়েছে এর সিংহভাগই ইসলামকে ঘিরে। এর কারণ কি? আসলে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্বইতো প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে ইসলামকে সব ধর্মের ধর্মগুরুরা ভীষণ ভয় পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো স্কুলের ছোট শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল সিলেবাসে শেখানো হয়- মুসলমানরা বর্বর, সন্ত্রাসী, নারী লোভী, হিংস্র ইত্যাদি। ফলে মুসলমানদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সন্তানেরা। যদিও গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের ইসলাম থেকে পরিকল্পিত ভাবে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য প্রতিবছরই হাজার হাজার শিক্ষিত মার্কিন তরুণ-তরুণী মুসলমান হচ্ছে। এর

ফল হিসেবে আমেরিকা-বৃটেনে ইতোমধ্যে কয়েক হাজার মসজিদ ও ইসলামী লাইব্রেরীসহ কালচারাল সেন্টার গড়ে উঠেছে। ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা তাই ধর্ম হারানোর আশংকায় চিন্তিত। অতএব ইহুদী-খ্রিস্টানরা যত চেষ্টাই করুক ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার টার্গেট কখনই পূরণ করতে পারবে না এটা চিরসত্য। আর যত নাস্তিক আছে অধিকাংশই তাদের দালাল যেমন মালালা, আসিফ, মহিউদ্দীন, মুফাসসিল মুফা, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, আসাদনূর গংরা সবাই তাদের দালাল ও তাদের মতার্দশের।

তবে সকল তাগুতী শক্তির ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত রুখতে বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সজাগ থাকতে হবে। কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের আন্দোলনে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা যেন কোন অসৎ উদ্দেশ্য সফল করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে কুফুরী শক্তি যেন মুসলমানদের চরিত্র হনন না করতে পারে- ইসলামকে যাতে সহিংস ও বর্বরতার ধর্ম হিসেবে উল্লেখ না করতে পারে, বরং ইসলামের সুমহান আদর্শ যেন সাধারণ কাফেরদের সামনে সমুজ্জল হয়ে উঠে। সে লক্ষ্যে বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ওলামায়ে কেরামের সুদৃঢ় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। সাধারন মুসলমানদের মধ্যেও এসব বিষয়ে সচেতনতা ও প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। মুসলমানরা যেন তাদের প্রকৃত শত্রুদের চিনতে পারে, ইসলাম ও বিশ্ব মানবতা ধ্বংসের প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য রুখে দাঁড়াতে পারে, সেজন্যও ইসলামী নেতৃবৃন্দের সুদূর প্রসারী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা আজ সময়ের দাবী।

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বহু বিবাহ নিয়ে নাস্তিকদের বিভ্রান্তি

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাসনা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। ইসলামও অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শর্তাধীনে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী একসাথে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। আর একমাত্র এ ব্যবস্থাই বিবাহ বন্ধনের বাহিরে গোপন যৌন সম্পর্ক, সামাজিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অপরাধ সফলতার সহিত দমন ও প্রতিরোধ করতে পারে। স্বভাবের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করে দিতে গেলে ইহার কুফল প্রচন্ডরুপে দেখা দিবেই। সুতরাং দেখা যায়, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের সাথে সাথে সমাজে পতিতাবৃত্তি, নারী ধর্ষণ, নারী হরণ ও ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধ প্রসার লাভ করে। এর ফলে বহু বিবাহের বিরোধী সুযোগ সন্ধানী নাস্তিক ও পাশ্চাত্য এর অনুসারীগণ আজ চরম বিপদ বিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন। এ সকল স্থানে পতিতাবৃত্তি বহু বিবাহের স্থান দখল করে

নিয়েছে। কেবল নিউইয়র্কেই পঞ্চাশ হাজারের উপরে উপপত্নী রয়েছে এবং প্রতি বৎসর এখানে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গর্ভপাত করা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতি মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিতা হয়।

বহুবিবাহের বিরোধীরা অবৈধ যৌন আচরণে কোন প্রকার নৈতিক সংকোচ বোধ করে না এবং বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব বহনে তারা নারাজ। এজন্যই অবৈধ যৌন মিলন তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। নারী-মুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি, নারী-অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা বা সমান অধিকার ও নারী অগ্রাধিকারের মুখরোচক প্রচারের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ধুরন্ধরেরা নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থে নারীদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দৈহিক উপভোগের সামগ্রী বানিয়ে নিয়েছে। আর সরলমনা নারীরা তাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ইজ্জত-হুরমত সবকিছু বিনষ্ট করতেছে নারী-স্বাধীনতার প্রচারের পিছনে নৈতিকতা বোধশূন্য হীনচরিত্র পুরুষদের লেরিহান লম্পটতা যে কাজ করতেছে, পূর্ব বিকারহীন মনলয়ে চিন্তা করলে নারীগণ তা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন।

আর পৃথিবীতে পুরুষ থেকে নারীদের সংখ্যা বেশি। আমেরিকাতে ছেলের থেকে মেয়েদের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ বেশি। ইংল্যান্ডে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ বেশি। রাশিয়ায় ৯০ লক্ষ বেশি, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ বেশি, বাংলাদেশে বেশি, পাকিস্তানে বেশি, সৌদি আরবে বেশি। বিশ্বের সকল দেশেই মেয়েদের সংখ্যা বেশি। তবে যে দেশে মেয়েদের হত্যা করা হয় সে দেশ ছাড়া। যেমন ইন্ডিয়াতে প্রতি বছর ১০ লক্ষ মেয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়। আর পুরুষ মেয়েদের থেকে মারা যায় বেশি। জন্মের সময় ছেলে শিশু মারা যায় বেশি। যুদ্ধে মারা যায় বেশি। এক্সিডেন্টে মারা যায় বেশি। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা কিতাব 'নাস্তিক ও ইউরোপিয়ানদের চরিত্র' বইটি পড়তে পারেন।

যেসমস্ত মহিলা বেশি আছে তাদেরকে যদি কেউ বিবাহ না করে তাহলে তারা পতিতা হবে। নাস্তিক কুলাঙ্গার আসাদ নূর লুচ্চা সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লুচ্চা বলেছে। এই প্রশ্নের উত্তর এই কিতাবে দেয়া হয়েছে তিনি যদি নারী লোভী হতেন তাহলে বিধবা ও বয়স্কা এবং ধন-সম্পদহীন নারীদেরকে বিবাহ করতেন না। যুবতী ও ধনী পরিবারের নারীদেরকে বিবাহ করতেন। আর তিনি ছিলেন মদীনার প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকাতে বিবাহের পূর্বে গড়ে একজন মানুষের ৮জন যৌনসঙ্গিনী থাকে। ইসলামের বহু বিবাহ প্রসার উপযোগ, কার্যকারিতা ও কল্যাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এ সমাজ বিজ্ঞানীর উপলব্ধি কত সুন্দর! তিনি বুঝাচ্ছেন, পাশ্চাত্যজগত একবিবাহের কথা বললেও কার্যত এ প্রথা আসলে পাশ্চাত্যেও প্রচলিত নাই। বরং

সে সব দেশে বিবাহবন্ধনের বাহিরে লোকেরা বহু নারী সম্ভোগ অবাধে করে থাকে। কোন কোন নারীকে উপভোগের পর তাকে বিতাড়িত করা হয় এবং সে তখন কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অথচ ইহা অপেক্ষা আরো স্ত্রী আছে, এমন স্বামীর অধীনে বিবাহিত জীবন যাপন করা কত সুখের ও উৎকৃষ্ট! পাশ্চাত্যের শহরগুলিতে রাত্রিকালে হাজার হাজার নারী রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভিড় জমায়। ইসলামের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

প্রত্যেক ধর্মেই বহুবিবাহের প্রচলন আছে। কৃষ্ণের ১৬১০৮ জন স্ত্রী ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের আগেই দুনিয়ার সকল ধর্ম ও জাতিতে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম এর উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত করেছেন মাত্র। প্রয়োজনের তাগিদে সকল স্ত্রীর সাথে সুবিচারের শর্তে একজন পুরুষ একত্রে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। সুবিচার সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা হলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আবার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ যার নেই তাকে বিবাহ হতে বিরত থেকে রোযা দ্বারা কাম-বাসনা সংযত রাখতে বলা হয়েছে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? পারিবারিক-সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক কারণে বহুবিবাহ আবশ্যক। আর এ ব্যাপারে সুন্দর ও বাস্তবধর্মী একটি জীবন আদর্শ আমরা পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবনে দেখতে পাই। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তিনি তার তেষট্টি বৎসর জেন্দেগীর আটত্রিশ বৎসর পারিবারিক জীবনযাপনের মাধ্যমে বিশ্ব জগতে সুমহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ ক্রমেই ইসলাম প্রচার-প্রসার, বিশেষ করে নারী সমাজের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন, কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন, বিধবাদের দুর্গতি মোচন, তালাক প্রাপ্তদের সতীত্বের মূল্যায়ন, অলক্ষে শত্রুদের অন্তর বিজয়, বংশগত শত্রুতার রক্তের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বৈধ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত স্থাপন, তালিফে কলুবের জন্য রাষ্ট্রনায়কগণের হাদিয়া গ্রহণের সফলতা অর্জন, গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি গ্রহণ, আত্মীয়-স্বজনগণের মহান আদর্শ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাপক মানবতাবোধের পরিচয় দান এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণেই উম্মতের কান্ডারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিম্নরূপে বহু বিবাহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্রীতদাস যায়েদের সাথে চতুর্থ হিজরী সনে তার প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু ভাগ্যের

পরিহাস এক বৎসর যেতে না যেতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশক্রমে পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا.

"আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন। আপনি লোক নিন্দার ভয় করেছিলেন। অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।" (সূরা আহযাব- ৩৭)

এই আয়াতের দ্বারা আরবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারকে সমূলে উৎপাটনের কথা এসেছে। আরবে জাহেলী প্রথা ছিল যে, পোষ্য পুত্র নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতোই। পোষ্য পুত্রও ঔরসজাত সন্তানের মতো মিরাস পায়। তার সাথে লালনপালনকারী মায়ের পর্দা নেই। সেই সাথে পোষ্য পুত্র যাকে বিবাহ করে,সে তাকে তালাক দিলে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর পোষ্যকারী পিতা বিবাহ করতে পারে না। জাহেলী যুগে প্রচলিত উক্ত প্রথাটি সে যুগের মানুষের মন-মগজে ঢুকে গিয়েছিল। এর উল্টো বিষয়কে কেউ মানতেই চাইত না। তাই আল্লাহ তা'আলা চাইলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতে।

ঘটনার সংক্ষেপ হলো- যয়নব বিনতে যাহাশ (রা.) রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেছা (রা.) এর সাথে যয়নবের বিবাহ দেন। আরব বংশ-গৌরব খুবই প্রচলিত ছিল। সেখানে ভালো বংশের কোন মেয়েকে গোলাম বা আযাদকৃত গোলামের কাছে বিবাহ দেওয়াকে খুবই অপছন্দ করা হতো। এ কারণে প্রথমে যয়নব রা. ও তার পরিবার এ সম্বন্ধে রাজি ছিল না।

পরে রাজি হয়। কিন্তু পরিবারে মিল ছিল না। প্রায় কথা কাটাকাটি ও বিবাদ লেগে হতো।

ফলে যায়েদ (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তালাকের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাক দিতে বারণ করেন। কারণ বিয়ের পর তালাক প্রদান করা অনুত্তম কাজ। ইতিমধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, যায়েদ এ বিবাহ বন্ধন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। বরং সে তালাক দিবেই। আর এরপর যয়নবের মনকে খুশি করতে খোদ রাসূলকেই তাকে বিবাহ করতে হবে। এটাই আল্লাহর ফয়সালা, যা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন। যখন যয়নবের ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদের মাধ্যমেই যয়নব (রা.) এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। সে সময় সূরা আহযাবের ৩৭ নং আয়াত নাযিল হয়। যাতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, পোষ্য পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা সম্পূর্ণই বৈধ। এতে দোষের কিছু নেই। পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ না করার কুপ্রথা বিলুপ্তকরণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বিবাহ করলেন। সুতরাং এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কোন প্রকার অপবাদ রটানোর কোন যৌক্তিকতা নেই।

পয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা পরিত্যক্তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্ত্রী রূপে বরণ করে নেন। তিনি হস্ত শিল্পে সুনিপুণা ছিলেন। স্পষ্টতই এ উভয় বিয়ে দ্বারা আঘাত হানা হয়েছে তৎকালীন প্রচলিত পরিত্যক্ত ও দাসত্বেও কুসংস্কারকে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সুমহান ইসলামের সাম্যনীতি, নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা ও নিরাশ্রয়া দু:খিনীর মান-মর্যাদা হক। নিরোৎসাহিত করা হয়েছে বংশ-মর্যাদা; ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত করা হয়েছে দাম্ভিকতা ও অহমিকা।

আরেক স্ত্রী হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিছ (রা.)। তিনি আরব সীমান্তের খ্যাতিমান যোদ্ধাগোত্র বনি মুস্তালিকের সর্দার হারিছ এর কন্যা। আর এই হারিছই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানী দুশমন। মদীনার নিকট এক যুদ্ধে মুস্তালিক গোত্র মুসলিম বাহিনীর হাতে চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। আর জুওয়াইরিয়ার স্বামী এ যুদ্ধে নিহত হয়। জুওয়াইরিয়ার মুক্তিপণ দরুণ 'নয় উকিয়া' সোনা দাবী করা হয়। যা তার পক্ষে আদায় করা সম্ভবনয় বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে সাহায্যের আবেদন করায় দয়াল নবী উম্মতের কান্ডারী বলেন, তোমার কি এর চেয়ে ভাল কোন

কিছুর ইচ্ছা নেই? জুওয়াইরিয়া উত্তর দিল, উহা আর কি হতে পারে? উম্মতের কান্ডারী দয়াল নবীজী ফরমাইলেন- 'আমি যদি তোমার মুক্তিপণ আদায় করে তোমাকে বিবাহ করে নেই।' অসহায় মহিলা অবাক হয়ে গেলেন এবং রাজী হয়ে গেলেন। সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম ধর্মগ্রহণের খবর প্রকাশিত হওয়ায় পিতাসহ মুস্তালিক গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। জানের দুশমন এখন পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণ প্রিয় লোক হয়ে গেল, যেমন আত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তেমন মুসলমানগণের সীমান্তও সুরক্ষিত হয়ে গেল। স্বামী ভক্তির মাধ্যমে তিনি গভীর ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিয়ের মাধ্যমে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম সামাজিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শত্রুকে মিত্রে পরিণত করারই ইংগিত মেলে। যার ফলে শত্রু এলাকা মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। অসংখ্য বিপথগামী বনি আদম পেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান।

আরেক স্ত্রী উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)। তার পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশীয় উমাইয়া গোত্রের সর্দার আবু সুফিয়ান। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর উভয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় গিয়ে স্বামী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় ধর্মীয় মত পার্থক্যের কারণে স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর ওকালতীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আটত্রিশ বৎসর বয়সে তার শুভ পরিণয় হয়। তৌহিদবাদে বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে তিনি অতি নিষ্ঠাবর্তী ছিলেন। এমনকি নিজের পিতা আবু সুফিয়ানকে পর্যন্ত রাসূলের বিছানায় বসতে দেননি। (যখনও তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিয়ে থেকে দয়ার সাগর উম্মতের দরদি নবী অসহায় দুঃখিনীকে আশ্রয় দানের মাধ্যমে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আরেক স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হোয়াই (রা.)। তিনি বনু নজীর গোত্রের গোত্রপতি হোয়াই-এর কন্যা। মাতা কুরাইজার সর্দারের কন্যা। উভয় দিক থেকেই সর্দারিয়াতে ভরপুর। উভয় গোত্রই ছিল মুসলমানদের বড় দুশমন ইয়াহুদী সম্প্রদায়। খায়বারের যুদ্ধে তাঁর স্বামী কেনানা নিহত হয় এবং সে নিজে বন্দী হন। ইতিপূর্বে তিনি সালাম বিন মশকামাল কজীর স্বামীত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধে বিধবা হয়ে বন্দী অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন এবং বিশেষ অনুরোধক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তী সময় তাঁরই সুপারিশে বনু নজীর গোত্রের ইয়াহুদীরা মুসলমানদের

সাথে দুশমনী ছেড়ে দিয়ে প্রীতিম বন্ধনে গড়ে উঠে। এ বিয়ের মাধ্যমে বিরাট ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কব্জায় এসেছিল এবং গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল বহু সংখ্যক ইয়াহুদী। ইসলাম গ্রহণ করেছিল অসংখ্য অগণিত ইহুদী সম্প্রদায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন স্ত্রী মায়মুনা বিনতে হারিছ (রা.)। তিনি বিখ্যাত বীর খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. এর ফুফু এবং হযরত আব্বাস রা. এর শ্যালিকা। ইতিপূর্বে তার দু'টি বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতঃ বিধবা হয়ে অসহায়ত্ব দূরীকরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে নিজেকে বিয়ে করার কথা ব্যক্ত করায় হযরত আব্বাস (রা.) এর মধ্যস্থতায় এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ে থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, পরিত্যক্তা ও বিধবা অসহায় মহিলার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতইনা দরদি উহার অন্ত ছিল না। এরূপ নজীর বর্তমান উন্নত ও সভ্য পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মিশরের শাসনকর্তার সাথে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এবং ভ্রাতৃসুলভ পররাষ্টনীতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রথানুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মারিয়া কিবতিয়াকে হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরে তাকে বিবাহ করে নেন। তাঁর ঘরে ইব্রাহীম রা. জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উল্লেখিত কারণ সমুহেই আলোচ্য বিবাহগুলো সম্পন্ন করতে হয়েছিল। যার ফলে দীর্ঘ দিনের বংশগত শত্রুতা অলক্ষ্যে জয় করে ব্যাপক মানবতাবোধ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যে ইহুদী, খৃষ্টান বা ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তদের ঘৃণা করতেন না তা তিনি বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন। তিনি যদি শুধু হযরত খাদিজা (রা.) কেই বিবাহ করে ক্ষ্যান্ত হতেন তাহলে কুমারী, বিধবা, পরিত্যক্তা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কিরূপ ব্যবহার করা দরকার এবং ক্রীতদাসীর যে সম্ভ্রান্ত ঘরের ঘরণী হতে পারে এ আদর্শ আমরা খুঁজে পেতাম কোথায়? স্বপত্নীদিগের সাথে পারস্পরিক কিরূপ ব্যবহার হবে এবং একাধিক বিবাহ করলে স্বামীর কর্তব্যই বা কিরূপ হবে? এ সবগুলো প্রশ্নের জবাব আমরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বৈবাহিক জীবন থেকে পাই।

কার্যতঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বহুবিবাহ হলেও ধ্যানতঃ তার নিকটে ছিল সকলেই এক। এ মহান আদর্শ ফুটিয়ে তোলার জন্যই

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহুবিবাহ করতে হয়েছিল। তাঁর মাঝে যদি আজ 'সতীনের' এ আদর্শ না থাকত তাহলে 'রক্ষিতা ও পতিতার' গ্লানিই আমাদের সমাজকে পুরোটাই গ্রাস করে ফেলত। বলাবাহুল্য যারা আজ এ সভ্য জগতে বহু বিবাহের বিপক্ষে মত পোষণ করছেন বা নাস্তিক মুফাসসিল, আসাদনূর, আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, অন্যান্যরা রাসূলের বিবাহ নিয়ে মিথ্যা ও কটূক্তি করছে। হিজড়া মুফাসসিল মুফা রাসূলকে নিয়ে বলে তোমাদের নবী ১১জন স্ত্রীর সাথে প্রতিদিন সহবাস করতেন। মিথ্যাবাদী হিজড়া কিভাবে মিথ্যা বলে অথচ হাদীসের অর্থ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকল স্ত্রীদের খোঁজখবর নিতেন এবং কার কি সমস্যা জানতেন। আর মিথ্যাবাদী মুফা বলে কি? নাস্তিক বেঈমানেরা স্বাভাবিক যৌন-কামনা নিয়ন্ত্রণের রুঢ় বাস্তবতার প্রহারে অনাচার ও ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করতেই চাচ্ছেন।

পরিশেষে এ কথাই বলতে চাই, যারা বহু বিবাহের প্রকাশ্য দুয়ার বন্ধের পক্ষে, তারা হয়তো অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবৈধ প্রেম ও অনাচারের গুপ্ত দরজা খুলে রাখতেই সচেষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একজন নবী ছিলেন। সেই সাথে একজন রাষ্ট্রনায়ক। চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ইসলাম নামক জান্নাতি ধর্মকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে আদিষ্ট ছিলেন। এ কারণে পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে অনেক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। রাজনৈতিক জটিলতায় পড়তে হয়েছে। সেখানে একাধিক বিবাহ করার সুযোগ অনেক জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার হাতিয়ার হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়েশা (রা.) এর বিবাহ নিয়ে কটূক্তিকারী কুলাঙ্গার নাস্তিকদের জবাব

বিবাহ মানবসমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদি রূপ থেকে বর্তমান কাঠামোয় উপনীত হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়ে সংক্রান্ত সব নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। একথা সব ধর্মের জন্যই প্রযোজ্য। বিয়ের প্রথা, পদ্ধতি, বয়স, রীতিনীতি-সবই যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতির হাত ধরে। বিয়ের ক্ষেত্রে যুগে যুগে দেশে দেশে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন বিধান ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোন যুগের মানুষই এ প্রশ্ন তোলেনি যে, 'কেন এই বিধান দেওয়া হলো' বা 'অমুক বিধান ও সংস্কৃতি অবৈধ' আদম (আ.)- এর যুগে নিজ মাতৃজাত বোনকে বিয়ে

করা বৈধ ছিল। তার পরের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নিজ মাতৃজাত বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হযরত আদম (আ,) কে এক হাজার বয়স দেওয়া হয়েছিল। রুহের জগতে দাউদ আ. এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করেন। অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩০৭৬)

ফলে আদম আ. এর বৈবাহিক জীবনের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। কিন্তু পরে বনী আদমের বয়স কমতে থাকে। কমতে কমতে গড়ে ৬০ থেকে ৭০ এ পৌঁছে যায়। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৫০, ২৩৩১; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪২৩৬)

তাই পরবর্তী লোকদের বিয়ের বয়স, পারিবারিক জীবনের স্থায়িত্ব, বিয়ে প্রথা ও বিয়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাকে সামনে রেখে আমরা হযরত আয়েশা (রা.) এর বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। হযরত আয়েশা রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কেবল হাদীসই বর্ণনা করেননি, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দিতেন, ফতোয়া দিতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার বরকতময় বিয়ের সবচেয়ে বড় সুফল হলো, তার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত জীবনীকার আল্লামা জুহরী রহ. লিখেছেন- 'যদি আয়েশা রা. এর জ্ঞানভান্ডার একদিকে এতত্রিত করা হয় আর অবশিষ্ট নবীপত্নীদের জ্ঞান ও গোটা মুসলিম সমাজের নারীদের জ্ঞান অন্যদিকে একত্রিত করা হয়, তাহলে আয়েশা (রা.) এর জ্ঞান তাদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।'

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৪১)

তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর কন্যা। হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের এমন ব্যক্তিত্ব, যার চারিত্রিক উৎকর্ষ বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, '(পৃথিবীর ইতিহাসে) পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল তিনজন নারী পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করেছেন। এক. মারিয়াম বিনতে ইমরান। দুই. ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। তিন. আয়েশা রা.। নারীদের মধ্যে আয়েশা তেমনি শ্রেষ্ঠ, খাবারের যেমনি শ্রেষ্ঠ ছরিদ (আরবের বিখ্যাত খাবার)।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৪১১)

তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আয়েশা! ইনি জিব্রাঈল, ইনি তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)
তার পবিত্র রানের উপর মাথা রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ইন্তেকাল করেছেন। তিনি যে কক্ষে থাকতেন, সেটিকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জান্নাতের মুখ সেদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই শায়িত আছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবন

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন, কখন থেকে তাঁর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তা জানার আগে এ বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করা দরকার যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ যৌবনে পঁচিশ বছর বয়সে সর্বপ্রথম বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম খাদিজাতুল কোবরা রা.। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে তার আরো দু'টি বিয়ে হয়েছিল। এ দুই স্বামীর ঘরেই অন্তত চারজন সন্তান ছিল। সে সময় হযরত খাদিজা (রা.) এর বয়স ছিল ৪০ বছর। মতান্তরে ৪৫। আল্লামা জাহাবী (রহ.) এর মতে তার বয়স ছিল ৪০ বছর। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৬৬) তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১৫ বা ২০ বছরের বড়। তাঁর সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর ঘর-সংসার করেছেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ রা.কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন সাকরান ইবনে আমরের স্ত্রী। সাকরানের মৃত্যুর পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।
মক্কা থেকে মদিনায় ইতিহাসখ্যাত হিজরতের মাত্র তিন বছর আগে হযরত খাদিজা রা. এর ইন্তেকাল হয়। এ সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি। খাদিজা রা. এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একমাত্র স্ত্রী। খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাদের অনেকেই ছিলেন বিধবা বা যুদ্ধে স্বামীহারা অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা কিংবা দুস্থ। কোন কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আল্লাহ পাকের সরাসরি নির্দেশে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হল-

১. হজরত খাদিজা (রা.) : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম স্ত্রী। তিনি বিধবা তবে বিদূষী, ধনী নারী ছিলেন। পবিত্র মক্কায় তিনি

'তাহেরা'- অর্থাৎ পবিত্র বলে পরিচিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে কমপক্ষে ১৫ বছরের বড় ছিলেন তিনি। নবুওয়তের প্রথম জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের কাজে তিনি বিশেষভাবে পাশে দাঁড়ান।

২. আয়েশা (রা.) : আবু বকর রা. এর কন্যা। কেবল আয়েশা রা. ই কুমারী মেয়ে ছিলেন, যাদের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়ে হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের সময় আয়েশা রা. এর বয়স ছিল ১৮ বছর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহু হাদীস আয়েশা (রা.) এর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। তার প্রখর স্মরণশক্তি এ কাজে সহায়ক হয়েছিল।

৪. হাফসা(রা.) : ওমর রা. এর কন্যা ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে উনাইস ইবনে হোজাফা রা. এর স্ত্রী ছিলেন। উনাইস রা. যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন।

৫. জয়নাব বিনতে খুজাইমা রা. : তিনি মদিনায় নিস্বঃদের জননী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তোফায়েল ইবনে হারিসের সঙ্গে। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তোফায়েলেরই ভাই উবায়দাকে বিয়ে করেন তিনি। উহুদের যুদ্ধে উবায়দা শহীদ হন। পরে অসহায় জয়নাবকে বিয়ে করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ছয় মাসের মধ্যেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।

৬. সালমা (রা.) : প্রথম জীবনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল আবু সালামা রা. এর সঙ্গে। উহুদের যুদ্ধে আবু সালামা রা. শহীদ হন। বিধবা উম্মে সালামাকে অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ইতিহাসবিদরা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) : তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফাতো বোন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তার এই বোনকে তাঁর পালকপুত্র যায়েদ (রা.) এর সঙ্গে বিয়ে দেন। এই বিয়েতে গোড়া থেকেই জয়নাব (রা.) এর আপত্তি ছিল। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। পরে তাদের পারিবারিক জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে। জয়নাব রা.-এর আপত্তিতে এ বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ায় এবং এরপরে বিচ্ছেদ ঘটায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে কিছুটা অনুশোচনা আসে। এ থেকে জয়নাব রা. কে নিজে বিয়ে করার প্রস্তুতি গ্রহণ

করলেও তৎকালীন আরবের কুসংস্কারের জন্য তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে আয়াত নাজিল হয়। সেখানে পালক ছেলে ঔরসজাত সন্তান সমতুল্য নয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কুসংস্কার নির্মূল করার উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখনই জয়নাব (রা.) এর সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. জুওয়াইরিয়া (রা.) :একটি আরব গোত্রের সর্দার হারিছের কন্যা। তিনি যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে তাঁর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন। উপহার হিসেবে গোত্রের সব বন্দি মুক্তি লাভ করে। তাঁর পিতা হারিছও ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯. উম্মে হাবিবা (রা.) : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ বিন জাহালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আফ্রিকার হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহ থেকে উম্মে হাবিবাকে মুক্ত করে তিনি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশির মাধ্যমে চাচাতো বোন উম্মে হাবীবা (রা.) কে বিয়ে করেন।

১০. সাফিয়্যা(রা.) : তিনি ছিলেন নবীদেরই বংশধর। হযরত মুসা (আ.) এর অধস্তন বংশধারার কন্যা। প্রথমে কিনানা ইবনে আবিলের স্ত্রী ছিলেন তিনি। কিনানার মৃত্যুর পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

১১. মায়মুনা(রা.) : তিনি প্রথমে মাসউদ বিন ওমরের স্ত্রী ছিলেন। সে তালাক দিলে আবু রিহামের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। আবু রিহাম মারা যাওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এত বেশি বিয়ে আজকের যুগে অস্বাভাবিক মনে হলেও তৎকালীন আরব জগতে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এছাড়া আগের নবীদের ইতিহাসে দেখা যায়, সুলায়মান আ. এর ৭০০ স্ত্রী ছিল। দাউদ আ. এর ৯৯ জন এবং ইবরাহিম আ. এর ৩ জন, ইয়াকুব আ. এর ৪ জন, মুসা আ. এর ৪ জন স্ত্রী ছিল। হিন্দুদের গ্রন্থ মনুসংহিতায় পাঁচজন স্ত্রী থাকার কথা উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ছিল শত পত্নী ও উপপত্নী।

(মনুসংহিতা, অধ্যায় : ৯, শ্লোক : ১৮৩)

হাজার বছর আগে তৎকালীন আরবেও এমন বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়েগুলো প্রায় সবগুলোই মানবিক।

একটি কুরআনের আয়াত বাস্তবায়নে, দু-একটি ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৃহত্তম পরিবারের সদস্য, ফুফাতো বোন অথবা চাচাতো বোন। অনেক বিধবা-অসহায় নারীকে তিনি নিজ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। একজন ছাড়া কেউই কুমারী ছিলেন না; বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে অনেকের বিয়ে হয়েছিল, যাদের অনেক সন্তান ছিল, তা নিয়েই। ওমর (রা.) তার তালাকপ্রাপ্তা দুঃখিনী মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনেকের কাছেই যান। ব্যর্থ হয়ে ফেরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে পরামর্শ করে তার কাছেই সমর্পণ করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বিয়ের মধ্যে কোন শারীরিক চাহিদাও ছিল না। বরং বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে তিনি বিয়ের মাধ্যমে একটি শক্তি সমাবেশও করে থাকেন, যা দেখে তৎকালীন কাফের-মুশরিকরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ইসলামী শরীয়ায় এ জন্য শারীরিক প্রয়োজনে অধিক স্ত্রী রাখার প্রবণতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সীমারেখায় অনধিক চার স্ত্রী থাকলেও সবার অধিকার আদায় না করতে পারলে একাধিক বিয়েকে অন্যায় ও জুলুম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) এর বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল, এ যুগের কিছু ইতিহাসবিদের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহের অবতারণা করতে দেখা যায় এবং হাস্যকর কিছু যুক্তিও উপস্থাপন করতে দেখা যায়। তাদের একদলের অভিমত হলো, বিয়ের সময় আয়েশা রা. এর বয়স ছিল ১৪ বছর। আর যখন তার সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈহিক সম্পর্ক হয় তখন তার বয়স ছিল ১৭ থেকে ১৮ বছর। (দেখুন- আরবি পত্রিকা 'আশশারকুল আওসাত' ৬/৯/২০০৮ ইং ও প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক শওকী জইফের গ্রন্থ 'মুহাম্মদ খাতামুল মুরসালীন' পৃ. ১৭১)

মূলত তারা পশ্চিমা ভাবাদর্শে লালিত, নয়তো হাদীসশাস্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

তবে আমরা হযরত আয়েশা (রা.) এর বিয়ের সময়ের বয়সের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসের সামনে ইতিহাসবিদদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আমরা মনে করি, এ বিষয়ে হাদীসের কথাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যাঁর বিয়ে, তার জবানেই শুনুন- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদিনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সঙ্গে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান এসে আমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকলেন। আমি তার কাছে গেলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কী? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের ভেতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী নারী ছিলেন। তারা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় ও সৌভাগ্যমন্ডিত হোক। আমার মা আমাকে তাঁদের কাছে দিয়ে দিলেন। তারা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন। তখন ছিল দ্বিপ্রহরের আগ মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখে আমি হতচকিয়ে গেলাম। তারা আমাকে তার কাছে তুলে দিল। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা।" (বুখারী শরীফ, হাদীস নং : ৩৮৯৪, ৩৮৯৬, ৫১৩৩, ৫১৩৪, ৫১৫৬, ৫১৫৮, ৫১৬০; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং : ১৪২২)

হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমদিনায় হিজরতে তিন বছর আগে হযরত খাদিজাহ (রা.) এর ইন্তেকাল হয়। তারপর দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আয়েশা (রা.)কে বিয়ে করেন। তখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা। তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদযাপন করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৮৯৬)

হযরত আয়েশা (রা.) এর পিতা-মাতাই আয়েশা (রা.) এর বিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে দিয়েছিলেন। কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম এ বিয়ের প্রতিবাদ করেনি। কারণ সে সময় মেয়েদের এ বয়সেই সাধারণত বিয়ে দেওয়া হতো। এটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। এর আসল কারণ হলো, সে সময় আরবের মানুষদের আয়ু কম ছিল। মানুষ ৪০-৬০ বছর বয়সেই সাধারণত মারা যেত। তাই প্রাকৃতিকভাবে ৯ বা ১০ বছরের মেয়েকে বিয়ে করাই ছিল সে সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন।

এক. হযরত আবু বকর (রা.) এর সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আত্মীয়তার বাঁধনে আবদ্ধ করা।

দুই. সব ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, আয়েশা (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম মেধাবী নারী। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাধ্যমে ইসলামের বিধিবিধান, বিশেষ করে নারীদের একান্ত বিষয়াদি উম্মতকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

তিন.মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করেছেন ওহীর নির্দেশ অনুসরণ করে। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিয়ে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, দুবার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমি কাপড়ে আবৃতা এবং (জিব্রাইল) আমাকে বলছেন, ইনি আপনার স্ত্রী, আমি ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম। দেখি সে মহিলা তো তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ্ তা বাস্তবায়িত করবেনই। (বুখারী, হাদীস নং : ৩৮৯৫, ৫০৭৮, ৫১২৫, ৭০১১, ৭০১২; মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৩৮)

বিভিন্ন ধর্মে বিয়ের ন্যূনতম বয়স

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আকার-ইঙ্গিত ও ঘটনাপ্রবাহের সূত্র ধরে তা নির্ণয় করারও অবকাশ আছে। ইসলাম ধর্ম মতে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের স্বাধীনভাবে বিয়ে করার অনুমতি আছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান পালন কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয়। প্রাপ্তবয়স হলে মানুষের ওপর শরীয়তের বিধান অর্পিত হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারা যেন (ঘরে প্রবেশের আগে) অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা।' (সূরা নূর, আয়াত-৫৯)

প্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা কী- এ বিষয়ে অবশ্য কিছুটা মতপার্থক্য আছে। উপমহাদেশে প্রচলিত হানাফী মাযহাব অনুসারে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক-বালিকা শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হবে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ই.ফা.খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৭)

এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে : নাফে (রহ.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবনে ওমর বলেন) তিনি [মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাফে রহ. বলেন, আমি খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে গিয়ে এ হাদীস শোনালাম। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। তারপর তিনি তাঁর গভর্নরদের লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স ১৫ হয়েছে, তাদের জন্য যেন ভাতা নির্দিষ্ট করেন। (বুখারী, হাদীস নং : ২৬৬৪, ৪০৯৭; মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৬৮) কিন্তু ইসলাম ধর্ম মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের অভিভাবক যদি তাদের

সন্তানকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তাহলে বিয়ে বৈধ। কিন্তু সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার এখতিয়ার রাখবে, যদি পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দিয়ে থাকে। (হেদায়া : ১/১৯৩)

❑ রোমনা ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে যে, মরিয়ম (আ.) এর বয়স ছিল ১১-১৪ বছর, যখন তিনি ঈসা (আ.)কে জন্ম দিয়েছিলেন।

❑ তাওলাত বা ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুসারে ইসহাক আ. ৪০ বছর বয়সে মাত্র তিন বছরের কন্যাশিশুকে বিয়ে করেছেন। সেখানে আছে- "ইসহাক ৪০ বছর বয়সে রেবেকাকে বিয়ে করেছেন। রেবেকা ছিলেন পদ্দম-ইরাম দেমের সিরীয় বথুয়েলের মেয়ে এবং সিরীয় লাবনের বোন।"(তাওরাত, সৃষ্টি অধ্যায়, ২৫:২০)

ইসহাক (আ.) এর অন্য নাম হলো ইসরাঈল। তাঁর বংশ থেকেই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিধান বিধানশাস্ত্র বিষয়ের গ্রন্থ হলো 'তালমূদ'। তালমূদের সানহাদরীনের বর্ণনা মোতাবেক উপদেশ নম্বার ৫৫ তে উল্লেখ আছে, 'ইহুদীদের জন্য তিন বছরের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ।'

আর তালমুদের খুসুবুসের বর্ণনা অনুযায়ী উপদেশ নম্বার ৫৬-তে উল্লেখ আছে : 'শিশুর ৯ বছর হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহুদীদের জন্য বৈধ।'

তালমূদের বর্ণনাকারী সাঈদ রাবী জুসেফ লিখেছেন : 'এ কথা তোমার কাছে রেজিস্ট্রার করে নাও যে, কন্যাশিশুর বয়স তিন বছর একদিন হলে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।'

বিস্তারিত দেখুন :Neusner, The Talmud of Babylonia, vol. B, Tractate Sanherdrin 1984)

উপমহাদেশে হিন্দুদের সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রধানত মনুর বিধান অনুসারে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, মেয়েদের আট বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে। মুনশাস্ত্রে বলা হয়েছে, *'কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ/ মৃতে ভর্তরি পুত্রস্ত বাচ্যো মাতুররক্ষিতা।'* অর্থাৎ বিবাহযোগ্য সময় (ঋতুদর্শনের আগে) পিতা যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তাহলে তিনি লোকমধ্যে নিন্দনীয় হন। স্বামী যদি ঋতুকালে পত্নীর সঙ্গে সঙ্গম না করেন, তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দার ভাজন হন। স্বামী মারা গেলে পুত্ররা যদি তাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহলে তারাও অত্যন্ত নিন্দাভাজন হয়। (মনুসংহিতা : ৯/৪)

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি কুমারী কন্যা প্রজননযোগ্য ঋতুমতী হয়েও প্রজননকাজে ব্যবহৃত না হওয়া মনুশাস্ত্রের লঙ্ঘন। সে ক্ষেত্রে যথাসময়ে পাত্রস্থ না করার কারণে কন্যার ওপর পিতার অধিকারও খর্ব হয়ে যায়। তাই বলা

হয়েছে, *'পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্ত কন্যামৃতুমতীং হরন্।/ হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং পতিরোধনাৎ'* অর্থাৎ ঋতুমতী কন্যাকে যে বিবাহ করবে, সেই ব্যক্তি কন্যার পিতাকে কোন শুল্ক দেবে না। কেননা সেই পিতা কন্যার ঋতু নষ্ট করছেন বলে কন্যার ওপর তাঁর যে অধিকার, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

(মনুসংহিতা : ৯/৯৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিয়ের বাজারে কন্যার একটা বিনিময় মূল্য আছে, যা অধিকার হিসেবে পিতাই প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু কন্যার ঋতু নষ্ট না করার সঙ্গে তা সম্পর্কিত। তাই সে বিনিময়মূল্য পেতে হলে কন্যাকে ঋতুমতী হওয়ার আগেই বিয়ে দিতে হবে।

বাল্মীকি রামায়ণের তৃতীয় খন্ডের ৪৭শ অধ্যায়ে সীতার বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সীতা অষ্টাদশ বছর বয়োক্রমকালে বিবাহের ত্রয়োদশ বছরে রামের বন গমনকালে তাঁর সঙ্গে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন। পাটিগণিতের সহজ হিসাব মতে, বিবাহের সময় সীতার বয়স পাঁচ/ছয় বছর ছিল। (মোহাম্মদ মহিয়র রহমান, প্রাচীন ভারতে বাল্য-বিবাহ, ১৫শে বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, ১৯৪১)

যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়েশা (রা.) এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি করেন, তারা কিন্তু রাম আর সীতার বিয়ে নিয়ে টু শব্দও করেন না। কারণ কী? কারণ, যাকে দেখতে নারী, তার চরণ বাঁকা।

বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় নারীর বিয়ের বয়স

বিয়ের ক্ষেত্রে দেশ-জাতিভেদে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একজন মানুষ কোন বয়সে বিয়ে করছেন, তা নির্ভর করে ওই দেশের গড় আয়ের ওপর। দেখা যায়, ধনী ও নর্ডিক দেশ বা সুইডেনের মানুষ তিরিশের আগে বিয়ে করেন না। কিন্তু সেন্ট্রাল আফ্রিকায় বিয়ের গড় বয়স ২০। বিভিন্ন দেশে ২০ ২০০৯-২০১৪ সালের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি জরিপ চালানো হয়। এ জরিপের নাম দেওয়া হয় 'মিন সিংগুলেট এজ অ্যাট ম্যারিজ'। সেখানে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের হিসাব মতে, ৩৯ টি দেশের ২০ শতাংশ নারী মাত্র ১৮ বছর বয়সে এবং ২০টি দেশে ১৫ বছর বয়সে বিয়ে করে ফেলেন। আবার দুটো দেশের ১০ শতাংশ পুরুষ মাত্র ১৮তেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন।

আবার পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে নারীদের বিয়ের বয়স বেড়েছে। সত্তর দশক থেকে ২০০০ নাগাদ এ বয়স ২১.৮ বছর থেকে ২৪.৭ এ উন্নীত হয়েছে।

(কালেরকণ্ঠ অনলাইন, ৮ জুলাই ২০১৬) [সূত্র : বিজনেস ইনসাইডার]

এখানে আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় আরবের লোকদের গড় আয়ু ছিল ৪০ থেকে ৬০ বছর। তাই সে সময়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল স্বতঃসিদ্ধ।

১৪০০ বছর তো অনেক দূর, এই গত ১৮৮০ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের দেলোয়ারে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ৭ বছর। মাত্র ১৩০ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত ছিল? দেখুন- ডেনমার্ক-১২, ইংল্যান্ড-১৩, ফ্রান্স-১৩, পর্তুগাল-১২, রাশিয়া-১০,স্কটল্যান্ড-১২, স্পেন-১২, কানাডা-১২, আমেরিকা ফ্লোরিডা-১০, ক্যালিফোর্নিয়া-১০ বছর। লিস্টটা আরো অনেক বড়। আপনি চাইলে এখানে গিয়ে আরো দেখতে পারেন। (http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24)

বর্তমান পৃথিবীতেও এমন বহু দেশ আছে, যেখানে মেয়েদের বেশ কম বয়সে বিয়ে করা হয়। নিচের লিংকগুলোতে দেখুন :

www. answreing-christianity.com/gypsy_girl.htm
www. answreing-christianity.com/thai_girl.htm
www. answreing-christianity.com/aisha.htm#bible_prophets
www. answreing-christianity.com/aisha.htm#mary_age
www. answreing-christianity.com/aisha.htm#osama_bin_zaid
www.answreing christianity.com/aisha.htm#middle_eastern_culture
www. answreing-christianity.com/ aisha.htm#her_parents

তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার লোকেরা ও তাদের কেনা গোলামরা আয়েশা (রা.) এর বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বৈধ পথ বাদ দিয়ে অবৈধ উপায়ে ঠিকই শিশুকন্যাদের ভোগ করছে। পরিসংখ্যান বলছে-

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের শিকার হওয়াদের মধ্যে ৯১ শতাংশ মহিলা ও বাকি ৯ শতাংশ পুরুষ। প্রতি ৩জনে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ১৮ বছরের আগে ৪০ শতাংশ নারী এখানে ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি ১০৭ সেকেন্ডে একজন ধর্ষিতা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১২-১৮ বছর বয়সী ২ লাখ ৯৩ হাজার শিশু-কিশোরীর ধর্ষিত হবার তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে ৬৮ শতাংশ ধর্ষণের রিপোর্ট হয় না। ৯৮ ভাগ ধর্ষকের শাস্তি হয় না। এমনকি কারাগারেও নারীদের স্বস্তি নেই। ২ লাখ ১৬ হাজার নারী প্রতিবছর কারাগারে ধর্ষিত হয়। যুক্তরাজ্যেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বিস্তর। তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৮৫ হাজার মহিলা ধর্ষিতা হন গেট ব্রিটেনে। প্রতি বছর যৌন হয়রানির শিকার হন প্রায় ৪০ হাজার নারী। ইংল্যান্ড এন্ড ওয়ালসে প্রতিদিন ২৩০ জন ধর্ষিত হয়। প্রতি ৫ জন নারীর একজন ১৬ বছরের আগেই ধর্ষিত হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কমবয়সী ও শিশুকন্যার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে

বেশি। সে দেশে ধর্ষণ অপরাধে সাজাও কম। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে মাত্র ২ বছরের জেল দেওয়া হয়। এখানে প্রতিবছর ৫ লাখ ধর্ষণের মামলা হয়। ১১ বছরের নিচেই ১৫ শতাংশ মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ৫০ শতাংশ নারী ১৮ বছরের আগেই নিগৃহীত হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ২০১৫)

শুধু ধর্ষণ নয়, শিশুকন্যাদের বিয়েও রীতিমতো সিদ্ধ আধুনিক পৃথিবীতে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের ৪০ শতাংশ কন্যাশিশুদের বিয়ে হয় ভারতে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখের মতো, যা বিশ্বের মোট বাল্যবিবাহের প্রায় ৪০ শতাংশ।

(ভয়চে ভেলের বরাতে দৈনিক সংগ্রাম : ২৪-১১-২০১৬)

বর্তমান বিশ্বে নূন্যতম কত বছর বয়সের নারীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা বৈধ, দেখুন- মেক্সিকোতে ১২, কুরিয়াতে ১৩, কানাডায় ১৪, সুইডেনে ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা রীতিমতো আইনসিদ্ধ।

বিস্তারিত দেখুন http://www.avert.org/sex-stis/age-of-consent)

এছাড়া আর্জেন্টিনায় ১৩, নাইজেরিয়ায় ১৩, প্যারাগুয়ে ও পেরুতে ১৪, সেনেগালে ১৩, স্পেনে ১৩, পোপের শহর ভ্যাটিক্যান সিটিতে ১২ বছর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা আইনসিদ্ধ। (বিস্তারিত দেখন :http://chartsbin.com/vies/hxj)

বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের বিয়ের বয়স

১৯ শতকেও বাঙালি নারীদের ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়া হতো। বাঙালির বিয়ের ইতিহাস বিষয়ে 'বাংলাপিডিয়া' লিখেছে : '১৯২১ সালের আদমশুমারিতে বিয়ের গড় বয়স মেয়েদের ১২ এবং ছেলেদের ১৩ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (Child Marriage Restraint Act) পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচের পাত্রী এবং ১৮ বছরের নিচের পাত্রের বিবাহ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' (বিবাহ, বাংলাপিডিয়া)

কিন্তু তার পরও কি কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বন্ধ হয়েছে? সে বিয়ে কি পিতা-মাতার অসম্মতিতে বা আইনের বাইরে গিয়ে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই, ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ে এবং একই বয়সের ৫ শতাংশ ছেলের বিয়ে হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ মেয়েরই বিয়ে হয় ১৫ বছরের কম বয়সে আর শতকরা দুই ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১১ বছরের কম বয়সে।' সেব দ্যা চিলড্রেন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৬৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।' (ইত্তেফাক ২০ ডিসেম্বর-২০১৫)

'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' নামে একটি বই লিখেছেন কট্টর সেক্যুলার গোলাম মুরশিদ। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের বিয়ে কত বছর বয়সে হতো? তিনি লিখেছেন, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা) বিয়ে করেছিলেন পনেরো বছর বয়সে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি সে যুগের তুলনায় খুব আধুনিক থাকলেও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে, পাত্রীর বয়স ছিলো এগারো।'

বাঙালি জাতির সবচেয়ে প্রাগ্রসর শিক্ষাবিদ হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়, তারা কত বছর বয়সী নারীদের বিয়ে করেছিলেন? ড. মুরশিদ লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বিয়ে করেছিলেন, তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। দেবেন্দ্রনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রীর বয়স ছিল ছয় বছর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর বয়স ছিল সাত বছর, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীর বয়স ছিল আট বছর, কেশব সেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ৯, শিবনাথ শাস্ত্রীর দশ আর রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো বছর। (দেখুন : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-২২০)

যারা আয়েশা রা. এর বিয়ের বয়স নিয়ে আপত্তি করেন, তাদের অনেকের কাছে রবীন্দ্রনাথ দেবতাতুল্য। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে সব ক্ষেত্রে আদর্শ পুরুষ। তিনি কিন্তু ২৩ বছর বয়সে মাত্র ১১ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ড. গোলাম মুরশিদই সে তথ্য উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার বিয়ে কত বছর বয়সে হয়েছিল? ১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নামে পরিচিত হন। তার স্বামীও মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। (http://www.manobkantha.com/2013/12/09/150194.html)

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর বয়সে। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালে, তাঁর বিয়ে হয়েছে ১৯৬০ সালে। (দেখুন : বাংলাপিডিয়া ইংরেজি সংস্করণ-
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Ziz%2c_Begum_khaleda)

সম্প্রতি আমাদের দেশে একই আইন হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার বয়স ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে ন্যূনতম ১৩ বছর হতে হবে। (কালেরকণ্ঠ : ৯ নভেম্বর, ২০১৬)

১৩ বছর বয়সেই যদি কেউ যোদ্ধা হতে পারে, দৈহিক মিলন করার জন্য কি তার বয়স ১৮ বা ২১ হতে হবে? বিয়ে বা দৈহিক মিলন কি যুদ্ধের চেয়েও কঠিন কাজ? না কঠিন কাজ না। তাই তো জাতিসংঘ ও তার দোসররা ১৮ বছরের

আগে মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আপত্তি করলেও এ বয়সের মেয়েদের 'লাভ' অবৈধ দৈহিক মিলন ও ' ফ্রেন্ডশীপ'- এর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা আরো করে না।

এর ফলে প্রকারান্তরে অবাধ যৌনাচার, বেলাল্লাপনা ও লিভটুগেদারের প্রতি যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। উপমহাদেশে ১৮৬০ সালে এজ অফ কন্সেন্ট আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয় ১০। ১৮৯২ সালে এই বয়স বেড়ে দাঁড়ায় ১২। ১৯২৯ সালে এটা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ১৪। ১৯৫৫ সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ বছর। সে আইন এখনো বলবৎ আছে। তার মানে যুগে যুগে নারীদের গড় আয়ু ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে পরের আইনের আলোকে আগের আইনসিদ্ধ বিষয়কে বিচার করা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও জ্ঞানপাপীতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধরুন, আজ আপনি ২১ বছর বয়সে একটি ১৮ বছরের মেয়েকে বিয়ে করলেন। ঠিক ১০০০ বছর পর আইন হলো যে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২৮ আর মেয়েদের ২৫। তখন কি ৩০১৬ সালের মানুষ আপনাকে- বাল্যবিবাহ আইন ভঙ্গ করেছেন- এমন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারবে? কেন পারবে না? যদি না পারে, তাহলে আপনি কেন ১৪০০ বছর আগের আইনের আলোকে সংগঠিত হওয়া আয়েশা রা. এর বিয়ে নিয়ে চিল্লাচিল্লি করছেন?নতুন আইনের আলোকে কেন পুরনো আইনের বিষয়কে বিচার করছেন? উদ্দেশ্য কী?

নাস্তিকদের মাথা গরম হয়েছে, তাই তাদের মাথা ঠান্ডা করলাম এই সকল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান দিয়ে। আমাদের নবী আয়েশা (রা.) কে বিয়ে করেছিলেন। তাদের মতো বিবাহ ছাড়া কুকুরের মতো জীবন যাপন করেননি।

খৃষ্টধর্মেও রাসূল অবমাননা ও মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড

'তথাকথিত মানবাধিকারের ঝান্ডাবাহী ও নাস্তিকদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন হল, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব চিৎকার করছ যে, গোস্তাখে রাসূলের সাজা মৃত্যুদন্ড মানবাধিকার পরিপন্থী। মানলাম তা মানবাধিকার পরিপন্থী। কিন্তু যখন কৃত্রিম ঈসা সাজার কারণে ডেভিড কোরেশকে তার ৯৬ জন অনুসারীসহ জীবন্ত আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল, তখন তোমরা মানবাধিকারের ঠিকাদাররা কোন আওয়াজ করেছিলে কি? একটুও না। তোমরা তখন টু শব্দটুকুও করোনি। আমেরিকানরা আর মানবাধিকার বাদীরা যদি একজন কৃত্রিম ঈসাকে বরদাশত করতে না পারে, তাহলে মুসলমানরা কিভাবে চুপ থাকবে তাদের নবীকে গালাগালি করলে। (সাপ্তাহিক খতমে নবুওয়াত, করাচি-২৯, সংখ্যা ৬/১২)

"১৩তম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ছোট একজন পাদ্রি যখন জনৈক ইহুদী নারীকে বিয়ে করার জন্য খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করেছিল, তখন তাকে অক্সফোর্ডে ১৭ই এপ্রিল ১২৩২ খৃ. আগুনে জ্বালিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।" (এনসাইক্লোপেডিয়া রিলিজন এন্ড এ থেক্স, খ-৬)

তাওরাতে মুরতাদের সাজা মৃত্যুদন্ড :

"যদি তোমার আপন ভাই, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী বা তোমার বন্ধু, হয়তো সে তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, গোপনে তোমাকে স্খলিত করার চেষ্টা করে এবং বলে, আজ অন্য মাবুদের বন্দেগী কর... তাহলে কস্মিনকালেও তার আনুগত্য করবে না, তার কথা শুনবে না।, তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবে না, বরং তুমি নিজেই তাকে হত্যা করে দিবে। তাকে হত্যা করার জন্য প্রথমে তোমর হাত অগ্রসর হতে হবে, পরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হাত বাড়বে; তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।" (ইসতেছনা- ১৩/১০৫)

বৃটেনে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার সাজা মৃত্যুদন্ড। বৃটেনের সীমানার বাইরে অবস্থানরত কোন বৃটিশ নাগরিক (চাই সে জন্মসূত্রে নাগরিক হোক বা অন্য কোন সূত্রে) যুদ্ধাবস্থায় এই অধিকার রাখে না যে, সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে বৃটিশ নাগরিকত্ব বর্জন করে এমন কোন জাতির সহযোগিতা করবে, যারা বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত। এই কাজ বৃটিশ আইনে গুরুদ্রোহ (high treason) বা মহা বিশ্বাসঘাতকা, যার সাজা মৃত্যুদন্ড।

বৃটেনের কোন নাগরিক যদি বৃটেনের ভিতরে অথবা বাইরে কোন বাদশাহর দুশমনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, অথবা দুশমনদের কোনভাবে সাহায্য করে অথবা এমন কোন কাজ করে, যা তার দুশমনদের শক্তি বৃদ্ধি করে বা বাদশাহ কিংবা দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি তাতে দুর্বল হয়, তাহলে তাও গুরুদ্রোহ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সাজাও মৃত্যুদন্ড। এমনিভাবে বাদশাহ, রানী বা কোন প্রশাসককে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে, (হত্যা না করলেও) বাদশাহর স্ত্রী বা মেয়ের সম্মানহানী করলে, বাদশাহর দিকে অস্ত্র তাক করলে, তাকে হত্যা বা ভীতসন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্য, অস্ত্র নিয়ে তার কাছে গেলে, রাষ্ট্রের ধর্ম পরিবর্তন করার কিংবা আইন পরিবর্তন করার জন্য বলপ্রয়োগ করলেও তা গুরুদ্রোহ হিসেবে গণ্য হয় এবং তার সাজা মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। (মুরতাদ কি সাজা, পৃ. ৫৫-৫৬)

"তাদের কি তাহলে জানা নাই যে, বৃটেন আমেরিকাসহ বিভিন্ন সেক্যুলার রাষ্ট্রেও তাওহীনে মাসীহের আইন বলবৎ আছে? তাওরাতের আইন অনুযায়ী তো মাসীহ আ. এর পূর্বেকার নবীদের অবমাননার আইন ও 'সঙ্গেসার' তথা পাথর নিক্ষেপকরত মৃত্যুদন্ড রয়েছে। ইঞ্জিল গীর্জার আইনেও তো ঈসা আ.কে

অবমাননার সাজা মৃত্যুদন্ড নির্ধারিত। স্কটল্যান্ড ও রাশিয়ায়ও ১৮ তম শতাব্দী পর্যন্ত তাওহীনে মাসীহের সাজা মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিজম আসার পর যদিও তাওহীনে মাসীহের সাজা হিসেবে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়েছে, কিন্তু ঈসা মাসীহের পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধাচরণকারীকেই নয় শুধু; বরং তার সঙ্গে মতানৈক্য পোষণকারীকে পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে, চাই সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। স্টালিন যেভাবে নির্দয়তার সঙ্গে তার বিরোধীদেরকে হত্যা করেছেন, রুশ সম্রাটের ধর্মীয় শাসনেও তার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। ঈসা মাসীহকে নিয়ে অবমাননার সাজা ইংল্যান্ডের কমনল'তে এখনো বিদ্যমান এবং ব্লাসফেমি এ্যাক্টের অধীনে প্রশাসন একজন নাগরিক থেকে তার যে কোন অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে।" (সাপ্তাহিক খতমে নবুওয়াত, করাচি- নং ১২, সংখ্যা-২৯)

প্রশাসন যখন নাগরিকের যে কোন ধরণের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার মত অমানবিক আইন করে, তখন বৃটেনের মানবাধিকার কমিশনগুলো মুখে আঁটি দিয়ে বোবা হয়ে মানবতার সঙ্গে উপহাস করে। আর যখন রাসূলকে নিয়ে কোন মানবরূপী পশু তাঁর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যাচার করে, তাকে গালি দেয় এমন নরপশুর শাস্তি বিধান করে, তখন সেই হারামিরা বিরোধীতা করে।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী কর্তৃক গোস্তাখে রাসূলের সাজা

৫৭৭ হিজরীতে, সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর যমানায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারকে সুড়ঙ্গ করার হীন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে দিলেন। বাদশাহ নূরুদ্দীন স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত লাভ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই নীল চক্ষুধারীর প্রতি ইশারা করে বললেন, তাদের থেকে আমাকে হেফাজত কর। সুলতান খুব পেরেশান হলেন। উঠে অযু করলেন এবং নফল নামায আদায় করে আবার ঘুমালেন। এবারও একই স্বপ্ন দেখলেন। এভাবে একই ঘটনা তিনবার ঘটল। এবার মন্ত্রী জামালুদ্দীনের পরামর্শে তৎক্ষণাৎ মদীনায় রওয়ানা দিলেন। স্বপ্নের ষোলতম দিনে মদীনায় পৌঁছলেন। রিয়াজুল জান্নায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারি।

অবশেষে মন্ত্রী ঘোষণা করলেন, সুলতান মদীনায় এসেছেন। তিনি মদীনাবাসীকে পুরস্কৃত করবেন। একে একে সবাই এসে তার অংশ নিয়ে গেল। সুলতান নিজেই পুরস্কার দিতে থাকলেন এবং খুব ভালো করে খেয়াল করতে লাগলেন, স্বপ্নে যেই লোকদেরকে দেখানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কারো মিল পাওয়া যায়

কিনা। কিন্তু একে একে মদিনার সব মানুষ চলে গেল, কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া গেল না। বাদশাহ্ বার বার খোঁজ নিলেন এবং বললেন, এখনও কেউ থেকে গেলে তাকে যেন উপস্থিত করা হয়। এক পর্যায়ে বাদশাহকে খবর দেয়া হল, শুধু দুইজন পশ্চিমা নাগরিক আছেন, যারা অত্যন্ত মুত্তাকি, পরহেযগার এবং তারা নির্জনতা অবলম্বন করে সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল। বাদশাহ তাদেরকেও তলব করলেন এবং এক নজর দেখামাত্র চিনতে পারলেন, এরা কারা এবং এরা কেন এখানে পড়ে আছে।

তারা বলল, আমরা পশ্চিমা দেশের নাগরিক। হজ্ব করতে এসেছিলাম এবং রওজা যিয়ারত করতে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশিত্বের শখে এখানেই থেকে গেলাম। বাদশাহ তাদেরকে ওখানেই রেখেই তাদের বাসস্থানে গেলেন, যা নিকটেই একটি সরাইখানা ছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে সন্দেহজনক কোন কিছু না দেখে বাদশাহ্ আরো পেরেশান হলেন। মদিনাবাসীরাও তাদের অনেক সাফাই গাইল। তারা অত্যন্ত পরহেযগার, সবসময় রিয়াজুল জান্নায় নামায আদায় করে, দৈনিক জান্নাতুল বাকিতে যিয়ারত করে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, দিনে রোযা রাখে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব শুনে বাদশাহ পেরেশান হলেন। হঠাৎ বাদশাহর মনে কি যেন খেয়াল আসল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের জায়নামায উঠালেন। জায়নামাযটি ছিল একটি পাথরের উপর। পাথর সরানোর পর একটি সুড়ঙ্গ দেখা গেল, যা রওজা শরীফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এবার বাদশাহ তাদের এই অপকর্মের হেতু জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা মূলত নাসারা। আমাদেরকে খৃস্টান বাদশাহ অনেক বড় অংকের সম্পদ দিয়ে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছে যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায় প্রবেশ করে, তার শরীর মোবারক চুরি করে নিয়ে যাব। তারা সারা রাত সুড়ঙ্গ খনন করত এবং মটকায় করে মাটি নিয়ে জান্নাতুল বাকির বর্ধিত অংশে ফেলত। সুলতান নূরুদ্দীন এই কথা শূনে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবেগআপ্লুত হলেন এই ভেবে যে, আমাকে এই মহৎ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এরপর সকালে দুই নাসারাকে মৃত্যুদন্ডের রায় করে হত্যা করলেন এবং বিকালে তাদের নাপাক লাশগুলো আগুনে জ্বালিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর বিচক্ষণ এই বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরার চারদিকে অনেক গভীর থেকে উপর পর্যন্ত অত্যন্ত মজবুত করে ঢালাই করে দিলেন, যাতে আর কোন কমবখত অভিশপ্ত এমন হীন চক্রান্ত করার সুযোগ না পায়। (আয়েনায়ে হজ্জ ওমরাহ ও যিয়ারত, পৃ. ১৭২)

সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক রাসূল অবমাননাকারীর সাজা

কুলাঙ্গার প্রিন্স কার্ক রেজীনাল্ড, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা ও কাবা শরীফ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আরবে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। আক্রমণ করার জন্য সে যখন সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়েছে, মুসলমানরা তখন মোকাবেলার জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছেন। তারা মুসলমানদের দেখে, প্রথমেই ঘাড়বে গেল এবং জাহাজ ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। মুসলিম সেনারা তাদেরকে পাহাড় ও বাগান থেকে ধরে এনে টুকরো টুকরো করে দিলেন। রাসূলের অবমাননাকারী রেজীনাল্ডের মত বেয়াদব অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

রেজিনাল্ড ১১৭৯ ইং মুসলমানদের একটি কাফেলা লুট করল এবং কাফেলার সবাইকে বন্দী করল। মুসলিম বাদশাহ তার এই কর্মকান্ডের আপত্তি করলেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদ ও মুসলিম কাফেলার মুক্তির জন্য দূত পাঠালেন। রেজীনাল্ড তা না করে উল্টো তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল। ১১৮৩ ইং সালে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। এরপর ১১৮৬ ইং মুসলিম ব্যবসায়ী কাফেলা লুট করে, তাদের সকলকে গ্রেফতার করল। তারা যখন তার কাছে মুক্তি চাইল, তখন সে তাদেরকে বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিয়ে বলল, তোমরা তো মুহাম্মদের উপর ঈমান রাখ। তো তাকে কেন বল না, তোমাদেরকে এসে মুক্ত করে নিতে। বাদশাহ সালাউদ্দীন আইয়ূবি যখন রেজীনাল্ডের এই গোস্তাখিপূর্ণ কথা শুনলেন, তখন তিনি কসম করে বললেন, আল্লাহ যদি চান, তবে আমি এই চুক্তি ভঙ্গকারী গোস্তাখকে আমার নিজ হাতে হত্যা করব। শুরু হল ক্রুশেড যুদ্ধ। এক পর্যাযে ফিরিঙ্গিরা পরাজিত হল এবং তাদের বাদশাহ ও যুবরাজকে বন্দী করে সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ূবির কাছে আনা হল।

সালাউদ্দীনকে দেখামাত্র রেজীনাল্ডের সব অপকর্মের কথা মনে পড়ল এবং ভয়ে কলিজার পানি শুকিয়ে গেল। সালাউদ্দিনও তার কসমের কথা মনে করলেন এবং একে একে তার অপকর্মগুলোর ফিরিস্তি শোনালেন। এরপর বললেন, এবার আমি মুহাম্মাদের সাহায্য নিচ্ছি। এই কথা বলেই তার মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তারপর বললেন, মুসলমানদের এমন কোন নীতি নেই যে, আমরা অযথাই একজনকে হত্যা করব। রেজীনাল্ডকে তো সীমালঙ্ঘন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বেয়াদবী করার কারণে হত্যা করা হয়েছে। (ইবনে কাছীর ১১/৮২)

রাসূলকে নিয়ে কটূক্তিকারী পাদরি ইসহাকের উচিত শিক্ষা

ইসহাক কর্ডোরার খৃস্টান পরিবারের সন্তান। আরবী ভাষা খুব ভালো জানত। অল্প বয়সেই আমির আব্দুর রহমানের দরবারে মুনশির চাকরি পেল। ২৪ বছর বয়সে দুনিয়াদারী সবছেড়ে মাসিহী খানকায় নির্জনতা ধ্যানমগ্নতা অবলম্বন করল। সেখানে কট্টরপন্থী পাদরিদের বই পড়ার কারণে তার মনে এই আগ্রহ জাগল যে, জীবন দিয়ে হলেও সে অনেক বড় বুযুর্গী অর্জন করবে। একদিন খানকা থেকে বের হয়ে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতির সামনে এসে বলল, আমি আপনার ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। দয়া করে আমাকে নির্দেশনা দিন। বিচারপতি খুশি হয়ে তাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবার সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ আরম্ভ করল। বিচারপতি সাহেব তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তখন তাকেও গালাগালি করল। বিচারপতি তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। আমির আব্দুর রহমান ফরমান জারি করলেন, তাকে ফাঁসি দেয়া হোক। ফাঁসি দেয়ার পর কয়েকদিন মাথা নিচের দিকে দিয়ে তার লাশ ঝুলিয়ে রেখে পরে জ্বালিয়ে ছাইগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হোক। (ইবরতনামা উন্দুলুস, পৃ. ৪৭৯)

মোগল শাসনামলে গোস্তাখে রাসূলের সাজা মৃত্যুদন্ড

কাজি আব্দুর রহীম শায়েখ (ফিজাস্টিস শায়েখ আব্দুল গণী) এর নিকট একটি আবেদন করে চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি লিখেছেন, এখানে মুসলমানরা একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেছে। কিন্তু এক দাম্ভিক ব্রাহ্মণ সকল নির্মাণ সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে মূর্তিখানা নির্মাণ শুরু করেছে। আমি যখন তাকে আদব দেয়ার ব্যবস্থা করলাম তখন সে জনসম্মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দ শুরু করল এবং মুসলমানদেরকেও অনেক অপমান করল। শায়েখ আব্দুল গনি তাকে তলব করলেন, কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করল। তারপর বাদশাহ আকবর, বীরবল ও শায়েখ আবুল ফযলকে পাঠালেন এবং তারা তাকে নিয়ে এলেন। শায়খ আবুল ফযল মানুষের কাছ থেকে যা শুনেছেন, তার ভিত্তিতে তিনি বললেন, সে যে গালাগালি করেছে একথা প্রমাণিত হয়েছে। তখন তার শাস্তির বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। কেউ তাকে হত্যা করার তাগিদ করলেন, আবার কেউ তাকে তাযির ও জরিমানা করার প্রতি জোর দিলেন। আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। শায়েখ আব্দুল গণি তাকে হত্যা করার জন্য বাদশাহকে বারবার অনুরোধ করলেন। কেননা রাসূলদেরকে গালি দেয়ার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু বাদশাহ সুস্পষ্ট কোন অনুমতি না দিয়ে বললেন, এটা শরীয়তের মাসআলা। এর সিদ্ধান্ত দেয়া আপনাদের উলামায়ে

কেরামের কাজ। আমাকে কী জিজ্ঞাসা করেন? এই বিতর্কে দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ কারাগারেই পড়ে থাকল। এদিকে রাজমহলের (হিন্দুবংশের) বেগমরাও তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগল।

বাদশাহ শায়েখকে খুব মূল্যায়ন করতেন। এজন্য তিনি তাকে মুক্তিও দিচ্ছিলেন না। শায়েখ বরাবরের মতো আবার যখন তাকে হত্যার নির্দেশ চাইলেন, তখনও বাদশাহ আগের মতোই স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তো আগেই আপনাদের বলে দিয়েছি, আপনারা শরীয়তের দৃষ্টিতে যা সঠিক মনে করেন তাই করেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে শায়খ ঐ গোস্তাখে রাসূল ব্রাহ্মণের হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল। (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ)

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করার অপরাধে পাকিস্তানে খৃস্টানদম্পতির মৃত্যুদন্ড

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষকরে মোবাইল ফোন থেকে টেক্সস মেসেজ পাঠানোর অপরাধে পাকিস্তানের এক খৃস্টান দম্পতিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। শাফকাত ইমানুয়েল ও শাগুফতা কাউসার নামীয় উক্ত খৃস্টান দম্পতি স্থানীয় মসজিদের ইমামের কাছে উল্লিখিত টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ইসলামের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি তথা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বা ইসলামের যে কোন বিষয় বা রীতিনীতি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ পাকিস্তানে। এ জন্য সেখানে কঠোর ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা আন্তর্জাতিক খৃস্টান-ইহুদী মহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনের কার্যকারিতা বহাল থাকায়।

অসভ্যতাকে সভ্যতা বলে চালানোর যেকোন প্রয়াস সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে

আদর্শ পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা মানব শিশু আর অভিভাবকহীন পথশিশুর মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। মা-বাবার নিবিড় পরিচর্যায় একটি মানবশিশু ধীরে ধীরে সভ্য, ভদ্র ও পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষে পরিণত হয়, অপরদিকে মা-বাবার স্নেহ বঞ্চিত অভিভাবকহীন শিশু যথাযথ পরিচর্যার অভাবে অসভ্যতা ও অভদ্রতার চরম সীমায় উপনীত হয়। এ কথাটি একটি মানবশিশুর ক্ষেত্রে যতখানি সত্য, তার চেয়ে অধিক সত্য একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। যে রাষ্ট্র ও সমাজ সকল কাজে মহান স্রষ্টার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে অভিভাবকহীন পথশিশুর মত পরিচালিত হয়, তা এ পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট অসভ্য বর্বর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চলমান বিশ্বে এরকম অসভ্য বর্বর রাষ্ট্রের জ্বলন্ত উদাহরণ মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও তার নীতিতে বিশ্বাসী বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ। এ মন্তব্যে হয়ত অনেকে আঁৎকে উঠবেন। বিশেষতঃ যারা অর্থশক্তি, সমরশক্তি ও প্রযুক্তির বিচারে যুক্তরাষ্টকে উন্নত রাষ্ট্রের মডেল মনে করেন, এ মন্তব্য তাদের মনে হয়ত চরম বিস্ময়ের উদ্রেক করবে, কিন্তু মন্তব্যটি যে শতভাগ যথার্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান আমেরিকার দুএকটি উদাহরণই এর যথার্থতা প্রমাণে যথেষ্ট।

ওবামা প্রশাসনের প্রথম পর্বে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বেহায়ার সুরে ঘোষণা করেন, "যুক্তরাষ্ট্র সরকার নারী-পুরুষের সবধরণের যৌনসম্পর্ককে সমর্থন করে, পুরুষের সাথে পুরুষ, নারীর সাথে নারী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ যে কারো সাথে যে কোন উপায়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।" এই পাশবিক যৌন সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি ৩০ লাখ ডলার অনুদানও ঘোষণা করেন। নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক নিয়ে হিলারি ক্লিন্টন যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি বর্ণনা করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, অভিভাবকহীন পথশিশু যেমন বড় হয়ে লম্পট হয়, যাচ্ছেতাই করতে পারে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের সকল নারী-পুরুষ লম্পটের মত যাচ্ছেতাই করতে পারবে। তাতে রাষ্ট্র কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করবে না। অসভ্য বর্বর জংলী রাষ্ট্র হতে এর বেশি আর কিছুর দরকার আছে কি?

নিউইয়র্কসহ আমেরিকার অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদে সমকামী বিবাহ আইন পাশ হয়েছে অনেক আগে। এমনকি স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও গত নির্বাচনের পূর্বে সমকামীদেরকে ভোট বাগাতে সমকামী বিবাহের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মার্কিন কোর্টও পিছিয়ে নেই। হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্টসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালতও প্রবল উৎসাহে সমকামীতার পক্ষে রায় দিয়েছে। যে দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, আইন পরিষদ ও সর্বোচ্চ আদালত সমকামীতার মত মানবতা বিরোধী একটি জঘন্য বর্বর বৃত্তিকে বৈধতা দেয়, সে দেশ যে কত অসভ্য বর্বর তা সহজেই অনুমেয়।

যে নিজেই পথহারা সে অপরকে পথ দেখাবে কি করে?যে নিজেই অসভ্য বর্বর, সে অপরকে সভ্যতা শেখাবে কি করে? যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক বন্ধন এখন এতই ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর যে, সে সমাজের মানব সদস্যগুলো জরাজীর্ণ দালানের ভগ্ন ইটের মত ঝরে ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বেকারত্ব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘোর অমানিশায় যুব সমাজের চোখে মুখে ভর করেছে চরম হতাশা। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে পড়ন্ত বয়সে এসে অসংখ্য নারী-পুরুষ আজ আশ্রয়হীন। হৃদয়ে প্রশান্তির অনাবিল পরশ যেন কত জনম ধরে উধাও হয়ে গেছে। তাই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানবতা আত্মহত্যার মধ্যেই খুঁজে ফিরছে শান্তি।

প্রতিদিন আত্মহত্যার মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এমন একটি দেশ যদি সামরিক শক্তির বলে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এমতাবস্থায় মুসলিম দেশগুলোকে কান্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আমেরিকার অন্ধ অনুকরণের কুৎসিত প্রতিযোগিতার ছেদ টানতে হবে। মহান স্রষ্টা প্রদত্ত বিশ্বজয়ী নির্মল আদর্শের ধারকবাহক হয়ে অসভ্য বর্বর দেশের বর্বর সভ্যতার পিছনে ছুটে বেড়ানো মুসলিম বিশ্বের জন্য খুবই অবমাননারক। এই সত্যকে এখনই উপলব্ধি করতে হবে। মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে অভয় দিয়ে বলছেন- "পৃথিবীর কোন শক্তিকে তোমরা ভয় পেও না। তোমরা যদি আমার ক্ষমতায় বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের কোন ভয় নেই। কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তোমরা আমাকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে নিতে পার তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।"

আমরা যদি আল্লাহর এ আহ্বানের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হই, তাহলে বুঝতে পারবো যে, পৃথিবীর কারো কাছে আমাদের পাওয়ার মত কিছু নেই বরং আমেরিকাসহ পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীকে দেবার মত সবকিছুই আমাদের কাছে আছে।

ইউরোপ আমেরিকার ইহুদী-খৃস্টান সম্প্রদায় নিজ হাতে ওদের ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করেছে। ফলে ওরা জানে না ওদের স্রষ্টা কে? স্রষ্টাকে দূরে রেখে ওরা যীশুকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছে। অথচ সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষও জানে যে, মানুষ কখনো স্রষ্টা হতে পারে না। এই ভাবে ওরা সঠিক ধর্ম বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে। যেহেতু ওদের সাথে স্রষ্টার কোন সম্পর্ক নেই, তাই ওরা অভিভাবকহীন। অভিভাবকহীন মাস্তান যুবক যেমন অপরাধ জগতের সম্রাট হয়, অপরাধই তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়, তেমনি স্রষ্টাহীন খৃস্টজাতি অপরাধকেই তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। যার ফলে এহেন কোন অপরাধ নেই যা তাদের সমাজ সভ্যতার অংশ নয়। এ কারণেই সমকামিতা, ব্যভিচার, জারজ সন্তান উৎপাদন, পতিতাবৃত্তি, উলঙ্গপনা, নগ্নতা, মদ, জুয়া, পর্নোগ্রাফি, নগ্নতাসর্বস্ত খেলাধুলা সবই তাদের সমাজ সভ্যতার অংশ।

কিন্তু মুসলিম জাতিতো অভিভাবকহীন নয়, তারা তো এক আল্লাহয় বিশ্বাসী। তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন দেড় হাজার বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে রেখে গেছেন এখনো আছে ঠিক সেভাবেই। তাই কোন অপরাধই মুসলিম জাতির কাছে প্রশ্রয় পায় না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অপরাধ একজন মুসলমানকে দগ্ধ করে। বাংলাদেশের মুসলিম মন্ত্রী ধূমপান করার অপরাধে

অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। অথচ আমেরিকার খৃস্টান প্রেসিডেন্ট তার অফিসের মহিলা কর্মচারী মনিকার ইজ্জত লুণ্ঠন করে অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা অপরাধই মনে করেননি। কারণ, তারই স্ত্রী হিলারী ঘোষিত নীতি হচ্ছে- 'আমেরিকায় যে কেউ যে কারো সাথে যে কোন উপায়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ।' এহেন অবস্থায় মুসলিম দেশের কোন সরকার যদি দেশ পরিচালনায় আমেরিকার নীতি অনুসরণ করে, তাহলে সে দেশ অল্পদিনের ব্যবধানে সকল অসভ্যতাকে সভ্যতা বলতে শুরু করবে। শংকার বিষয়, দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে এমন একটি অসভ্য শ্রেণী গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে, যারা চোখ বন্ধ করে, আমেরিকার সকল অসভ্যতা, বর্বরতা, নগ্নতা, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার ইত্যাদিকে সভ্যতা সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করে নিবে। সচেতন দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং এ জাতীয় যে কোন অপপ্রয়াস সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে।

তৌহিদী জনতার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ধর্মদ্রোহী নাস্তিকচক্র খড়কুটার মত ভেসে যাবে

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে ধর্মের কর্তৃত্ব পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃস্টানরা একটি মতবাদ আবিষ্কার করে। সে মতবাদের নাম সেক্যুলারিজম। ৭১ এ দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের সংবিধানে এই সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় সংস্করণে সেক্যুলারিজমের তরজমা করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এ তরজমা যথার্থ নয়। সেক্যুলারিজমের যথার্থ তরজমা হচ্ছে- রাষ্ট্রের সকল নীতি-আদর্শ ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। তার মানে সেক্যুলারিজম তথা ধর্মহীন চেতনাকে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার মাশুল হিসাবে প্রতিবেশী ভারত বিনা বাধায় দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের কাঁধে এই ধর্মদ্রোহী মতবাদ চাপিয়ে দেয়। তখন থেকেই এই ধর্মহীন চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস শুরু হয়।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যে দেশের ৯০% মানুষ আপদমস্তক ইসলামের বিশ্বাসী। ধর্মের সাথে যাদের সম্পর্ক প্রাণের চেয়ে অধিক। যে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। সেই দেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কিনা খৃস্টানদের রচিত ধর্মহীন সেক্যুলারিজম! না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। সেক্টর কমান্ডার জেনারেল জিয়া, মেজর জলিলসহ লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা এটা মানেন নি। এজন্যই পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা ধর্মহীনতার পরিবর্তে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানে স্থাপন করেছিলেন। এজন্যই সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম

কায়েমের রাজনীতি করেছেন। এজন্যই খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কোন মানুষ যদি বানর সাজতে চায় তাহলে অবশ্যই সে মনুষ্য বৈশিষ্ট্য পরিহার করে বানরের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করবে। অনুরূপ কোন মুসলমান তখনই সেক্যুলার হতে পারে, যখন সে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করে ধর্মহীন বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো- মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ঘোষণা করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মাথা পেতে নেয়া।

আর ধর্মহীন সেক্যুলার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হলো- জীবন ও জগতের প্রতিটি কাজে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাঁর প্রতিটি নির্দেশকে অমান্য করা। জীবন ও জগতের সকল কাজে আল্লাহর নির্দেশকে অস্বীকার করাই যেহেতু সেক্যুলার মনস্ক হবার প্রধান শর্ত, তাই আচার আচরণে, কথা-বার্তায় ধর্মের সকল বিষয়ের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করাই হয়ে দাঁড়ায় তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এই কর্তব্য বোধ থেকেই স্বাধীনতা পরবর্তী সেক্যুলার সরকার ঢাকা ভার্সিটির মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইলমা'-ঝেটিয়ে বিদায় করেছিলো। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামের শেষাংশ ইসলাম হওয়ায় এ নামটিও তারা সহ্য করতে পারেনি। তাই 'কবি নজরুল ইসলাম কলেজ' থেকে ইসলাম শব্দটিকে ঝেটিয়ে বিদায় করে নাম রাখে 'কবি নজরুল কলেজ'।

শুধু কি তাই! মুসলিম নামটিও তাদের সহ্যের বাইরে। তাই 'স্যার সলিমউল্লাহ মুসলিম হল' থেকে মুসলিম শব্দটি ঝেটিয়ে বিদায় করে নাম রাখে 'স্যার সলিমউল্লাহ হল'।

সেই নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতিতেই জন্ম নিয়েছে এমন এক তরুণ প্রজন্ম যারা নাস্তিক পরিচয়ে গর্ববোধ করে এবং সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মঞ্চ নির্মাণ করে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণে মেতে ওঠার সাহস দেখায়।

ইসলামী সরকারের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, আমার অনুগত মুসলিম জাতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বাগ্রে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করবে, আল্লাহর বিধান জারি করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে। তাই তো ইসলামের প্রথম খলিফা হযতর আবু বকর রা. তার খেলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারীদের কঠোর হস্তে দমন করেছেন। হযরত ওমর রা. এর প্রথম রাষ্ট্রীয় ফরমান ছিল নামায ভিত্তিক। তিনি

বলেছিলেন, এ রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মুসলিম জনগণের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নামায। কারণ নামাযে অবহেলাকারীরাই মানুষের অধিকার হরণ করে। এখানে কুরআনের উদ্বৃতি, হযরত আবু বকর ও ওমর রা. এর কার্যধারায় একজন মুসলমানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে, এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে কারো পক্ষে সেক্যুলার হওয়ার কোন অবকাশ আছে কি? একজন সেক্যুলার ধর্মকে মনে করে তার প্রধান প্রতিপক্ষ। পক্ষান্তরে একজন মুসলমানের কাছে ধর্ম তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ইসলামী সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে সকল ধর্মদ্রোহী তৎপরতা নির্মূল করে, অথচ সেক্যুলার সরকার ইসলামকে নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মদ্রোহী শক্তি সৃষ্টি ও লালন করে। সেক্যুলার সরকারের কাছে ধর্মদ্রোহী নাস্তিকরা পায় বীরের মর্যাদা আর আলেম-উলামা ও মুসলিম জনতাকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়া হয়। বস্তুত, আগুন আর পানি যেমন একত্রিত হতে পারে না, তেমনি ইসলাম আর সেক্যুলারিজমের সহাবস্থানও কখনো সম্ভব নয়।

ইসলাম এ পৃথিবীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই যার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ নেই। তাহলে কী কারণে ইসলামকে বাদ দিয়ে শত্রুদের থেকে এই নষ্টভ্রষ্ট মতবাদ আমদানী করা হবে? মুসলমানদের নষ্ট-ভ্রষ্ট করার জন্য? পাশ্চাত্যের মতো অবাধ যৌনাচারের পরিবেশ কায়েম করে জারজ সন্তান দিয়ে দেশ ভরে ফেলার জন্য? আলামত দেখে তো সেটাই মনে হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে বিদায় করে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুড়সুড়িমূলক যৌনশিক্ষার আয়োজনের রহস্য এ ছাড়া আর কি? দেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতা ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। সময় থাকতে সতর্ক হোন। অন্যথায় ষোল কোটি তৌহিদী জনতার বাধভাঙা জোয়ারে শাহবাগী নাস্তিকচক্র ও তাদের দোসররা খড়কুটার মতো ভেসে যাবে।

ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের পক্ষ ত্যাগ করে ইসলামী জনতার সাথে একাত্ম হোন

বাংলাদেশেল কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ডিজিটাল তরুণ ডিজিটাল মিডিয়ায় দীর্ঘদিন যাবত আল্লাহ-রাসূল, কুরআন-হাদীস ও ইসলাম নিযে অশ্রাব্য কুৎসিত ভাষায় বিষোদগার করে আসছে। উচ্চশিক্ষিত এই চরিত্রহনি ভ্রষ্ট তরুণরা যে ভাষায় মন্তব্য করেছে তা কোন ইতরের মুখেও শোভা পায় না। নামায রোজা, ঈদ, কুরবানী নিয়ে অত্যন্ত ধৃষ্টতামুলক জঘন্য মন্তব্য করে ওরা শয়তানকেও হার মানিয়েছে। মানুষ নামের কলঙ্ক, দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী চক্রের ঘৃণ্য

এজেন্ট এই নরপিশাচদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশের চার লক্ষাধিক মসজিদ ও হাজার হাজার স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা থেকে কোটি কোটি তৌহিদী জনতা রাস্তায় নেমে এসেছেন। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে তৌহিদী জনতার নিন্দা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের উত্তর ঢেউ। কোটিকণ্ঠের একই দাবী ১৬ কোটি তৌহিদী জনতার এই বাংলাদেশেমহানবীর অবমাননাকারীদের ঠাঁই নাই। স্বঘোষিত এই নাস্তিক-মুরতাদদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান আওয়ামী সরকার নবীর অবমাননাকারী এই ভ্রষ্ট নাস্তিকদেরকে জাতীয় বীর ঘোষণা করে তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নবীপ্রেমিক তৌহিদী জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ র‍্যাব, বিজিবি ও দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতকদের গুলিতে এক সপ্তাহে খুন হয়েছেন ১৯ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৩ শতাধিক এবং গ্রেফতার করা হয়েছে সহস্রাধিক আলেম-হাফেজ, ছাত্র-শিক্ষক ও তৌহিদী জনতাকে। রিমান্ডে নিয়ে তাদের উপর চালানো হচ্ছে নারকীয় পাশবিক নির্যাতন।

তথ্যসচিব আবু করিম একদলীয় বাকশাল কায়েম করায় বঙ্গবন্ধুর মৃদু সমালোচনা করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এজন্য তাকে চাকরিচ্যুত করে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত চার বছরে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসহ বহু মানুষকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছে। ভালো কথা, সম্মানী মানুষের মানহানি করলে সাজাতো পেতেই হবে। কিন্তু আল্লাহ-রাসূলের সম্মানের বেলায় একথা বিস্মৃত হবার হেতু কি? বঙ্গবন্ধুর ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কটূক্তির কারণে যদি সচিব ও ভার্সিটির শিক্ষকের মত গুণীজনের বিরুদ্ধে মামলা সাজা হতে পারে, তাহলে আল্লাহ-রাসূলের প্রতি নোংরা কুরুচিপূর্ণ জঘন্য মন্তব্যের কারণে কুলাঙ্গার আসিফ মহিউদ্দিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বাধা কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটিতে এক বক্তৃতায় বলেছেন, "আমাদের মহানবীকে যদি কেউ অসম্মান ও কটূক্তি করে তা বরদাশত করবো না।" ভবিষ্যতে কেউ কটূক্তি করলে বরদাশত করবেন না, না-কি ইতোমধ্যে যারা কটূক্তি করেছে তাদেরকে বরদাশত করবেন না- প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেটা স্পষ্ট নয়। ইতোমধ্যে যারা কটূক্তি করেছে এবং গত তিন বছর ধরে নিয়মিত করে আসছে তাদেরকে বরদাশত করা হবে না- এটাই যদি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মর্ম হয় তাহলে বলবো, সরকারী দলের অঙ্গসংগঠন জাতীয় উলামালীগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসান শরীয়তপুরী গত ২৪ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন পত্রিকায় ডা.

ইমরান এইচ সরকার ও আসিফ মহিউদ্দীনসহ ৩১ জন নাস্তিক ব্লগারের তালিকা প্রকাশ করে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করেছেন। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আপনার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবেন কি?

একদিকে নাস্তিক ব্লগারদের প্রতি সরকারের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা, নাস্তিক রাজিবকে রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা, অপরদিকে নিরীহ ইসলামী জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা-নির্যাতন সরকারের ইসলাম বিরোধীতাই প্রকট করে তুলছে। আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেছেন, "ব্লগার রাজিব রাসূল সম্পর্কে যে ন্যাক্কারজনক জঘন্য মন্তব্য করেছে এটা কোন বিধর্মী কাফেরও করতে পারে না। এ মন্তব্য কোন মানুষের না শয়তানের।" অথচ আইন প্রতিমন্ত্রী বর্ণিত এই শয়তানকেই জাতীয় সংসদের স্পীকার, সাংসদ, মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় বীর ও শহীদ আখ্যায়িত করেছেন।

গতবছর হাইকের্টে এই নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি খুরশিদ আলম সরকারের দ্বৈত বেঞ্চ অবিলম্বে ইসলাম বিরোধী ব্লগগুলো বন্ধ ও ব্লগারদের গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করেন। উচ্চ আদালতের এ নির্দেশ দীর্ঘ এক বছরেও পালন করা হয়নি। অথচ নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম বিদ্বেষী জঘন্য মন্তব্য সম্বলিত প্রতিবেদনের ফটোকপি সহকর্মীদের কাছে বিতরণের হাস্যকর অভিযোগে উচ্চ আদালতের এক সিনিয়র বিচারপতি মিজান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাকে অপসারণ করার প্রক্রিয়ায় ক্ষীপ্রগতিতে রাষ্ট্রপতিও সম্মতিও আদায় করা হয়েছে। এই ভয়ংকর নাস্তিক গোষ্ঠীর দেশ জাতি ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতার কথা দৈনিক ইনকিলাব, আমার দেশসহ যেসব পত্রিকা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছে তারা বিরাট বড় জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। এজন্য দেশের আপামর তৌহিদী জনতা তাদেরকে জানিয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন। অথচ নাস্তিক ব্লগারদের সুরে সুর মিলিয়ে সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা অষ্টপ্রহর মাহমুদুর রহমানকে হুমকি দিয়েই চলেছে।

ব্যথিত হৃদয়ে জানতে ইচ্ছা করে, ওই ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ব্লগাররা যদি বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জয়-পুতুলকে নিয়ে এরূপ জঘন্য মন্তব্য করতো, যেরূপ আল্লাহ-রাসূল, কুরআন-হাদীস ও নামায রোযা নিযে করা হয়েছে, এরপর তারা রাজাকারের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগে, মতিঝিলে সমাবেশ করতে চাইতো, তবুও কি তাদেরকে রাস্তা বন্ধ করে পুলিশী প্রটেকশনে সমাবেশ করতে দেয়া হতো? তবু কি তাদেরকে জাতীয় বীর খেতাবে ভূষিত করা হতো? কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীপুত্র জয়ের ঘুষ কানেকশন নিয়ে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। তখন দেশবাসী দেখেছে সরকারের রোষানলে তারা কিভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে।

তাহলে আল্লাহ-রাসূলের মর্যাদা রক্ষায় হাইকোর্টের নির্দেশ ও ১৬ কোটি তৌহিদী জনতার দাবী উপেক্ষা করে নাস্তিক-ব্লগারদের পক্ষ নেয়ার পরিণতি কি ভাল হবে? আল্লাহ-রাসূলের দুশমনদের সাথে সখ্যতা ভয়াবহ ধ্বংসই ডেকে আনবে। ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে নবীর দুশমনরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে এবং নবীর অনুসারীরা সকল তাগুতী শক্তির মোকাবেলা করে বিজয়ী হয়েছে। অতএব সময় থাকতে খোদাদ্রোহী নাস্তিক ব্লগারদের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের গ্রেফতার করুন এবং ১৬ কোটি তৌহিদী জনতার সেন্টিমেন্টের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করুন। অন্যথায় মহান আল্লাহর রোষানল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

মিডিয়াযুদ্ধ এবং ইসলামের ভূমিকা

আজকের বিশ্বে মিডিয়াযুদ্ধ নামে যে আলোচনাটি তুঙ্গে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। এর সঙ্গে মানবসভ্যতার পরিচয় অনেক পুরনো। সমকালীন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিটি যুগই এ যুদ্ধের কীর্তিতে ভরপুর। গোত্রীয় যুগে এ যুদ্ধ শে'র-কবিতা আবৃত্তি, অলঙ্কার ও ভাষাশৈলীর জোরে চলত। এ ক্ষেত্রে সবেচেয়ে বড় ভূমিকা থাকত শা'য়ের বা কবিদের। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের শান-শওকত, শৌর্য-বীর্য প্রকাশের জন্য কবিদের সহায়তা যোগাত। বরং অধিকাংশ গোত্র কবিদের জীবন-জীবিকার যাবতীয় দায়-দায়িত্বও গ্রহণ করত। যাতে এ বিষয়ে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে, অন্যের ওপর ভরসা করতে না হয়। প্রশংসা-নিন্দা, উৎসাহ-কুৎসা আরবের সাহিত্যের বিশেষ উপাদান ছিল, যাকে প্রাচীন যুগের মিডিয়াযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করা হত।

মিডিয়াযুদ্ধ বলা হয় ওইসব মাধ্যমের দারস্থ হওয়াকে যার সাহায্যে নিজেদের মত ও দর্শন অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বকে কখনো অবহেলা করেননি। বরং মিডিয়াযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে যুগের প্রচলিত প্রচার মাধ্যমকে সময় ও সুযোগ মতো পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসবে ব্যবহার করেছেন।

ইসলামপূর্ব যুগে কাবার দেয়ালকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কাফেররা বিভিন্ন কুৎসামূলক কথা রটনা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রাসূলের কবি' খ্যাত হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত রা.কে বলতেন, 'হে হাস্‌সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে জবাব দাও। আল্লাহ রুহুল কুদস (জিবরাইল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।' নির্দেশ পালনার্থে হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত রা. নিজের ইলহামী কাসীদার সাহায্যে কাফের-মুশরিক ও

ইসলামের শত্রুদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তারা একথা ভুলতে পারত না।

এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করেছিলেন, যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে জবাব দিতেন। একবার আরবের এক গোত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাব্য ও বক্তৃতায় মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ করে বসল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করলেন। তিনি 'রাসূলের কবি' খ্যাত হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রা. এবং 'খতিবে রাসূল' খ্যাত সাম্মাস বিন কায়েস রা.কে মোকাবিলার জন্য নির্বাচন করলেন। দু'জনই কবিতা আবৃত্তি ও বাকশৈলীর চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী করলেন। মুসলমান কবি ও বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করে নিল।

উমরাতুল কাযার সময় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামের হালতে তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে সামনে চলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বীরত্বের সঙ্গে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এই পংক্তিগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদব ও সম্মানের প্রসঙ্গ যেমন ছিল তেমনি কাফেরদের প্রতি ধমকিও ছিল। ওমর রা. তাকে বারণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ওমর! তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে দাও। এটা ওই লোকদের ওপর তীর ছুঁড়ে মারা চেয়েও বেশি কার্যকরী।' দুশমনের নাকের ডগায় পৌঁছে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার চেয়ে সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে! কেননা হুদাইবিয়ার চুক্তিপত্রে 'অস্ত্র প্রদর্শনীর' ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু 'কবিতা আবৃত্তির' ওপর কোন বাধা ছিল না। প্রচারণার প্রচলিত ও সহজলভ্য পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইহুদী প্রচার-মাধ্যম' এর প্রতিরোধের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

কাব বিন আশরাফ ইহুদী প্রোপাগান্ডার এক শক্তিশালী ভিত ছিল। তার যেমন অঢেল সম্পদ ছিল তেমনি সে ছিল একজন কবি। নারীদের অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাকে গণ্য করা যায়। কবিতায় মুসলিম নারীদের নাম ধরে ধরে কুৎসা রটাত। রিসালাতের প্রতি কটূক্তিকারীদের আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারীও ছিল সে। বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা দান এবং মক্কার কাফেরদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য মক্কা মুকাররামা চষে বেড়াত। কাফেরদের সমাবেশে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কটূক্তি করে কবিতা পাঠ করে শোনাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদের্শে হযরত মুহাম্মদ ইবনে

সালামা রা. ওই অভিশপ্তকে খতম করেন এবং চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ করে দেন।
ইহুদী আবু রাফে 'কুফুরী সাংবাদিকতার' (এটাকে যদি সাংবাদিকতা বলা হয়) সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তাকারী ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে পানির মতো পয়সা ব্যয় করতো। অসৎ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিদের সেবায় দিরহাম-দিনারের থলি পৌঁছে দিত। সে কবিরা যেন জীবন-জীবিকার দিক থেকে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে এর সব ব্যবস্থা সে করে দিত। দীনী জযবায় উজ্জীবিত কয়েকজন নওমুসলিম তাকেও তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সংবাদ পেলেন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং ওই ভয়াবহ শত্রুকে যারা জাহান্নামে পাঠিয়েছেন তাদের কামিয়াবীর জন্য দুআ করেছেন।
শেষোক্ত দু'টি ঘটনার ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা ছাড়াও ছিল ইসলামবিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তিভঙ্গের মতো অমার্জনীয় কিছু উপাদান ও উপলক্ষ্য। তাছাড়াও এসব ঘটনার কারণ ও হেকমত বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি, ওই যুগে প্রচলিত মিডিয়াকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের উপকার ও ফায়দার জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন। মিডিয়া আগ্রাসন ও ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডার বিষয়টিকে তিনি সামান্যও এগিযে যাননি বা উপেক্ষা করেননি।
আধুনিক প্রযুক্তি যখন থেকে প্রচার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করে এবং বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা যুক্ত হয়, তখন থেকেই মিডিয়ায় এক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। ঘরের কোণে কোণে পর্যন্ত দুশমনদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে মহিলা ও শিশুদের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়। বর্তমানে প্রায় পুরো মিডিয়া জগৎটা পশ্চিমা পদলেহী এবং ইহুদী-খৃস্টানদের এজেন্টে ছেয়ে গেছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধের ধারণাটাই তারা পাল্টে দিয়েছে। মিথ্যাকে সত্য এবং বাতিলকে হক বানিয়ে পেশ করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক রেডিও-টেলিভিশনগুলো সংবাদের শুরুতে এবং সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অথবা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কুরআনের কোন আয়াত অথবা হাদীসে নববীর তরজমা প্রচার বা প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, পুরো সংবাদ অথবা পুরো প্রোগ্রামে ইসলামের স্পিরিট ঢুকিয়ে দেয়া

হয়েছে। ইসলামের লেভেল লাগিয়ে দেওয়ার পর উগ্র বিনোদনের পৃষ্ঠাসহ অনেক কিছু ইসলামের খাতায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মিডিয়ায় ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ চলছে। সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তরা ভদ্রতা ও মানবিকতার চেহারা ঢেকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। মানবতাবিধ্বংসী কালচারে আজ ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। অন্যদিকে 'ধর্মীয় সাংবাদিকতা' মাদরাসার মুখপত্র এবং মাসিক দীনী কিছু সাময়িকী পর্যন্ত এখনও সীমাবদ্ধ। তবে দীনী পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়াগুলো শত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভালো দৃষ্টান্ত কায়েম করে যাচ্ছে। কাজ করার মতো সুচারু চিন্তা ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত। আমাদের পত্রিকাগুলো এখনও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ।

ব্লগারচক্রের নাস্তিকতা এবং আশেকীনে রাসূলের ঈমানী গর্জন

নাস্তিক্যবাদীদের উৎপাত এ দেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। ৬০ এর দশকে যখন সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্টদের পূর্ণ যৌবন চলছিল তখনও এদেশে নাস্তিক্য চক্রের অপতৎপরতার ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে আফগান যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে যখন নাস্তিকদের তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে তখন এদেশ থেকেও ধীরে ধীরে নাস্তিক্যবাদীদের উৎপাত কমে যেতে থাকে। এরপর থেকে তারা আর এদেশে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কখনো মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাওহীদী জনতা এবং আলেম সমাজের সজাগ দৃষ্টির ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এতদিনের পরিস্থিতিকে পেছনে ঠেলে সম্প্রতি নাস্তিক্যবাদী চক্র আবারো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যুদ্ধাপরাধ ইস্যুকে পুঁজি করে তারা এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ব্যস্ত। সরকার এবং কিছু প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তাদের সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ফলে সংখ্যায় গুটি কয়েক হওয়া সত্ত্বেও এরা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার সাহস পাচ্ছে। দীন, ধর্ম ও মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে এমন সব কটূক্তি ও ব্যঙ্গ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে যা সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস'কেও হার মানায়।

ব্লগ ও ফেসবুক কেন্দ্রিক এসব নাস্তিক-মুরতাদরা প্রতিদিনই ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাসের উপর তাদের নগ্ন হামলা চালাচ্ছে। ওয়েব দুনিয়ায় মুক্ত মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকায় বিভিন্ন ব্লগে তারা বিনা বাধায় যা ইচ্ছা তাই লিখে যাচ্ছে। এসব দেখলে একজন মুসলমান তো দুরের কথা, কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব নয়। 'ছন্নছাড়া' ছদ্মনামে এক ব্লগার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে, 'এই

মুহাম্মদকে একটা সময়ে মানুষ ঘৃণা করবে। তার নাম শুনলে থুথু ছিটাবে ঠিক এখন হিটলারকে দেখলে আমরা যা করি।' (নাউযুবিল্লাহ) সে আরো বলেছে, 'কুরআন-হাদীস মানব সভ্যতার জন্য বড় রকমের একটা হুমকি, এগুলোর আবিষ্কারক মুহাম্মদ প্রতারণা আর মানুষের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য ইতিহাসে নিকৃষ্ট মানুষরূপে আখ্যা পাবেন একটা সময়।' (নাউযুবিল্লাহ)

সামহোয়্যার ইন ব্লগ, মুক্তমনা ব্লগ ও আমার ব্লগ প্রভৃতি খোঁজ করলে এমন আরো শত শত বিষোদগার পূর্ণ মন্তব্য ও পোষ্টের দেখা পাওয়া যায়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ব্লগ মালিক কর্তৃপক্ষও এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। কিন্তু মজার কথা হল, কেউ তাদের এসব লেখার প্রতিবাদ করলে উল্টো প্রতিবাদকারী ব্লগারকে ব্লক করে দেয়া হয়, অথবা প্রতিবাদ লেখা পোস্টটি মুছে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা তারা বেমালুম ভুলে যান।

উদীয়মান হুমায়ুন আযাদ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া কুখ্যাত কুলাঙ্গার নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দীন (শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা) তার ফেসবুকের ওয়ালে কুরআনুল কারিমকে 'পবিত্র আহাম্মকোপিডিয়া' নামে ব্যঙ্গ করে লিখেছে, "সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই এই পবিত্র আহাম্মকোপিডিয়া' কিতাবে সাংকেতিকভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যদিও 'পবিত্র আহম্মকোপিডিয়া' মুখস্থ করে ফাতাফাতা করে এই ধর্মের অনুসারীরা কোন বিজ্ঞান বের করতে পারলেন না। তথাপিও তারা কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিস্কার হওয়া মাত্রই দৌঁড়িয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নিজেদের কেতাব 'পবিত্র আহম্মকোপিডিয়া' এর কিছু শব্দার্থ বেমালুম পাল্টিয়ে দাবি করতে লাগলো, এই বিষয়ে এই কেতাবে আগে থেকেই সব লেখা আছে।"

সম্প্রতি নিহত হওয়া চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগার রাজিব হায়দার 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে মুক্তমনাসহ বিভিন্ন ব্লগে নানা সময় তার ইসলাম বিদ্বেষী লেখাগুলো প্রকাশ করত। তার মিথ্যাচারের সামান্য নমুনা দেখুন-

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠে স্থাপিত নবুওয়াতের মোহর সম্পর্কে সে এক জায়গায় লিখেছে- "মোহাম্মক (অনুল্লেখযোগ্য) এর জন্য খাদিজার কাছে মাইর খাইত নিয়মিত। যেন তেন মাইর না। তা হলো, পিঠ মোবারকে খাদিজার পবিত্র জুতার বাড়ি। তাই নিজের সম্ভ্রম শরীফ রক্ষা করার জন্য চাপা মারায় উস্তাদ মোহাম্মদ পিঠে কাদিজার পেন্সিল হিলের গর্ত ঢাকতে ফেঁদে বসেছিল। সেই গল্পই আমরা এখন নবুওয়াতের মোহরের গল্প বলে জানি।" (নাউযুবিল্লাহ)

আরেক জায়গায় সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদখোর আখ্যা দিয়ে লিখেছে- 'মোহাম্মাক (মোহাম্মাদ+ আহম্মক) তাহার ইয়ার দোস্ত লইয়া প্রায়শই কাবা প্রাঙ্গণে আরবি (মদ্যবিশেষ) খাইয়া পড়িয়া থাকিতো।' (নাউযুবিল্লাহ) এগুলো হলো তার ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য। এছাড়া আল্লাহ-রাসূল ও ইসলাম নিয়ে তার মনগড়া কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল অন্যান্য লেখাগুলোর উল্লেখ করে কলমের পবিত্র কালিকে অপবিত্র না করাই সমীচীন বলে মনে করছি।

'থাবা বাবা' ছদ্মনামে লেখা এই নাস্তিক ব্লগারের মৃত্যুতে আমাদের দেশের সুশীল সমাজ বলে খ্যাত এক শ্রেণীর পরগাছা বুদ্ধিজীবীদের মায়াকান্না দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। অথচ ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে রচিত তার অশ্লীল ও ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলোর ব্যাপারে এরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। ভাবখানা এমন যেন তারা কিছুই জানে না। আরো বেশি অবাক হতে হয়, যখন নব্বইভাগ মুসলমানের দেশে এমন একটা কুলাঙ্গার ধর্মদ্রোহী নাস্তিককে রাষ্ট্রীয়ভাবে মরণোত্তর সম্মান জানানো হয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। জাতীয় সংসদের স্পিকার সবাইকেনিয়ে সংসদে শোক প্রকাশ করেন। সরকারের মন্ত্রী, এটর্নি জেনারেলসহ হাইকমান্ডের অনেকেই রাজিবকে বিশিষ্ট শহীদ হিসেবে আখ্যা দেয়। অথচ সে হলো ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট কুলাঙ্গার ও নাপাক ময়লা।

এ সকল নাস্তিক ব্লগারদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে এক ও অভিন্ন সে কথা মুক্তমনা ব্লগের পরিচালক আমেরিকা প্রবাসী অভিজিত রায়ের লেখা থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি তার ব্লগে লেখেন, "হুমায়ুন আজাদ, হাল আমালের আসিফ মহিউদ্দীন এবং রাজিব হায়দার, এই তিনজনেরই একটি বিষয়ে মিল রয়েছে, তা হলো এরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছেন বা এখনো করছেন। হুমায়ুন আজাদ তো সারা জীবনই ধরেই ধর্মীয় রূপকথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তার মতোই ধর্মান্ধতা কুসংস্কারের বিপরীতে প্রগতিশীলতার জয়গান গেয়েছিল ব্লগার আসিফ ও প্রয়াত রাজীব।"

এদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। এখানে মানুষের ঘুম ভাঙ্গে ফজরের আযান শুনে। দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এদেশের আকাশ বাতাস। ইসলাম এদেশের মানুষের রুন্ধ্রে রন্ধ্রে ও শিকড়ের গভীরে প্রোথিত। তা সত্ত্বেও হাতে গোনা কিছু নাস্তিকদের এত দুঃসাহসের পেছনের কারণ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, কোন খুঁটির জোরে তারা বারংবার মুসলমান, ইসলামের নবী ও ধর্মগ্রন্থের উপর নগ্ন হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে।

আসল কথা হলো, এসব নাস্তিকদের মুখোশ ইসলামপ্রিয় জনগণের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। তারা বুঝতে শুরু করেছে, এটা নিছক কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। এর আড়ালে লুকিয়ে আছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার সুগভীর ষড়যন্ত্র। আলেম সমাজও এসকল নাস্তিকদের সমুচিত শাস্তির দাবিতে

নেমে এসেছেন রাস্তায়। প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তারা। এদেশে আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি মারামারি কখনোই আমাদের কাম্য নয়। সুতরাং সরকারের কাছে আমাদের দাবী হলো, সকলের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন এবং ইসলাম বিদ্বেষী যে সব ওয়েবসাইট, ব্লগ ও ফেসবুক আইডি আছে সেগুলো অবিলম্বে ব্লক করে দিন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে কথা-বার্তা বলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন প্রণয়ন করুন। অন্যথায় এদেশের মানুষ ঈমান ও ইসলাম রক্ষায় দুর্বার বেগে মাঠে নেমে আসবে। অতঃপর অনাকাঙ্খিত যে কোন কিছুর দায়ভারও সরকার মহোদায়কেই বহন করতে হবে।

ব্লগারদের অপকীর্তি জানাতে গিয়ে বিপাকে এক বিচারপতি

ইন্টারনেট ব্লগে ব্লগাররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন সেসব নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অন্যান্য বিচারপতির কাছে বিতরণের অভিযোগ ওঠায় চরম বিপাকে পড়েছেন হাইকোর্টের এক বিচারপতি। প্রচন্ড ধর্মবিদ্বেষী ও নষ্ট চরিত্রের ব্লগার রাজীবকে জাতীয় বীর আখ্যা দিয়ে বাম ও আওয়ামী সমর্থক আইনজীবীরা বলেছেন, রাজীবকে নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত কুৎসা অন্যান্য বিচারপতির কাছে বিতরণ করে ঐ বিচারপতি শুধু বিচারকের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি, তিনি দেশদ্রোহীতার মতো কাজ করেছেন। সভ্যতা ও সামাজিক সুরক্ষার স্বার্থে তাকে চলে যেতে হবে। তাদের দাবি- শাহবাগের ব্লগারদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এদেশের জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বিচারপতি মিজানুর রহমান ভুঞা। দেশের জনগণের চাওয়া অনুযায়ী বিচারপতির পদ থেকে চলে যেতে হবে তাকে। আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা এ নিয়ে প্রধান বিচারপতি বরারব নালিশও করেছেন। এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, রাজীব জাতীয় বীর। তাকে অপমান করে এ বিচারপতি পুরো দেশকে অপমান করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ শাহবাগে আন্দোলনরতদের নেতৃত্বে থাকা এক ব্লগার রাজীব গত ১৫ ফেব্রুয়ারী নিহত হয়। এরপর তাকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্লগার রাজিব 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে প্রধানত খৃস্টান মালিকানাধীন 'সামহোয়্যারইন' ব্লগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলাম ধর্মকে নিয়ে চরম কটাক্ষপূর্ণ ও অশালীন লেখা লিখে সে ইসলামের মৌলিক নীতিকে আক্রমণের পাশাপাশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে। পরে দেশে বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে এ নিয়ে বিস্তারিত

প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এসব প্রতিবেদনে দেখা যায়, শাহবাগে আন্দোলনরত কিছু ব্লগার ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অশালীন ভাষায় গালাগাল করেছে। তাদের লেখার ভাষা এতটাই নিম্নরুচির, যা পড়লে ধর্মমত নির্বিশেষে কোন বিবেকবান মানুষই স্থির থাকতে পারবে না।

এসব ব্লগার নিজেদের নাস্তিক দাবি করলেও তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র ইসলাম ধর্ম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশের পর দেশব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষ শাহবাগের কথিত ব্লগারদের এমন ধৃষ্টতার বিচার চেয়ে রাস্তায় নামেন। নাস্তিক ব্লগার রাজিবকে নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদন বিচারপতি মিজানুর ইসলাম ভুঞা বিভিন্ন বিচারপতির কাছে পাঠিয়েছেন মর্মে সংবাদ প্রকাশ করে আওয়ামী সমর্থক নিউজ এজেন্সি বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম। পরে এ বিষয়টিকে পুঁজি করে আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা তার পদত্যাগ দাবী করেন। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলও গঠন করার দাবি জানান তারা। তাদের এ আবদারের সঙ্গে সুর মেলান বাম মনোভাবাপন্ন রাজনীতিক ও আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। তিনি ঐ বিচারপতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান। এছাড়া মহাজোটের সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদে তার পদত্যাগ দাবি করেন। তবে অন্যান সিনিয়র আইনজীবীরা বলেছেন, মহানবীকে অপমান করে লেখা নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন বিতরণ করে ঐ বিচারপতি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি। তারা বলেন, বিষয়টি কোনভাবেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। ঐ বিচারপতি হয়তো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বিতরণ করেছেন মাত্র। এখানে তার নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিল না।

এ বিষয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, যারা আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে কটূক্তি করে তাদের বিরুদ্ধে এসব আইনজীবী কোন বক্তব্য দেননি। উল্টো একজন বিচারপতি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কপি করে বিলি করেছেন বলে অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের দাবি জানিয়েছেন। এটা এক রকম ধৃষ্টতা। তিনি বলেন, যদি ঐ বিচারপতি কাজটি করেও থাকেন, তাতে বিচারপতিদের কোড অব কন্ডাক্ট তিনি লঙ্ঘন করেননি। এখানে বিষয়টি কোনভাবেই রাজনৈতিক নয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে জড়িত। এটাকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে ঐ বিচারপতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম বলেন, একজন বিচারপতি স্থায়ী হওয়ার পর একমাত্র অসদাচরণের কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। অন্য কোন কারণে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই। ইসলাম ধর্মকে অবমাননাকারী ব্লগারদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধর্মীয়। এখানে ধর্মবিশ্বাস ও আবেগ জড়িত। এটা বিচারিক কোন বিষয় না। একটি পত্রিকার কপি বিতরণ করেছে এমন অভিযোগ তুলে একজন বিচারপতির অপসারণ চাওয়া যায় বলে আমি মনে করি না। তিনি বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু বিচারপতির ব্যক্তিগত কোন কিছু না। তিনি হয়তো একটি ধর্মীয় ব্যাপার একভাবে দেখছেন, অন্যজন অন্যভাবে দেখছেন। তিনি ধর্মবিদ্বেষের নমুনাসহ পত্রিকায় ছাপা একটি কপি অন্য বিচারপতিদের সরবরাহ করতেই পারেন। এতে অসাদচরণের মতো কোন কিছু ঘটেনি। ব্যাপারটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সবার জন্য কল্যাণকর হবে।

সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বলেন, আমি মনে করি বিচারপতির মানবিক অধিকারে স্বাধীনতা আছে। ইসলাম সম্পর্কে নাস্তিকদের ঔদ্ধত্য নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অন্য কারো কাছে সরবরাহ করে তিনি কোন দোষ করেননি। এ দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা প্রিয়, তেমনি ধর্মপ্রিয়। এমন ঠুনকো অভিযোগ তুলে একজন বিচারপতিকে হয়রানি করা কোনভাবেই ঠিক হবে না।

আমাদের পক্ষ থেকে এই বিচারপতির প্রতি আন্তরিক দোয়া রইল যে, আল্লাহ পাক আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন এবং সকল মাখলুক থেকে বেপরোয়া হয়ে সমগ্র জাহানের একমাত্র খালেক-মালেক আল্লাহকেই ভয় করার তাওফীক দান করুন!এবং যেসকল সাংবাদিক ভাইয়েরা সত্য সংবাদ প্রচার করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন, হেদায়েত দান করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন!!

আল্লাহ্ সম্পর্কে কটূক্তিকারী কলেজ শিক্ষকের শাস্তি দাবি

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি ডিগ্রী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক অরুন কুমার কর্তৃক মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে কটূক্তি করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন। পৃথক বিবৃতিতে সংগঠনের নেতারা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে উপর্যপুরী হিন্দুরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করছে। বিভিন্ন মহল থেকে এসব কটূক্তিকারীর শাস্তির দাবী জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে এ ধরণের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার ঘটনা বাড়ছে। তারা

অবিলম্বে অরুন কুমারসহ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

গত ১২ অক্টোবর খুলনার পাইকগাছার কপিলমুনির ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি প্রভাষক অরুন কুমার সরকার কলেজের একাদশ শ্রেণীর এক ক্লাশে শিক্ষার্থীদের বলেন, বিজ্ঞান ও অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় মানুষ চাঁদে বসবাসের আয়োজন করছে। ঘুরছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে গোটা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির এ অভাবনীয় অগ্রগতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাও উন্নতি ঘটছে দিনে দিনে, যা এক সময় মানুষের কল্পনাতীত ছিল, আজ তা বাস্তব। এমন এক সময় আসবে যেদিন আল্লাহকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে কপিলমুনি বাজারে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে- "তুই আমাদের অনেক জালিয়েছিস, তোর কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থও আদায় করবে এ তথ্যপ্রযুক্তি।" (নাউযুবিল্লাহ) এ উক্তির ঘটনায় ঐ কলেজসহ বিভিন্ন মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কুরআন নিয়ে আরেক হিন্দু শিক্ষকের কটূক্তি

খুলনার পাইকগাছায় পবিত্র কুরআন শরীফ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারক চন্দ্র মণ্ডল নামে কটূক্তিকারী শিক্ষকের বিচার দাবিতে এলাকাবাসী গত ২১ নভেম্বর সকালে তাকে পাঠশালায় অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে টনক নড়ে স্থানীয় প্রশাসনের। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশংকায় পুলিশ জনতার ঘেরাও থেকে ঐ শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

উপজেলা লস্কর ইউনিয়নের খড়িয়া গ্রামে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে খড়িয়া বাইতুল আমান মসজিদের অনুকূলে একটি নূরানী মক্তব ও খড়িয়া পূর্বপাড়া পাঠশালা নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ মক্তবে আরবি ও কুরআন পড়া শেষে পাঠশালায় যায়। মক্তব থেকে পাঠশালায় যেতে দেরি হওয়ায় পাঠশালার শিক্ষক খড়িয়া ভড়েঙ্গারচক গ্রামের মৃত নিরান চন্দ্র মণ্ডলের ছেলে তারক চন্দ্র মণ্ডল মুসলমানদের ধর্মীয়গ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফ ও আরবি ভাষা শিক্ষা নিয়ে প্রায়ই কটূক্তি করতেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, 'আরবি বা কুরআন শিক্ষা জরুরি নয়। তোরা আরবি বা কুরআন কি করবে নিয়ে যাবি? কুরআনের যের, যবর পেশ টিকটিকির পায়খানার সমতুল্য এবং মাটি দিয়ে কুলুপ করা একটি জঘন্য

কাজ। আমি কুরআন পায়খানায় বা লিজ-ঘেরে ফেলে দিলে আমার কিছুই হবে না।' তার এসব বক্তব্য ধীরে ধীরে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এলাকাবাসী।

এদিকে মক্তবের শিক্ষক মাওলানা বেলাল হুসাইন শিক্ষক তারককে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে অভিযোগের সত্যতা পান। এ সময় হাজার হাজার ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তারক চন্দ্র মণ্ডলের বিচার দাবিতে পাঠশালাটি ঘিরে ফেলে। খবর পেয়ে প্রথমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ওসি এনামুল হক এলাকাবাসীকে শান্ত রাখতে ইমাম পরিষদকে অনুরোধ করেন। পরে এএসআই সুজন গত ২০ নভেম্বর সকালে অবরুদ্ধ শিক্ষক তারক চন্দ্র মণ্ডলকে গ্রেফতার করে থানা হেফাযতে নিয়ে যান।

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী শিক্ষিকার গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি

সম্প্রতি নড়াইল সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা নুপুর রায় কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে কটূক্তি করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। পৃথব বিবৃতিতে সংগঠনের নেতারা বলেন, এই কটূক্তির মাধ্যমে নুপুর রায় জঘন্য অপরাধ করেছেন। অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, নইলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।

দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সহস্রাধিক আলেমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, নুপুর রায়ের এই বক্তব্য দেশ থেকে ইসলাম নির্মূলের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতারই অংশ। এই উক্তি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম বিদ্বেষীদের কোন মহল থেকে এ ধরণের উস্কানি দিয়ে শান্ত দেশকে অশান্ত করার জন্য এব্যবস্থা করা হতে পারে।

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী শিক্ষক মদনমোহন পুরস্কৃত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পবিত্র হজ্ব নিয়ে কটূক্তিকারী শিক্ষক মদন মোহন দাসকে শাস্তির আড়ালে আসলে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা এ শিক্ষককে গণবিক্ষোভের মুখে রাজধানীর ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় থেকে চলতি বছরের ৩১ জুলাই পঞ্চগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। সেখানে শিক্ষক মদনের চাকরিচ্যুতি ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি তীব্র হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সে সময় তাকে বরখাস্ত করেছে বলে সবাইকে জানায়।

কিন্তু বরখাস্তের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বোকা বানিয়ে উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, মানুষের ক্ষোভের মুখে শিক্ষক মদন মোহনকে মাউশি কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হয়। মানুষকে বোকা বানিয়ে মাউশি কর্তৃপক্ষ গোপনে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে উপ পরিচালকের (মাধ্যমিক) সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকৃতপক্ষে তাকে পুরস্কৃত করেছে। যেখানে মাউশি কর্তৃপক্ষের তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা, সেখানে তাকে পদোন্নতি দিয়ে তার ক্ষমতাই আসলে বৃদ্ধি করেছে।

সংশ্লিষ্টরা আরো বলেন, মদন মোহন মাউশির কাছে বার বার কৈফিয়ত দেয়ার কথা। কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। স্কুল থেকে সরাসরি মাউশিতে স্থান পাওয়ায় তিনি এখন দেশের সব স্কুলশিক্ষকের উপর খবরদারি করার ক্ষমতা পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকাকালে ২৬ জুলাই মদন মোহন দাস তার সহকর্মী শিক্ষকদের এক সভায় মন্তব্য করে- "এক লোক সুন্দরী মহিলা দেখলেই বিয়ে করে। এভাবে বিয়ে করতে করতে ১৫-১৬ টি বিয়ে করে। মুহাম্মদও ১৫-১৬ টি বিয়ে করেছে। তাহলে মুহাম্মাদের হজ্ব করার স্থান মক্কায় গিয়ে হজ না করে ঐ ১৫-১৬টি বিয়ে করা লোকের বাড়িতে গিয়ে হজ্ব করলেই তো হয়।"

এমন মন্তব্যে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এর প্রতিবাদে স্কুল ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ কালে শিক্ষক মদন মোহন দাসকে চাকরি থেকে অপসারণ ও তার বিচার দাবি করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাউশি অধিদফতরের ডিজিকে ঘটনা তদন্ত করে খুব দ্রুত ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। গণবিক্ষোভের মুখে ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। সেখানে গিয়ে জনরোষের মধ্যে পড়ে সে। তার চাকরিচ্যুতি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে। বিক্ষোভ তীব্র হতে থাকলে মাউশি অধিদপ্তর ১ আগস্ট অপরাহ্ণ থেকে মদন মোহনকে বরখাস্ত করেছে জানায়। অভিভাবকদের লিখিত অভিযোগ এবং কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এমন কটূক্তির সত্যতা মিলেছে। এমন মন্তব্যে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিবাদে কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। এ সময় ফুলের টব ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে

বিক্ষুব্ধরা। বিক্ষোভকালে শিক্ষক মদন মোহন দাসকে চাকরি থেকে অপসারণ ও তার বিচার দাবি করা হয়। কলেজ প্রশাসনের সহায়তায় প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিভাবকরাও ঐ শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কলেজ গেটে এক ঘন্টারও বেশি সময় অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন।

এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের ডিজিকে ঘটনা তদন্ত করে খুব দ্রুত ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৮ জুলাই শিক্ষক ও অভিভাবকরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মহানবীকে কটূক্তির বিষয়টি অবহিত করেন। এ সময় তারা মদন মোহন দাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। ঐ দিনও মদন মোহন দাস স্কুলে আসে, অফিসও করে। সহকর্মী কারও কারও সঙ্গে আঙ্গুল উঁচিয়ে মদন 'কলা' দেখায়। (তোমরা আমার কিছুই করতে পারবে না) তার বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ দেয়ায় তিনি তা পাত্তাই দেননি।

শুক্রবার ছুটির দিনের পর ৩০ জুলাই শনিবার সকাল থেকে ঐ ঘটনায় কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দুপুর ১টার দিকে শত শত শিক্ষার্থী মদন দাসের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশের সাহায্য নেয়া হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রওশন আরা আক্তার ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো ক্যাম্পাস ঘিরে রাখে পুলিশ।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রধান শিক্ষক রওশন আরা আক্তার বলেন, আমরা ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ পেয়েছি। ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও ডিজিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'আমার দেশ'কে বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ জানানোর আগেই আমি ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদের বলেছি, বিস্তারিত তথ্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদফতরের ডিজিকে জানাতে। আমি এ ব্যাপারে ডিজিকে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

জানা যায়, টাঙ্গাইলের অধিবাসী মদন মোহন দাস ২০১০ থেকে ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। সে বিভিন্ন সময়

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কটূক্তি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকদের উপরোক্ত কটূক্তির অভিযোগ ছাড়াও লিখিত অভিযোগে আরো বলা হয়- এর আগে বিদ্যালয়ে এই মদন মোহন দাস আরো অনেক অনৈতিক কার্যকলাপ করেছে। কোন ছাত্র দাড়ি রাখলে তাকে ছাগল বলে ডাকে এবং মারধর করে। মদন মোহন মুসলিম ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক সবার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে।

লিখিত অভিযোগসহ সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকরা হুঁশিয়া র করে বলেন- যদি সঠিক বিচার না হয়, তাহলে আমরা অভিভাবকরাই এ বিচার করতে বাধ্য হবো। প্রসঙ্গত ১৫ জুলাই গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার জিটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস মণ্ডল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করেছিল। ঐ ঘটনার পরে গোপালগঞ্জে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তিকারী টুঙ্গিপাড়ার শিক্ষক শঙ্করের বিরুদ্ধে মামলা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে ব্যঙ্গোক্তি করায় জিটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে টুঙ্গিপাড়া থানায় স্কুলের প্রধানশিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন বাদী হলে মামলা করেন। তাকে গ্রেফতারের জন্য জেলা পুলিশ রেড এলার্ট জারি করেছে।

গত ১৪ ই জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় টুঙ্গিপাড়ার জিটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ইংরেজী ক্লাশ নেয়ার সময় শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটাক্ষ করে দাড়ি রাখা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করে। এতে ঐ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ নিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ক্লাশ শেষে শিক্ষক বেরিয়ে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করে এবং বিক্ষোভ করে। এ ঘটনায় টুঙ্গিপাড়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশাসনের সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঐ শিক্ষকের জামাকাপড় আসবাবপত্র ও বিছানা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে স্থানীয় হাজার হাজার জনতা। বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঐ শিক্ষককে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি মুহাম্মদ মাজহারুল হক বলেন, ঐ

শিক্ষককে গ্রেফতারের জন্য রেড এলার্ট জারি করে দেশের সব থানায় ম্যাসেজ দেয়া হয়েছে। সীমান্তেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

প্রিয়তম নবীজির ভালবাসা

বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা, যিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। শেষ নবী হিসেবে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করে তার অনুকরণের মাধ্যমে তাকে ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল আলামিনের প্রতি, যার আনুগত্য ও ভালবাসা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও ভালবাসা লাভের মাধ্যম। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি যারা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় এবং সকল তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনসহ কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিম উম্মাহর প্রতি।

আরবি মাসসমূহের মধ্যে রবিউল আউয়াল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এ মাসে সাইয়েদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। আবার এ মাসেই তিনি আল্লাহপ্রদত্ত রিসালাতের সকল দায়িত্ব পালন শেষে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে অনেক মতভেদ রয়েছে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির ও মুফতি হযরত শফি সাহেব (রহ.) 'সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া' গ্রন্থে লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। অপরদিকে আররাহীকুল মাখতুমের লেখক আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। তবে সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যদিও তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এ মাসের ১২ তারিখ সোমবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এব্যাপারে কোন ঐতিহাসিকের মতভেদ নেই।

নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা এবং তার প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা ঈমানের অংশ। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী

রহ. বুখারী শরীফে স্বতন্ত্র একটি শিরোনাম এনেছেন যার অর্থ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ'

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট নিজ পিতা-মাতা, সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয় না হই। (বুখারী শরীফ)

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করল, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করল এবং আল্লাহর জন্য (সম্পদ) ব্যয় করা থেকে বিরত থাকল, নিশ্চয়ই সে স্বীয় ঈমানকে পরিপূর্ণ করল। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

হাদিসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা ঈমানের পূর্ণতা লাভের পূর্বশর্ত।

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,"(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের বংশ, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের এমন ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর; আল্লাহ ও তাঁর রাসূর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা তওবা, আয়াত-২৪)

আয়াতের মর্ম হলো যারা দুনিয়াবি সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্পর্ককে উপেক্ষা করেছে তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। দুনিয়ার মধ্যেই সে আজাব আসতে পারে। তবে আখেরাতের আজাব অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

উল্লেখিত আয়াতে সকল মুসলিমদের প্রতি এ আদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তরে অন্য কারো ভালবাসার স্থান পায় না। তাই যার ভালবাসা এ স্তরে নেই সে শাস্তির যোগ্য।

তাই মুসলিমগণ আন্তরিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান ও ভালবাসাকে ওয়াজিব মনে করে। নিচে এ বিষয়ে কতিপয় নির্দেশনা উল্লেখ করা হল-

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর অত্যাবশ্যকীয় করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে

ঈমানদারগ! তোমরা কোন ব্যাপারেই আল্লাহ ও তার রাসূরের সামনে অগ্রণী হয়ো না। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১) এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবর্তমানে তাঁর আনীত শরীয়ত ও আল্লাহর হুকুমের সামনে কারো কোন মত বা পথ গ্রহণ যোগ্য হবে না।

২. আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও ভালবাসাকে ফরয করে বলেন, (হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার আনুগত্য কর। ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ৩১) যার আনুগত্য করা ওয়াজিব তার বিরোধীতা বা অবাধ্যতা করা হারাম। সমস্ত কাজে তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা আবশ্যক।

৩. আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেতা ও বিচারকরূপে পাঠিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি সে অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার মিমাংসা করেন যা আল্লাহ আপনাকে জানিয়েছেন। (সূরা আননিসা : আয়াত-১০৫)

৪. আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের মহাব্বতকে ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তাঁর পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ হতে অতি প্রিয় না হই। (বুখারী শরীফ) তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ওয়াজিব।

৫. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম সিরাত-সুরাত, সর্বগুণে গুণান্বিত, সৃষ্টির সেরা ও সর্বোৎকৃষ্ট মানব হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এমন চরিত্র ও সৌন্দর্যের অধিকারীকে সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্যই জরুরি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত আলোচনা করা যেমন পুণ্যের কাজ তেমনিভাবে তার সুরত বা দৈহিক গঠন নিয়ে আলোচনা করাও পুণ্যের কাজ। কিন্তু দৈহিক সুরত নিয়ে আলোচনার মাঝে আমাদের করণীয় কিছু নেই। শুধু আলোচনার দ্বারা সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ শত চেষ্টা করেও আমাদের সুরতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরতের ন্যায় করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে তার সিরাত নিয়ে আলোচনার দ্বারা সওয়াব পাওয়ার পাশাপাশি অনুরূপ চরিত্র গঠনের আশা করা যায়, যা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। সত্যিকারার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার অর্থ হলো, তিনি যে সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন সেগুলোর চর্চা করা

ও নিজের মাঝে সেগুলোর বাস্তবায়ন করা এবং যে সকল বিষয় তিনি পরিহার করেছেন ও পরিহার করতে বলেছেন তা পরিহার করা।

এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত দ্বীনকে তোমরা আঁকড়ে ধর, আর যা তিনি নিষেধ করেছেন তা পরিহার কর।" (সূরা হাশর : আয়াত-৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা পরকালে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-২১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, রাসূলের চরিত্র হল আল কুরআন। অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত সকল গুণাগুণ, যেমন- সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, কোমল স্বভাব, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এতিম-অসহায় ও বিধবাদের সহায়তা করা, গৃহ পরিচারিকা, খাদেম, অধীনস্ত, স্ত্রী, পরিবার, পরিজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল।

তাই আমাদের উচিত রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসাকে সীমিত না রেখে বছরের প্রতিটি দিনে, প্রতিক্ষণে, প্রতি মাসে এক কথায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে বাস্তবায়ন করা।

কোরআন ও হাদিসে প্রত্যেকটি বিষয় যেভাবে এসেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবে আমল করেছেন বা করতে বলেছেন সেভাবে করা বা মেনে নেয়ার নামই হল ইবাদত। এতে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি করাকে শরীয়ত সমর্থন করে না। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার ব্যাপারে তিনি যেভাবে ভালবাসতে বলেছেন বা সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবে ভালবাসা দেখিয়েছেন সেভাবে ভালবাসাই হল ইবাদত। এতে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি করা শরীয়ত সমর্থন করে না। পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধও করেছেন।

তিনি বলেছেন, খ্রিস্টানরা যেমনভাবে ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আ.) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা তেমনিভাবে আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারি ও মুসলিম)

এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন করা। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হাজির নাজির বলা, তিনি নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন, তার নামে কসম খাওয়া, তার নামে মান্নত করা, তার নিকট দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি আল্লাহর গুণ দ্বারা গুণান্বিত করা। এ ধরণের কার্যকলাপ শরীয়তে গর্হিত। তাই এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকব।
সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা ছিল নজিরবিহীন। যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থুথু হাতে মুখে মেখেছিলেন এবং উহুদ প্রান্তরে তালহা রা. নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঢাল হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। তাতে তার দেহে ৭০টি তীরের আঘাত লেগেছিল। এ ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের নবীপ্রেমের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তারা কোন দিন এ ধরণের বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, আড়ম্বরতা, মুখরোচক শ্লোগান ও লৌকিকতাপূর্ণ মাসিক বা বার্ষিক প্রথা হিসাবে কোন অনুষ্ঠান পালন করেননি। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা রাসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেছেন। ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদের মত সুন্নাতের অনুকরণ ও আদর্শে আদর্শবান হওয়াই ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ।
এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা ঈমান আন যেমনি ঈমান এনেছেন মানুষগণ' (অর্থাৎ সাহাবাগণ)। (সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৩) সুতরাং তাদের ঈমান ও আমল অনুযায়ী আমাদের ঈমান ও আমল হওয়া উচিত। তাদের ঈমান ও আমলের প্রতি আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে বলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-২২)

ক্ষমা ও সহনশীলতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

গভীর রাত। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সারাটা জগৎ। আকাশে চাঁদ থাকবে তো দূরে থাক, নক্ষত্র পর্যন্ত নেই। এমনকি কারো ঘরে সামান্য আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। দুনিয়াটা যেন অন্ধকারের নিকট পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। আর তাই সারা গংদের হয়রানি শুরু হয়ে গেল। একদিকে তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ হতে লাগল, অপরদিকে কুফুর, শিরক ও পৌত্তলিকতার আওয়াজ লোপ পেতে শুরু করল। মোটকথা, ইসলামের এ অগ্রযাত্রার জয়ধ্বনি দেখে কাফির শক্তি হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা ফন্দি আটতে শুরু করে কী করে ইসলামের এ দাবানল প্রতিরোধ করা যায়? কী করে মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ

মিশনকে নস্যাৎ করে দেয়া যায়? কী করে মুসলমানদের এ ইনতিফাদাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়। মক্কার কুফুর-শক্তি যারা কিছুদিন পূর্বেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাবাদী, যাদুকর বলে অহেতুক গালি দিতে শুরু করল। তারা নওমুসলিমদের ফকির-মিসকিন আর কলঙ্কের দল হিসাবে আখ্যা দিতে শুরু করল। কিন্তু তাতে তারা সামান্য লাভবান হয়নি। ইসলামের এ গণজাগরণকে ঠেকাতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা কাপুরুষের ন্যায় অসহায় মজলুম মুসলমানসহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর শুরু করে দেয় অত্যাচার-অনাচার সর্বপ্রকার নির্যাতন আর নিপীড়ন। কিন্তু তবু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিশনকে চালু রেখেছেন। কাফির শক্তির হুংকারের বিপরীত তাদের কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেছেন। গালি ও মন্দচারিতার বিপরীত তিনি কাফেরদেরকে বুঝিয়েছেন যে, "আমি তো কোন অন্যায় করিনি, মিথ্যা বলিনি, তবুও কেন আমাকে অহেতুক গালি দিচ্ছ? মানুষকে গালি দেয়া ভাল নয়।"

অন্যায় অত্যাচারের বিপরীত তিনি কাফেরদেরকে ভালবাসা দিয়েছেন। বদদুআর বিপরীত তিনি দুআ করেছেন- "মালিক হে আমার! জাতি বোঝে না, জানে না, তুমি তাদের উপর গযব দিও না। তারা যদি জানত, বুঝত, তাহলে আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করত না। তুমি তাদেরকে বুঝ দান করো। হিদায়াত প্রদান করো। ক্ষমা করো।"

মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

উম্মে জামিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সর্বদা শত্রুতা পোষণ করত। সে জঙ্গল থেকে বোঝা বাবুল কাঁটা এনে রাত্রিকালে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের গমন পথে ছড়িয়ে দিত। যেন ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় কাঁটাগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে বিদ্ধ হয়। কিন্তু তার এ কাজের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্তক ছিলেন। পথের কাঁটাগুলোকে প্রতিদিন সরিয়ে দিতেন যেন কাঁটাগুলো অন্যের পায়ে বিদ্ধ না হয়।

এমনি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পথের কাঁটা পাননি। ভাবলেন, উম্মে জামিল নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। তখন তিনি ঐ দিনই তার বাড়িতে গিয়ে তার অবস্থা জানতে গিয়ে তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন। এরকমই ছিল রাসূলের মন। হৃদয় ছিল যার দয়া-মমতায় পরিপূর্ণ। অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করা ছিল যার সুন্নত। স্বীয় শত্রুর সাথে এরূপ সুন্দর ব্যবহার আর কে করতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী খাদীজা (রা.) এবং চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশ কাফিররা তাঁর উপর বেপরোয়াভাবে নির্যাতন শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে মক্কায় ইসলাম প্রচার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তিনি মক্কার ৭০ মাইল দূরে তায়েফে গমন করেন এবং মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিন্তু তায়েফের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণের বিপরীততে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানা ধরণের গালি দিতে শুরু করে দেয় এবং তায়েফের কতিপয় ব্যক্তি বাজারের কিছু ইতর ও গোলামদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়। যার ফলে বখাটে ছেলেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এতে তাঁর সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ করুণ দৃশ্য দেখে তায়েফবাসীদের অন্তরে সামান্য দয়ারও সঞ্চার হয়নি বরং তারা দর্শকের ন্যায় তামাশা দেখছিল, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দেয়ার জন্য ছেলেদেরকে আরো উত্তেজিত করছিল। আঘাতের ব্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পা আর চলছে না। অবসন্ন দেহে তিনি পাথরে কংকর ও ধুলির মধ্যে বসে পড়লেন। কিন্তু নির্দয় পাষণ্ড তায়েফবাসীরা তাকে বসতেও দেয়নি। তারা জোরপূর্বক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসা থেকে উঠিয়ে তায়েফ ত্যাগ করতে বললো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি কষ্টে আস্তে আস্তে তায়েফ ত্যাগ করেন। তায়েফবাসীদের এ অত্যাচার মক্কার কাফেরদের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছিল। তাদের এ অমানবিক পাশবিকতা ও নৃশংসতা দেখে আল্লাহ তা'আলা পর্বতরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে রাসূল! আমি পর্বতরক্ষী ফেরেশতা। যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে আখশাব নামক পর্বত দু'টি উঠিয়ে চাপা দিয়ে এদেরকে ধূলিসাত করে দেবার জন্য আমি প্রস্তুত।

কিন্তু অত্যাচারে জর্জরিত, প্রস্তরাহত, অপমানিত মহামানব উত্তর দিলেন, "আমাকে তাদের উপর গযব অবতীর্ণ করানোর জন্য পাঠানো হয়নি। তারা তো জানে না, বোঝে না। আমি ইতিপূর্বেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, এখনও করছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। মালিক হে! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিও না। এর জন্য তাদের কোন দোষ নেই। আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা।"

কি মহান সে আত্মা!যিনি কষ্টদাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন!! গালিদাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। শত্রুর সাথে মধুর আচরণ করেছেন।

ধৈর্যের পাহাড় তিনি

নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরটি বছর যাবৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্য অবলম্বনের যে কৃতিত্ব স্থাপন করে গেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মত এমন অসম ধৈর্যশীল আর কেউ হতে পারবে না। অতীতেও কোন নবী রাসূল সহনশীলতায় তাঁর ন্যায় ছিলেন না। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দীন প্রচার করতে গিয়ে এক পর্যায়ে নিরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। আল্লাহ তার দুআ কবুল করলেন এবং সমস্ত দুনিয়া প্লাবনে ভাসিয়ে দিলেন। লুত আ. এক চরম পর্যায়ে উপনীত হলে তাঁর বদদুআয় গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দেন। তেমনিভাবে ঈসা (আ.) ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়।

কিন্তু সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়ে যখন ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন, তখনই শুরু হয়ে যায় তার উপর নির্যাতন-নিপীড়ন। সাহাবীগণের উপর চলে জুলুম-অত্যাচার। তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাবাদী, যাদুকর, আর সাহাবাগণকে সমাজের কলঙ্ক ইত্যাদি আখ্যা দিতে শুরু করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত বাধা প্রতিকূলতার মাঝেও ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের কাজ করে গেলেন। মক্কার কুরাইশরা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু তালিব উপত্যকায় আবদ্ধ করে রেখেছিল, তখন মুসলমানদেরকে বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। তায়েফবাসীরা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাঁর দেহ মুবারক। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) এর মাতাকে শহীদ করা হয়। শহীদ করা হয় অন্যায়ভাবে হারেস (রা.)কে। সবার চোখের সামনে তাদের রক্ত প্রবাহিত হলো।

ঈমানের পরিপূর্ণতা ও রাসূলপ্রেম

ভালবাসা বা মুহাব্বত দুই প্রকার। এক.বুদ্ধি বা জ্ঞানভিত্তিক মুহাব্বত। দুই. স্বভাব ও জৈবিক মুহাব্বত। স্বভাবগত মুহাব্বত হলো যাতে জ্ঞান-বুদ্ধির কোন দখল নেই। যথা-সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মুহাব্বত কিংবা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মুহাব্বত। আর বুদ্ধি বা জ্ঞান ভিত্তিক মুহাব্বত হলো, যেখানে স্বভাবগত চাহিদার কোন দখল নেই। যথা- রোগীর মুহাব্বত ঔষধের প্রতি। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ঔষধের প্রতি মুহাব্বত থাকা এটা স্বভাব বা জৈবিক কোন চাহিদা

নয়। মূলতঃ এটা জ্ঞান-বুদ্ধির চাহিদা। কেননা, যদি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার রোগ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাকে ঔষধ অবশ্যই সেবন করতে হবে। এমনিভাবে শরীরের কোন অঙ্গ দূষিত হয়ে পড়লে, সেটা অপারেশনের জন্যে কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া অর্থ এই নয় যে, স্বভাব এতে সন্তুষ্ট বা এ অপারেশনকে সে স্বভাবতঃ মুহাব্বত করে। বরং জ্ঞান ও বুদ্ধির চাহিদা হলো- এ দূষিত অঙ্গটুকু সুস্থ দেখতে হলে, নিজেকে কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে অবশ্যই সোপর্দ করতে হবে।

এই বুদ্ধিভিত্তিক মুহাব্বত কোন সময় এমন প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, সেটা স্বভাবগতঃ মুহাব্বতের উপরও প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং উল্লেখিত হাদীসে দু'জাহানের সর্দার মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যে ধরণের মুহাব্বত বা ভালবাসা রাখতে বলা হচ্ছে, অভিজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের মতে, সেটা জ্ঞান-বুদ্ধি ভিত্তিক মুহাব্বত বা ভালবাসাই উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে- মুহাব্বত বা ভালবাসা মানুষের একটা অনিচ্ছাধীন বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার অনিচ্ছার বিষয়ের মুকাল্লাফ বানাননি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য একটা অনিচ্ছাধীন বিষয়কে কেন নির্ধারণ করলেন? জবাবে বলা হয়- এ স্থলে মুহাব্বত বা ভালবাসা দ্বারা ইচ্ছাধীন ভালবাসাই উদ্দেশ্য।

ইচ্ছাধীন ভালবাসা মানে- যে সকল কারণ ও গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে মুহাব্বত বা ভালবাসার সৃষ্টি হয়, সে সকল কারণ ও গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আর মুহাব্বত বা ভালবাসার কারণ ও সকল গুণালীর সমন্বয় ঘটেছে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে। সুতরাং ঐ সকল কারণ ও গুণাবলী নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্যেই এ হাদীসে বলা হচ্ছে।

ভালবাসার এক কারণ : নৈকট্য

ভালবাসার যে সকল কারণ রয়েছে, তার মধ্যে এক কারণ হলো- নৈকট্য। উদাহরণস্বরূপ একই ক্লাশের দুই সাথী একই রুমে বসবাস করে এবং একই সাথে উঠাবসা, পড়াশুনা, পানাহার করে। তখন এ দু'জনের মাঝে নৈকট্যের কারণে মুহাব্বত বা ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমাদের নৈকট্য আত্মার চাইতেও অধিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত মুমিনের সম্পর্ক আত্মার চাইতেও অধিক।" তার কারণ- মানুষের আত্মার ভিতর

ভাল এবং মন্দ উভয় দিক রয়েছে। যদি আত্মা মানুষকে ভাল কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তো ভালো। আর যদি মন্দ কাজে বাধ্য করে, তাহলে আর ভাল থাকলো কোথায়? কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত মু'মিনের সম্পর্ক একমাত্র মঙ্গলের উপরই ভিত্তি করে।

আর যদি কারো আত্মায় শুধু ভালোর দিকটাই প্রাধান্য পায়, তবুও মন্দের মোহ সেখানে অবশ্যই অবশিষ্ট থাকে। অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ও শিক্ষার মাঝে মু'মিনের জন্য শুধু মঙ্গল আর মঙ্গলই নিহিত। অমঙ্গলের লেশমাত্র সেখানে নেই। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এর সঙ্গে মু'মিনের সম্পর্ক আত্মার চেয়েও অধিক হবে না কেন? অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোন মু'মিন এমন নেই, যার জন্যে আমি ইহকাল ও পরকালে অধিক উত্তম সম্পর্কের অধিকারী নই। যদি তোমাদের মনে চায়, তাহলে তোমরা কুরআনের এ আয়াতটি পড়ে নাও- 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনের জন্য সকল কিছুর চাইতে অধিক উত্তম সম্পর্কশীল।"

সারকথা এই দাঁড়ায় যে, যদি নৈকট্যের কারণে ভালবাসতে হয়, তাহলে সকলের চেয়ে অধিক ভালভাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বাসতে হবে।

ভালবাসারদ্বিতীয় কারণ : সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা

ভালবাসার ২য় কারণ- সৌন্দর্য, সুশ্রী ও উন্নত চরিত্রের অভিলাষী হওয়া। এটা ৩ ভাগে বিভক্ত : এক.আকৃতি সুন্দর ও সুশ্রী হওয়া। দুই.ব্যবহার উত্তম ও অমায়িক হওয়া। তিন. কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর হওয়া। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে এ তিনের সমন্বয় ঘটেছে। হযরত নু'মান ইবনে ছাবিত রা. তাঁর সৌন্দর্যের নকশা এভাবে এঁকেছেন- "তাঁর অপেক্ষা অধিক সুন্দর কেউ আমার নজরে কোনদিন পড়েনি এবং তাঁর অপেক্ষা অধিক সুশ্রী সন্তান কোন মা জন্ম দেননি। সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত করে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি যেভাবে চেয়েছেন, তাঁকে যেন সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

হযরত জাবির ইবনে ছামুরা রা. বলেন, "একদা জ্যোস্না রজনীতে চাঁদ জ্বলজ্বল করছিল আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকা লালচে পোষাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি একবার উজ্জ্বল চাঁদের দিকে, আরেকবার মহানবীর চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম যে, এ দুয়ের মাঝে কে অধিকতর সুন্দর। অবশেষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর।"

আজ কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এক হিন্দু কবি এ জ্বলন্ত সত্যটুকু স্বীকার করতে গিয়ে বে-ইখতেয়ার গেয়ে উঠেছেন-

“অবয়ব তব আয়না যেমন
নেহী যার তুলনা।
খুঁজে নাহি পাই মন মুকুরে
তাহা খুঁজে নাহি পাই অন্য কোথা।”

যদি কেউ হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে বলে যে, তাঁকে আল্লাহ সকলের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য দান করেছেন। তার জবাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, “হযরত ইউসুফ আ. হলেন ‘সাবীহ’, আর আমি হলাম ‘মালীহ’। উভয় শব্দের অর্থ সৌন্দর্যময়। তবে ছাবীহ বলা হয় ঐ সৌন্দর্যকে, যা দেখে মানুষ ক্ষণিকের জন্যে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা ও নিরীক্ষণের পর সে অবস্থা স্থায়ী থাকে না। পক্ষান্তরে ‘মালীহ’ বলা হয় ঐ সৌন্দর্যকে, প্রথমেই যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। বরং ধীরে ধীরে তার বাস্তবতা ফুঠে উঠে।”

হযরত আলী রা. বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম কেউ দেখলে, ভয় পেয়ে যেতো। কিন্তু যখন তাঁর সংস্পর্শে আসতো, তখন তাঁর সঙ্গে গাঢ় মুহাব্বত ও ভালবাসার সৃষ্টি হতো।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারিত্রিক মাধুর্য

মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রমাধুর্য লিখে শেষ করার মত নয়। কেননা, হযরত আয়েশা রা.কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র হলো পবিত্র কুরআন।”

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম শিখরে আরোহণ করিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

“নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।”

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরিত্র মাধুর্যের দৃশ্য দেখে কঠিন থেকে কঠিনতম প্রাণ কত পাষণ্ড কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে; যার সংখ্যা গণনা নেই।

সুতরাং যদি কারো চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালবাসতে হয়, তাহলে সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই যে পাবেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এর মনোহরী কণ্ঠস্বর :
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠস্বর এমন সুমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর ছিল যে, কাফিরদের কর্ণকুহুরে তা পৌঁছামাত্র তাদের অন্তর মোমের ন্যায় বিগলিত হয়ে যেত। তাঁর পবিত্র কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য কাফিররা মসজিদে নববীর দেয়ালের পাশে এসে লুকিয়ে গা ঘেঁষে বসে যেতো। এমতাবস্থায় গোটা রাত অতিবাহিত হয়ে গেলেও তাদের খবর থাকত না।

ভালবাসার ৩য় কারণ : পরিপূর্ণতা

ভালবাসার ৩য় কারণ হলো, 'কামাল' তথা পরিপূর্ণতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কামালাত সম্পর্কে জনৈক কবির পঙক্তিটি খুবই চমৎকার-

হে মোর সুন্দরতম! হে নব রতন! চাঁদেরে
দিয়েছে জ্যোতি তোমারই আনন।
অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার;
সংক্ষেপে খোদার নীচে তোমারি আসন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরের ঐ অংশ যা আজ মাটির সঙ্গে মিলে আছে, তা কাবার চেয়েও উত্তম। কেউ বলেছেন, আরশ থেকেও উত্তম।

ভালবাসার ৪র্থ কারণ : দয়া-দাক্ষিণ্য

ভালবাসার ৪র্থ কারণ হলো- দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা। আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে- الاِنْسَانُ عَبْدُ الإِحْسَانِ
"মানুষ অনুগ্রহের গোলাম"। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি মানব জাতিকে কুফর ও শিরকের আঁধার থেকে টেনে তুলে হিদায়াতের আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন।
জনৈক কবি বলেন,

কুফর শিরকের তমসায় লীন
যবে তামাম দুনিয়া
হেরে নূর তব হলো সমুজ্জ্বল
দিগ-দিগন্ত ব্যাপিয়া।

শেখ সাদীর ভাষায় :

করিলেন অত্যুন্নতি তিনি পূর্ণতায়,
নাশিলের তমোরাশী সৌন্দর্য প্রভায়।
মনোহর, আহা! তাঁরি কার্য সমুদয়,
পাঠাও দরুদ সবি তাহারি আত্মায়।

নৈকট্য, সৌন্দর্য, কামাল-পরিপূর্ণতা, অনুগ্রহ-মুহাব্বত ভালবাসার এ চারটি কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়

ঘটেছে। সুতরাং এ সকল গুণাবলীর ভিত্তিতে তাঁকে সকলের চেয়ে অধিক মুহাব্বত করা এটা ঈমানী দায়িত্ব তথা ঈমানের পরিচায়ক, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা-ই হবে জ্ঞান-বুদ্ধি ভিত্তিক ভালবাসা। তা-ই ইচ্ছাধীন ভালবাসা। এর অন্তরালে মনের সুগভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের সংমিলন পরিপূরক বটে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইচ্ছাধীন ভালবাসার সারকথা হলো এই যে, তিনি আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা এবং তাঁর নিষেধাবলীকে বর্জন করা। তার দাবীকে মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান তথা সকল মানুষের দাবীর উপর প্রাধান্য দেয়া। এর বিপরীত ভূমিকা নিয়ে মুখে মুখে রাসূল প্রেমের দাবী করা ঠাট্টা-বিদ্রূপের নামান্তর।

তাই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য প্রয়োজন যদি সে স্বীয় ঈমানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষণ করতে চায়, তাহলে সে যেন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা ও প্রেমের দ্বারা স্বীয় অন্তরকে সমৃদ্ধশালী ও পরিপূর্ণ করে এবং রাসূল প্রেমের আঁচলে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শকে সার্বিকভাবে মেনে চলে।

ইসলামে দাসপ্রথা ও বিচক্ষণ দাসের কাহিনী

আমরা যেমন মানুষ, দাসরাও তেমনি মানুষ। তাদেরকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই। তাদের প্রতি অবিচার করা, তাদেরকে হেয় মনে করা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। ইসলাম দাসদের স্বতন্ত্র বিধি-বিধান দিয়েছে। দাসদের যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে অন্য কোন ধর্মে তার কিঞ্চিত পরিমাণ দেয়নি।

'দাস' শব্দটি শুনলে বাবাজীদের গা শিউরে ওঠে। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, "মুসলমানদের কেমন ধর্ম! তাদের ধর্মে 'দাস' প্রথার প্রচলন আছে!" এই বলে তারা মুসলমানদেরকে ধিক্কার দিয়ে থাকে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে, মুসলমানদের ধর্ম অমানবিক। অথচ ইহুদী-খৃষ্টানরা গোলামদেরকে যে শাস্তি দেয় তা শুনলে গা শিউরে ওঠে। মনে হয় দাসদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম দাসদের যে অধিকার প্রদান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেমাত্রই দাস রয়েছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন লোকদের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা শিক্ষাবিশারদ মোসি গোস্তাও লিবানন তার 'আরবের তামুদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন, "বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-

পুস্তকে কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি দাস শব্দটি উচ্চারিত হয়, তবে তার মানসপটে এমন এক দল মানুষের চিত্র ফুটে উঠবে যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে। গলায় বেড়ি টানানো হয়েছে এবং বেত্রাঘাত করতে করতে সামনে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের জন্য বরাদ্দ সামান্য খাদ্য প্রাণটা কোনরূপে দেহে আটকে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা কিছুই পায় না।

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক সময় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা থেকে উত্তম কোন উপায় থাকে না। কেননা, দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক হতে তিন অবস্থা হতে পারে। এক.হত্যা করা হবে। দুই.না হয় মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে। তিন. নতুবা যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা ক্ষতিকারক প্রমাণিত হয়। কোন কোন বন্দি উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে হতে পারে স্বদেশে গিয়ে সে মুসলমানদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থায়ই অবশিষ্ট থাকে। হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দি রেখে বর্তমান যুগের ন্যায় কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলো পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি।

বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, (তরজমা) "তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্ত হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দিতে হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসলিম)

সামাজিক ও সাংস্কৃতি অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সে মতে, অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি বরং আল্লাহ পাক মালিকদেরকে বলেছেন, (তরজমা) "তোমরা দাসদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও।" এমনকি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকে বিবাহ করতে পারে। তারা জিহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তারা স্বাধীন মুজাহিদদের সমান। শত্রুকে যে কোন ধরণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তি তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের। কুরআন ও হাদীসে

তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে রূপ নিবে।

হযরত আলী রা. বলেন, দু'জাহানের সরদার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান সেই বাণীগুলো এই ছিল "নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো। তোমাদের অধীনস্ত দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

(আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদের শিক্ষা-দীক্ষার্জনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দাসদের অন্তর্ভুক্ত।

দাসদের মুক্ত করার ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বহুস্থানে বর্ণিত হয়েছে। যাতে মনে হয়, অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকাহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদের মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযা, হত্যা ও যেহারের কাফফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথা বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করা। এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি দাসকে মুক্ত করল সে যেন জাহান্নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করল। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল, তারা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন।

এবার শুনুন বিচক্ষণ দাসদের ইতিবৃত্ত। ইসলামের ছায়াতলে অনেক বিচক্ষণ দাস অতিবাহিত হয়েছে। তাদের একজন হলেন লুকমান হাকীম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নামে একটি সূরা অবতরণ করেছেন। তাঁর উপদেশাবলী কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন। আমরা তার থেকে অনেক উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ১. হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় অতঃপর যদি তা থাকে প্রস্তর গর্ভে, অথবা আকাশে অথবা ভূগর্ভে,তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন।

২. হে বৎস! নামায কায়েম করো। সৎকাজের আদেশ করো, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

৩. অহংকারবশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যক স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

একদিন হযরত লুকমান হাকীম বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি সেই ব্যক্তি যে আমার সাথে অমুক স্থানে ছাগল চরাত? লুকমান হাকীম বললেন, হ্যাঁ আমি সেই লোক। অতঃপর লোকটি জানতে চাইলো, আপনি এ মর্যাদা কীভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্য উদগ্রীব?

উত্তরে লুকমান বললেণ, এর জন্য আমার দু'টি কাজ করতে হয়েছে। এক.সর্বদা সত্য বলা। দুই. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এমন কতগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। তুমি সেগুলো যথারীতি পালন করলে তুমিও এ মর্যাদা লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো হলো- (১) নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা। (২) মুখ বন্ধ রাখা। (৩) হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা। (৪) নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ রাখা। (৫) সত্য কথায় অটল থাকা। (৬) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। (৭) মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের সম্মান প্রদর্শন করা। (৮) প্রতিবেশীর হক আদায় করা। (৯) অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।

এমনিভাবে অন্য এক গোলামের কথা শুনুন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের পিতার নাম ছিল মুবারক। তিনি ছিলেন খোদাভীরু এবং আল্লাহওয়ালা। তাঁর মালিক তাকে উদ্যানের মুহাফেয নিযুক্ত করেছিলেন। একদা তাঁর মালিক বাগানে এসে তাঁর নিকট মিষ্টি আনার চাইল। তিনি কোন এক গাছ হতে একটি আনার নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আনারটি ছিলো খুবই টক। তাই মালিক রেগে বললেন, আমি তোমার কাছে মিষ্টি আনার চাইলাম আর তুমি আমাকে টক আনার দিলে?যাও মিষ্টি আনার নিয়ে এসো।

তিনি অন্য একটি গাছ থেকে আরেকটি আনার আনলেন। ঘটনাক্রমে সেটাও খুব টক ছিলো। মালিক এতে আরো বেশি রেগে গেলেন। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটল। তখন মালিক বললেন, তুকি কি জানো না কোন গাছের ফল মিষ্টি আর কোন গাছের ফল টক? মুবারক উত্তর দিলেন, না জানি না।

মালিক : কেন?

মুবারক : কিভাবে জানবো? আমিতো কখনো তা খেয়ে দেখিনি।

মালিক : কেন খাওনি?

মুবারক : আপনি তো আমাকে কখনো ফল খাওয়ার অনুমতি দেননি। অতঃপর মালিক তার কথার সত্যতা যাচাই করে আসল রহস্য বুঝতে পেরে খুবই অবাক হলেন এবং স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এই নারীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা এখন যে গোলামের আলোচনা করতে যাচ্ছি সে গোলামও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। গোলামটি মনিবের সাথে তিনটি শর্ত করলেন। এক.নামাযের সময় হলে আমাকে নামায পড়তে নিষেধ করবেন না। দুই. আমার থেকে দিনে কাজ নিবেন, রাতে আমাকে ছুটি প্রদান করবেন। তিন. আমার জন্য একটি ঘর বরাদ্ধ করে দিবেন, সে ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।

দেখুন, গোলামটি কেমন শর্ত জুড়ে দিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, গোলামটি খুব আল্লাহওয়ালা ছিলেন। মনিবও ভাল মানুষ ছিলেন। গোলামের শর্তগুলো পূরণ করলেন। মনিব তাকে লক্ষ্য করে বললেন, অনেকগুলো ঘর রয়েছে। যেটা তোমার পছন্দ হয় সেটাকেই গ্রহণ করতে পার। গোলাম ঘরগুলো প্রদক্ষিণ করে এক অনাবাদি গৃহ পছন্দ করলেন। মনিব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অনাবাদি গৃহ কেন পছন্দ করলে? গোলাম বলল, হে আমার মনিব! আপনার অবশ্যই জানা আছে, অনাবাদী গৃহে যদি আল্লাহ থাকেন তাহলে সেটা আর অনাবাদী থাকে না। সেটা আবাদী হয়ে যায়।

গোলাম রাতে সেই গৃহেই অবস্থান করতে লাগলেন। কোন এক রজনীতে মালিক শরাব ও আনন্দ-ফূর্তির আসর বসাল। রাত্রি যখন অর্ধ হল এবং শরাবখোররা যার যার মতো আপন আলয়ে চলে গেল তখন মনিব ঘরগুলো প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। একসময় সেই গোলামের ঘরে এসে আকাশ থেকে আলোকচ্ছটা দেখে চমকে উঠলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন, গোলামটি সেজদায় পড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলছেন। সে বলছে, 'হে আমার প্রভু! আপনি আমার উপর দিনের বেলায় মনিবের খেদমত আবশ্যক করে দিয়েছেন, যদি তার খেদমতের দায়িত্ব না থাকত তাহলে রাতদিন আপনার খেদমতেই কাটিয়ে দিতাম। অতএব, আপনি আমার ওযর আপত্তি কবুল করুন।'

অন্ধকার চিরে ভোরের রবি বের হওয়া পর্যন্ত চলতে লাগল তার প্রকৃত মনিবের সাথে প্রেমালাপ। ফোকাসটি উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত হল। ছাদের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেল। মনিব তার স্ত্রীকে এসে গত রাতের দেখা ঘটনাটি হুবহু ব্যক্ত করলেন। পরের রাতে মনিব ও তার স্ত্রী গোলামের রুমের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ গত রাতের দৃশ্য পরিস্ফূটিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে ফানুসটি এসে গেল। গোলাম সুবহে সাদিক পর্যন্ত সেজদা ও মুনাজাতে কাটিয়ে দিল। অতঃপর তারা গোলামকে ডাকলেন।

মনিব তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এখন থেকে তুমি তোমার আসল মালিকের ইবাদত পুরোপুরি করতে পারবে, যার কাছে তুমি গত রাতে ওযর-আপত্তি পেশ করতেছিলে। তারা তাকে এও বললেন যে, আমরা তোমার সব কারামতি দেখেছি। যখন গোলাম তাদের এ কথা শুনল, সাথে সাথেই সে

আল্লাহর দরবারে হস্ত প্রসারিত করে বলল, " হে আমার প্রভু! আমি আপনার সকাশে দরখাস্ত করেছিলাম, আপনি আমার এই ভেদ কাউকে জানাবেন না। যখন আপনি জানিয়ে দিয়েছেন, তখন আমাকে আপনার কাছে উঠিয়ে নিন।" দেখা গেল সাথে সাথেই আল্লাহর এই ওলী নশ্বরজগত থেকে পরজগতে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত হাসান বসরী রহ. এক গোলাম ক্রয় করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী আহার করবে?উত্তরে সে বলল, আপনি আমাকে যা আহার করাবেন আমি তাই আহার করবো। আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কী পরিধান করবে? সে উত্তরে বলল, আপনি যা পরিধান করাবেন তাই আমি পরিধান করবো। এবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কেমন বিছানায় শয়ন করবে? উত্তরে সে বলল, আপনি যে বিছানায় শয়ন করাবেন আমি সে বিছানাতেই শয়ন করবো।

এসব শুনে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বুঝে ফেললেন যে, এ গোলামটি সাধারণ গোলাম নয়। আল্লাহর সাথে তার মুআমালা পরিষ্কার। তাই তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন। হাদীসে এসব আল্লাহওয়ালা গোলামদের জন্য সুসংবাদ এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন শ্রেণীর লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। এক.যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে। দুই. যে মনিব স্বীয় বাদীকে মুক্ত করল এবং সুন্দর আদব তরবিয়াত দেয়ার পর বিবাহ করল। তিন. যে লোকটি আমার পূর্বের যুগ পেয়েছে সে ঐ যুগের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমার যুগ পাওয়ার পর আমার উপরও ঈমান এনেছে।

সাহাবাবিদ্বেষের পরিণাম

চেহারা বিকৃতি :

হযরত ইমাম ইবনে আবুদ্দুনিয়া (রহ.), হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী (রা.) বলেন : একদা মক্কা মোআজ্জমায় আমরা কা'বা শরীফের অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলাম। সহসা একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হলো। যার অর্ধেক চেহারা ছিল কালো আর বাকিটুকু ছিল সাদা। সে এসে বলল, হে লোক সকল! আমার চেহারার অবস্থা থেকে আপনারা তাথেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমি খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা যথাক্রমে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা.কে গালি-গালাজ করতাম। তখন এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন আমার চেহারায় থাপ্পর মেরে বলল, এসো হে আল্লাহর দুশমন! এসো হে ফাসেক! তুমিই কি হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. দ্বয়কে গালাগালি করছিলে?

অতঃপর ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। দেখলাম, চেহারার পূর্বাবস্থা পরিবর্তন হয়ে বর্তমান অবস্থা ধারণ করেছে, যা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন।

(কিতাবুর রূহ, পৃষ্ঠা নং-২৩২, লেখক- আল্লাম ইবনে কায়্যিম।)

শুকরে পরিণত :

হযরত ইমাম শা'রানী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'আল মানানুল কুবরা'-তে আল্লামা গাফফার কাওসী রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক লোক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও হযরত উমর রা.কে গালাগালি করত। এসব শুনে তার স্ত্রী ও ছেলে গালাগালি করতে নিষেধ করল। কিন্তু তাদের নিষেধ সে মানল না। বরং নিজের দুষ্টামির অবস্থায়ই অবিচল রইলো। এমনকি তাদেরকেও গালাগালিতে শরীক হওয়ার জন্য পাল্টা সে চাপ প্রয়োগ করল। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মনুষ্য আকৃতি পরিবর্তন করে শুকরে পরিণত করলেন।

অতঃপর ছেলেটি তার গলায় শিকল পরিয়ে দোকানের কাছে বেঁধে রাখলো। বাঁধা অবস্থায় সে শুকরের ন্যায় চিৎকার করছিল। সমকালীন সমস্ত লোকেরা তার চিৎকার শুনছিল। কিছুদিন পর সে মৃত্যুবরণ করল। মৃত অবস্থায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এক গর্তে ছেলেটি তাকে নিক্ষেপ করল।

আল্লাম শায়েখ মুহিব্বুদ্দীন তিবরী (রহ.) বলেন, আমার কাছে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, অতঃপর আমি তার ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন সে তার পিতা সম্পর্কিত এই শিক্ষাপ্রদ ঘটনাটি আমার কাছে বর্ণনা করল। সে আরো বলল, আমার পিতা আমাকে তার ন্যায় এই সুমহান সাহাবাদ্বয়কে গালাগালি করতে অনেক চাপ দিয়েছে। প্রহার করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছি। বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছি তার এই জঘন্যতম নির্দেশের প্রতি। কারণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টজীবের আনুগত্য বৈধ নয়। (বুখারী শরীফ) (লাত্বাইফুল মানান ওয়াল আখলাক, ২/৮০, লেখক- ইমাম শা'রানী রহ.)

বংশগত প্রাধান্যতার কারণে জনৈক আলেমের শাস্তি :

যে কেউ কোন ছাহাবীর বংশদ্ভূত হেতু সেই সাহাবীকে কেবল বংশ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অন্যান্য সুমহান সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রাধান্য দেওয়া, যদিও প্রাধান্যদাতা নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী বলে দাবী করেন তবুও তার এই কাজ ভ্রান্ত। এমনই এক বিশিষ্ট আলেমের ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। যে ঘটনায় বর্ণিত আছে, উক্ত আক্বীদার কারণে কবরে কি শাস্তি পেয়েছিল সেই আলেম।

হযরত শা'রানী রা. আল্লামা আব্দুল গাফফার কাওসী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক বিশিষ্ট আলেম মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাকে স্বপ্নযোগে দেখেছি। তার কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছি। কিন্তু তিনি লা-জাওয়াব। তার জিহ্বা অচল হয়ে পড়েছে। চেহারা হয়ে পড়েছে কয়লার ন্যায় কালো। এহেন অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার! আপনি তো একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। অথচ আপনার আজ এই অবস্থা?কারণ কি? জবাবে উক্ত আলেম বললো, এহেন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো এই যে, আমি কতক সাহাবাগণকে কতকের উপর কেবল বংশ ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে প্রাধান্য দিতাম। (লাত্বাইফুল মানানুল কুবরা, ২/৮১)

বানরে পরিণত :

ইমাম বায়হাকী রহ. নিজ কিতাব 'দালাইলুন নবুওয়ত' এ লিখেছেন, জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমরা তিনজন লোক এক সঙ্গে ইয়ামানে যাচ্ছিলাম। অন্য একজন লোক ছিল আমাদের সাথে। সে যাচ্ছিল কুফায়। কুফাগামী লোকটি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে ভালোমন্দ অনেক কিছু বকছিল। আমরা প্রত্যেকেই তাকে নিষেধ করছিলাম। কিন্তু সে আমাদের নিষেধ মানেনি আমরা পৌঁছলাম ইয়ামানের অনতিদূরে এক স্থানে। বসে পড়লাম বিশ্রামের জন্য। ঢলে পড়লাম কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রার কোলে। ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। ওযু করলাম। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ফের যাত্রার জন্য।

ঐ লোকটি বলতে লাগল, আফসোস! শত আফসোস! আমি তোমাদের থেকে এখন পৃথক হয়ে যাব। অবস্থান করব এখানেই। কারণ এই মাত্র আমি স্বপ্নযোগে দেখেছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, 'হে ফাসেক! তুই এখানেই 'মসখ' সুন্দর আকৃতি হতে কদাকৃতিতে রুপান্তরিত হয়ে যাবি।'

ইতিমধ্যেই সে তার পা দু'টি জমা করে ফেলল। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম, আঙুল থেকে 'মসখ' ভিন্ন আকৃতিতে রুপান্তরিত হওয়া শুরু হলো। তার পা দু'টি বানারের পায়ের ন্যায় হয়ে গেল। অতঃপর হাঁটু পর্যন্ত, অতঃপর কোমর পর্যন্ত, অতঃপর মুখ পর্যন্ত পূর্বাকৃতি থেকে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করলো। অবশেষে সে সম্পূর্ণ বানরের আকৃতিতে রুপান্তরিত হলো। আমরা তাকে ধরে রশি দ্বারা বেঁধে ফেললাম। অতঃপর যাত্রা আরম্ভ করলাম। সূর্যাস্তের সময় আমরা একটি জঙ্গল দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। সেখানে কয়েকটি বানর একত্রে ছিল। সে বানরগুলোকে দেখামাত্রই রশি ছিঁড়ে দৌড়ে গিয়ে পৌঁছল তাদের কাছে। অনুরূপ একটি ঘটনা আল্লাম তিলমানী রহ.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনায় বানরের স্থলে শুকরের কথা বর্ণিত হয়েছে। (সাআদাতুদ্দারাঈন, পৃ. ১৫৩)

হযরত শাইখাইন রা. এর লাশ বের করার প্রসিদ্ধ ঘটনা :

আল্লাম ইমাম কুরতুবী (রহ.) ও আল্লাম মারজানী (রহ.)'তারীখে মদীনা'তে, আল্লামা ইমাম মুহিবুদ্দীন তিবরী (রহ.) স্বীয় কিতাব 'তারীখে মদীনা উরফে খুলাসাতুন ওয়া ফি আখবারে দাখিল মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' তে হযরত শামছুদ্দীন আল লামত্বী শায়খে খুদ্দাম রওযায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একটি জামাত মদীনার শাসনকর্তাকে বহু সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে এই কথায় বাধ্য করলো যে, আমরা রওযায়ে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) এর লাশ নিয়ে যেতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন। প্রলোভনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে সে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করল। অতঃপর তারা চল্লিশজন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহ পাঠিয়ে দিল।

শায়খ শামছুদ্দীন (রহ.) তিনি তখন রওযায়ে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেম ছিলেন। তাকে মদীনার শাসনকর্তা ডেকে বলল, রাতে চল্লিশজন লোক রওযায়ে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভেতর প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা যে কোন কাজই করুক না কেন, তাদেরকে তাতে বাধা দিবেন না।

জালেম শাসকের ভয়ে শায়খ শামছুদ্দীন (রহ.) ভীত কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, যাদেরকে হুকুম দিয়েছেন তারা হাজির হোক। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে এসে কান্না জুড়ে দিলেন এবং খোদার দরবারে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন।

শায়খ শামছুদ্দীন (রহ.) বলেন, আমি ইশার নামায শেষে দেখলাম, চল্লিশজন লোকের একটি জামাত আসবাবপত্রসহ মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। চলে গেল রওযায়ে নববীর সন্নিকটে। সহসা ভূমি ফেটে পড়ল। সকলেই আসবাবপত্রসহ ভূ-গর্ভে হারিয়ে গেল।

রাত পোহাল। সকালে রওযায়ে নববীর খাদেমকে জালেম শাসক ডেকে পাঠাল। তিনি হাজির হলে জিজ্ঞাসা করল, রাতে যেসব লোক রওযায়ে নববীতে এসেছিল তারা কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, হুজুর! তারা তো সবাই ভূগর্ভে চাপা পড়েছে। অতঃপর জালিম শাসক সেই স্থানটি পরিদর্শন করল, যেখানে তারা চাপা পড়েছিল।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, অতঃপর উক্ত স্থানটি খননও করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন পাত্তাও মিলেনি। আল্লামা মুহিবুদ্দীন তিবরী রহ. লিখেছেন যে, অতঃপর মদীনার সেই জালিম শাসক এক প্রকার বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে তার শরীর থেকে অল্প অল্প করে গোশত পড়ে যাচ্ছিল। পরিশেষে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করল।

(আল মানানুল কুবরা, ২/৮১, সাআদাতুদ্দারাইন, পৃ. ১৫৫)

সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রতি বিদ্বেষের ফল

হযরত আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) নিজ প্রসিদ্ধ কিতাব 'আয যাওয়াজের' এ আল্লামা কামাল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি পবিত্র মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলাম। আশুরার দিন এক সময় কিছু সংখ্যক সাহাবা বিদ্বেষীদের এক মিলনস্থলের নিকট গেলাম। সেখানে গিয়ে তাদেরকে বললাম, আমি হযরত আবু বকর রা. কে খুবই মুহাব্বত করি। উক্ত মুহাব্বতের বিনিময়ে আমাকে কিছু দান করুন।

তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, এখানে বস। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। পরে দেওয়া হবে। সে ঝামেলা মুক্ত হলো। অতঃপর এক লোক আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে প্রবেশের পর ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সে আমার জন্য দু'জন চাকর নিযুক্ত করল। তাদেরকে বললো, এই পাপিষ্ঠকে তোমরা যথেচ্ছা প্রহার কর। তাই তারা আমাকে বেঁধে ফেলল। যথেষ্ট প্রহার করল। জিহ্বা কেটে ফেলল। অতঃপর দরজা খুলে বের করে দিল। সাথে এ কথাও বলল, যাও যার মুহাব্বতের বিনিময় স্বরূপ কিছু অনুদান চেয়েছিলে তার কাছে গিয়ে তোমার জিহ্বা জোড়া দিয়ে নিয়ে আস। যদি সে জোড়া দিতে সক্ষম হয়।

তিনি বললেন, আমি অসহনীয় কষ্টের ফলে কেঁদে কেঁদে মসজিদে নববীতে পৌঁছলাম। ক্রন্দনরত অবস্থায়ই রওযায়ে মুবারকের সন্নিকটে হাজির হলাম। এমনকি ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নযোগে দেখলাম, আমার জিহ্বা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে গেছে। ঘুম থেকে জেগে দেখি, আল্লাহর রহমতে সত্যিই জিহ্বা ভাল হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর প্রতি আমার মহব্বত আরো অনেক বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় বৎসর আশুরার দিন ফের আমি তাদের মজলিসে গেলাম। অতঃপর গত বৎসর যা বলেছিলাম, এই বৎসরও হুবহু তাই বললাম। তখন তাদের মধ্য থেকে এক নওজোয়ান এসে আমার হাত ধরে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। অত্যন্ত সম্মান করল। ভাল খাদ্য খাওয়াল। অতঃপর এই বাড়ীর একটি ঘরের দরজা খুলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর সে সজোরে অনবরত ক্রন্দন আরম্ভ করল। আমি ঘরের ভিতর দেখলাম, একটি শুকর বাধা রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার! কান্নাকাটি করছেন কেন?

জবাবে সে অপারগ হয়ে বলল- (অবশ্য বলার পূর্বেই আমাকে এই ব্যাপারে শপথ করালো যে, আপনি এই গোপন তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।) গত বৎসর আশুরার দিবসে একজন ভিক্ষুক এসেছিল। সে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)কে খুবই মুহাব্বত করত। এর বিনিময়স্বরূপ কিছু সাহায্য

চেয়েছিল। এখানে সে গত বৎসর সংঘটিত পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বলল। সে বলল, সেদিন আমি লোকটিকে ঘর থেকে বের করে দিলাম। দিন শেষ হয়ে রাত নেমে এল। ঘুমালাম। ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ আমরা এমন এক বিকট আওয়াজ শুনলাম, যার ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে বসলাম। দেখলাম, আমার পিতা শূকরে রুপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর তাকে এখানে এভাবে বেঁধে রাখলাম এবং মানুষের মাঝে প্রচার করলাম তার ইন্তেকালের মিথ্যা সংবাদ।

তিনি বললেন, তখন আমি বললাম, আমিই গত বৎসর এসেছিলাম। আমাকেই প্রহার করা হয়েছিল। আমারই জিহ্বা কর্তন করা হয়েছিল। আমার সাথে কৃত অনাকাঙ্খিত আচরণের কারণেই তার আজকের এই শাস্তি। অথচ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রতি গভীর মুহাব্বতের বরকতে আমার জিহ্বা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে গেছে। পরিশেষে এই নওজোয়ান আমাকে কিছু হাদিয়াসহ বিদায় দিল। (আয-যাওয়াজের, ২য় খন্ড, লেখক- ইবনে হাজার মক্কী রহ.)

নাস্তিক প্রফেসর

এক যে ছিলেন প্রসেফর। তিনি ছিলেন খুব জ্ঞানী আর বিচক্ষণ। এ-কারণে মানুষ তাকে খুব সম্মান আর শ্রদ্ধা করত। এ-সংসারে তার এক ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি ঐ ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এভাবে সুখেই তার জীবন কাটছিল।

মানুষের সব দিন নাকি সমান যায় না। এই প্রফেসর সাহেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। হঠাৎ করেই তার ভাইয়ের অসুখ হল। পরীক্ষায় দেখা গেল ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার। সবচেয়ে বড় বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হল। পানির মতো টাকা খরচ হল। এমনকি তিনি চার্চে আর গীর্জায়ও নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগলেন। বড় বড় প্রীস্টকে দিয়েও ভাইয়ের রোগমুক্তির জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সব প্রীস্টের প্রার্থনা বিফল করে দিয়ে একদিন ভাইটি মারা গেল।

এত বড় আঘাত প্রফেসর সাহেব সহ্য করতে পারলেন না। মৃত্যু যে একটা স্বাভাবিক ঘটনা, যে কোন মুহূর্তেই যে কোন মানুষ মারা যেতে পারে এবং মৃত্যুকে জয় করা অসম্ভব-এ কথাটি তিনি মেনে নিতে পারলেন না।

তিনি খুব চার্চভক্ত ছিলেন। এবার তিনি সবকিছুর জন্য চার্চকেই উল্টোভাবে দায়ী করলেন। তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, চার্চ মিথ্যা শেখায়। সৃষ্টিকর্তা বলে আসলেই কিছু নেই। থাকলে তো তিনি তার ভাইকে রোগমুক্ত করে দিতেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বাস আসলে মিথ্যা। সুতরাং মানুষকে এই মিথ্যা

বিশ্বাস থেকে ফেরানোর জন্য তিনি নিজের সব শক্তি কাজে লাগানোর কথা ভাবলেন।
প্রাচীনকালে আমাদের এই এশিয়া মাইনরে গ্রীস বলে একটি দেশ ছিল। যেখানে একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তার নাম ছিল সক্রেটিস। তিনি মানুষকে কথা-বার্তার মাধ্যমে তার মতবাদ, চিন্তাভাবনা বুঝাতেন। এই পদ্ধতিটি প্রফেসরের খুব পছন্দ হল। তিনি তার নাস্তিক মতবাদ প্রচারের জন্য প্রথমে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নিলেন।
একদিন শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর তিনি ছাত্রদের বললেন-
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবার বিজ্ঞান 'সৃষ্টিকর্তা' সম্পর্কে কি বলে সেটা দেখা যাক।
-ছেলেরা-মেয়েরা তোমরা কি সবাই সৃষ্টিকর্তাকে মান?
ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্বরে বলে উঠল-
-জি স্যার, আমরা মানি।
-তাহলে তোমরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী তাই তো?
-অবশ্যই স্যার।
-আচ্ছা বল তো, ঈশ্বর কি ভালো?
- অবশ্যই, ঈশ্বর মঙ্গলময়।
-ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান? সব কিছু করতে পারেন?
-জি হ্যাঁ স্যার, পারেন।
-আচ্ছা! একজন মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এখন তোমরা কি তার সেবা করবে?
-হ্যাঁ করব স্যার। ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্বরে উত্তর দিল।
-তাহলে তোমরা তো সবাই ভালো। তাই নয় কি?
-সম্ভবত স্যার। অনেকে দো-মনা হয়ে উত্তর দিল।
-অথচ ঈশ্বর নিজে এই লোকটিকে সেবা-শুশ্রুষা করবেন না! করবেন কি?
-না স্যার। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর।
স্যার কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন,
তাহলে ঈশ্বর তো মন্দ। তাই নয় কি?
ছেলে-মেয়েরা কোন উত্তর দিল না, নীরব হয়ে রইল।
প্রসেফর এরপর শ্রেণিকক্ষের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছুটে গেলেন। তারপর আবার ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন,
-নবীন বন্ধুরা, ঈশ্বর কি ভালো?

-হ্যাঁ, স্যার। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর।
-আচ্ছা শয়তান-এভিল কি ভালো?
-অবশ্যই না, স্যার।
-কে শয়তানকে সৃষ্টি করেছে?
-মানে... ঈশ্বর।
-ঠিক আচে। ঈশ্বর শয়তান সৃষ্টি করেছেন। এখন এই ... সৃষ্টি করা ভালো না মন্দ?
-মন্দ স্যার।
-আচ্ছা- রোগ, শোক, জ্বর, ক্ষুধা, মৃত্যু এসব ভালো না মন্দ?
-স্যার, এগুলো মন্দ।
-বল তো এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন?
-ছেলে-মেয়েরা আবারও উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। প্রফেসর আরও একবার শ্রেণিকক্ষের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরে এসে আবার প্রশ্ন করলেন...
-বল তো, এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এবারও কোন উত্তর দেয় না কেউ। প্রফেসর তখন ছেলে-মেয়েদের মুখোমুখি হয়ে বললেন,
-বিজ্ঞান বলে, পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্পর্শ দিয়ে যা দেখা বা অনুভব করা যায় তাই সত্য। তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া যায়। অন্যথায় সেটা অবাস্তব ধারণা।
- আচ্ছা তোমাদের কেউ কি কখনও ঈশ্বরকে দেখেছ?
-না স্যার, আমরা কোনদিন ঈশ্বরকে দেখি নি।
- কোনদিন কি তোমরা ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছ? স্বাদ নিয়েছ?সংবেদন পেয়েছ?
-না স্যার, এগুলোও কোনটাই আমরা পাই নি।
-তারপরেও তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? বিজ্ঞান বলে, যা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অনুভব করা যায় না, তার কোন অস্তিত্ব নেই। এ ব্যাপারে তোমরা কি বল?
- কিছুই না স্যার। আমরা শুধু বিশ্বাস করি। যেভাবে সবাই বিশ্বাস করে আসছে সেভাবে।
-এখানেই বিজ্ঞানের সমস্যা। ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ বা গ্রহণযোগ্যতা নেই, শুধুমাত্র বিশ্বাস ছাড়া...!
প্রিয় ছেলেমেয়েরা! আসলে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নাই। যা আছে তা শুধু বিশ্বাস।...

এ-সময় ক্লাশ শেষ হওয়ার ঘন্টা বেজে উঠল। শিক্ষক ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন। ছেলে-মেয়েরা এই নতুন সমস্যাগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করল। এরপর দুই দিন পার হয়ে গেছে। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছে। তবে এখন প্রফেসরের সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দুইটি ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ সবচেয়ে বড়, তারা প্রফেসরের কথার সঙ্গে একমত। আর অন্যভাগ এ-কথার সঙ্গে মোটেই একমত নয় এবং এরা দলে অত্যন্ত নগণ্য।

তৃতীয় দিন আবার ঐ প্রফেসরের ক্লাশ। যথাসময়ে তিনি শ্রেণিকক্ষে এসে নিয়মমাফিক প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করলেন। তার বক্তব্য শুরু করার পূর্বেই একটি ছাত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বিনীতভাবে সে প্রফেসরকে বলল,

-স্যার! আমরা সকলেই আপনার কথার সঙ্গে একমত। ঈশ্বর বলে আসলেই কিছু নেই। বরং এটা শুধুমাত্র একটি বিশ্বাস। সুতরাং আপনিই ঠিক, তাই আমরা আজ থেকে আপনার দলে এবং আপনার কথামতোই সামনে চলব।

ছেলেটির কথা শুনে প্রফেসর সাহেব যারপরনাই খুশি হলেন, তার মতবাদ, ধ্যান-ধারণার প্রসার-প্রচার হচ্ছে ভেবে নিজের প্রতি মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। এমন সময় একটি ছেলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,

-স্যার! আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি?

-অবশ্যই। কেন নয়? প্রফেসর মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

-স্যার তাপ বলে কি কিছুর অস্তিত্ব আছে? ছাত্রটির বিনীত প্রশ্ন!

-অবশ্যই, প্রফেসর বললেন। অবশ্যই তাপ আছে।

-আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ঠান্ডা বলে কি কিছু আছে?

-হ্যাঁ বাছা, অবশ্যই ঠান্ডাও আছে।

-না স্যার! এটা সত্য নয়। ছেলেটার দৃঢ় উক্তি।

অবাক মুখে প্রফেসর ছাত্রটির দিকে তাকালেন। সে তাকানোর মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক বিস্ময়। কিন্তু ছেলেটি কোনরকম বিচলিত না হয়ে প্রফেসরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল,

-স্যার, আপনি বিভিন্ন মাত্রার তাপের কথা বলতে পারেন। অধিক তাপ, অধিকতর তাপ, অধিকতম তাপ। সৌর তাপ, স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ডিগ্রী, মাত্রা ও নামে ডাকতে পারেন। আবার নিচে নামতে নামতে একসময় শূন্য ডিগ্রীতে চলে এলে এর নিচে বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহার করে নিচের তাপ সর্বনিম্ন কত ডিগ্রী মাইনাস-এ আছে তাও বলতে পারেন। কিন্তু শূন্যের ৩৭৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে আপনি কখনও নামতে পারেন না।

কিন্তু যদি ঠাণ্ডা বা শীতল বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকত, তবে আপনি অধিক ঠাণ্ডা, অধিকতর ঠাণ্ডা, অধিকতম ঠাণ্ডা ইত্যাদি ভাগে মাপ করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তাপ একটি শক্তি সেহেতু তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে এটা মাপা যায়। কিন্তু 'ঠাণ্ডা বা শীতল' 'তাপের' বিপরীত শব্দমাত্র, এরা শক্তিও নয় এবং সত্যও নয়। এটা শুধু তাপের বিপরীত একটা শব্দ যা তাপের অনুপস্থিতি বোঝায়।

প্রফেসরের মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বুঝলেন- এ ছেলেটি মেধাবী এবং এর যুক্তি শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তার খুব ভালো লাগল। তিনি মৃদু মৃদু হাসতে এবং সম্মতিসূচক মাথা দোলাতে লাগলেন।

ছেলেটির কথায় সমস্ত শ্রেণিকক্ষে পিন-পতন স্তব্ধতা নিয়ে এসেছে। একটা ছেলের হাত থেকে কলম মেঝেতে পড়ে গেল। সে শব্দটা 'হাতুরী পতনের মতো' মনে হল। সবাই প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে...

সামান্য একটু বিরতি দিয়ে ছেলেটি পুনরায় প্রশ্ন করল,

-স্যার, আপনি কি অন্ধকারকে বিশ্বাস করেন? বাস্তবে অন্ধকার বলে কি কিছু আছে?

-হ্যাঁ বাছা, অন্ধকার আছে। অন্ধকার না থাকলে রাতের কি কোন দাম থাকবে?

ছেলেটি দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ বিনীতভাবে আবার বলল,

-স্যার, আমরা জানা মতে আপনার একথাটিও সত্য নয়। আসলে অন্ধকার বলে কিছু নেই। যা আছে তা আলোর অনুপস্থিতি। আপনি ডীম লাইট, মৃদু লাইট, স্বাভাবিক লাইট বা উজ্জ্বল লাইন এমন কি আলোর বিভিন্ন রকম অবস্থান পেতে পারেন, কিন্তু এমন কিছুই পাবে না যাকে অন্ধকার বলা যেতে পারে। এটা কি সত্যি না?

সোজা কথায় অন্ধকার যদি কোন শক্তির নাম হত তবে আপনি সেটাকে অন্ধকার, অন্ধকারতর ও অন্ধকারতম ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারতেন। আসলে এটা সম্ভব নয়। অন্ধকার আসলে আলোর অনুপস্থিতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রফেসরের মুখ ধীরে ধীরে মৃদু হাসিতে ভরে গেল। তিনি দেখলেন যে, তার দেওয়া যুক্তিই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তিনি বুঝলেন, এই ছাত্রটি খুবই বুদ্ধিমান। অন্যদেরকে সাত-পাঁচ বুঝানো গেলেও একে তা করা যাবে না। তার খুব মজা লাগছিল। তাই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি প্রশ্ন করলেন,

-এ-সব কথা দিয়ে তুমি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও বাছা?

-আমার কথা হল, দর্শনের এ-সব আপ্ত বাক্য সঠিক নয়। এজন্য এর মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত তৈরি হয় তাও ভ্রান্ত।

বিস্ময়ে প্রফেসরের চোখ অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,

-এ-সব সিদ্ধান্ত ভুল? তুমি কি এ-কথা প্রমাণ করতে পারবে? এ-কথায় ছাত্রটি দমে গেল না। বরং সে বলল,

-স্যার, আপনি যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন সেগুলো দ্বৈত্ব শব্দ-শৃঙ্খলের দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, ভালোর সঙ্গে মন্দের মাধ্যমে এ যুক্তিগুলো দিয়েছেন। আসলে শব্দগুলো বাস্তবে প্রমাণিত সত্য নয়, যেগুলো আমরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে পারি। যেমন-

'ধারণা' শব্দটা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। 'ইলেকট্রিমিটি' এবং 'চুম্বুকত্ব' নিয়ে বিজ্ঞান কাজ করে কিন্তু এটা কোনদিন দেখা যায় না। খুব বেশি হলে অনুমান করা যায় মাত্র। তেমনি 'জীবনের' বিপরীতে 'মৃত্যু' এমন একটি শব্দ যার কোন বাস্তব সত্য নেই। জীবনকে যেমন দেখা যায়, বোঝা যায়, ছোঁয়া যায় তেমনি মৃত্যু শব্দটিকে দেখা, বোঝা বা ছোঁয়া যায় না। পৃথক বস্তু হিসাবে এর বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। মৃত্যু জীবনের বিপরীত শব্দ নয় বরং জীবনের অনুপস্থিতি মাত্র। যেমন আমি বলেছি, তাপের অনুপস্থিতি ঠাণ্ডা এবং আলোর অনুপস্থিতি হল অন্ধকার।

-স্যার! আপনি কি নিজ ছাত্রদের 'বানর থেকে মানুষের উত্থান হয়েছে বলে শেখান?

-বাবারে! তুমি তো প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। হ্যাঁ, আমি তাদেরকে এ-বিষেয়ে শেখাই।

-স্যার! আপনি কি এই বিবর্তনবাদটি কোথায়ও নিজ চোখে কোনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন বা দেখেছেন?

-প্রফেসর সাহেব নড়েচে- বসে বললেন, না, আমি দেখি নি। তিনি খুব বুঝতে পারছেন, এ ছাত্রটির সঙ্গে এ-বছর তার পড়াশোনার সময়টি খুব ভালো কাটবে। ছাত্রটি তখন বলল,

-শুধু আপনি কেন কোন মানুষই এ পর্যন্ত এ-মতবাদ বাস্তবে ঘটতে দেখে নি। অথবা ঘটেছে বলে প্রমাণ করতে পারে নি। সুতরাং এটা একটা মতবাদ। আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও একটা মতবাদ বা বিশ্বাস প্রচার করছেন যা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তাহলে আপনি কি বিজ্ঞানের শিক্ষক না একটি অপ্রমাণিত বিশ্বাসের প্রচারক?

এ-মুহূর্তে আমি আপনাকে আরও কিছু বলতে চাই- সেই সব যুক্তি সম্পর্কে যা আপনি অন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বুঝিয়েছেন।

প্রফেসর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। ছাত্রটি তখন ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর সে আবার তার কথা শুরু করল,

-আপনারা কেউ কি আমাদের এই প্রফেসরের মস্তিস্ক বা বুদ্ধিমত্তাটি দেখেছেন?

এ-কথায় ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীরা একযোগে হেসে উঠল। ছেলেটি না থেমে পুনরায় বলল, আপনারা কেউ কি এই প্রফেসরের মস্তিস্ক বা বুদ্ধিমত্তাকে শুনেছেন, কেউ কি সেটা স্পর্শের মাধ্যমে অনুভব করেছেন? অথবা কেউ কি তার মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিমত্তার ঘ্রাণ নিয়েছেন? জানি আপনাদের উত্তর হবে-না! অথচ অভিজ্ঞতাবাদীদের পদ্ধতির প্রমাণিত নিয়ম অনুযায়ী 'যা দেখে যায় না, ছোঁয়া যায় না, বা সোজা কথায় পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়'।

আপনার মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিমত্তা যেহেতু এ-সবের কোনটি দ্বারা প্রমাণিত হয় নি, তাই এটা কি ধরে নেয়া যাবে যে, আমাদের মস্তিষ্ক বা জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোন পদার্থই নেই?

সমস্ত শ্রেণিকক্ষে অখন্ড নীরবতা নেমে এল। কেউ কোন কথা বলছে না। এমনকি নড়াচড়াও করছে না। অবশেষে মাথা দুলাতে দুলাতে বয়স্ক প্রফেসর তখন বলে উঠলেন,

-মনে হচ্ছে ক্লাসের সব ছেলে-মেয়েকেই তুমি আবার আস্তিক (খোদায় বিশ্বাসী) বানিয়ে তবেই ছাড়বে।

এরপরে জীবনের বাকী দিনগুলোতে ঐ প্রফেসরকে আর কেউ নাস্তিকতার স্বপক্ষে কোন যুক্তি তুলে ধরতে দেখে নি।

আল-আহবাব লাইব্রেরী

মোগরা পাড়া মহিলা কলেজ সংলগ্ন চিলার বাগ
(হাবিবপুর) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৬৭৫২৪৯১৮০-০১৯৮৯৮৩৯৩৬৮